
আনন্দ

আনন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
সম্পাদিত



ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

শারদ সংকলন

একাদশ বর্ষ

১৩৬২

প্রচ্ছদ ও রূপসজ্জা
শ্রীঅশোক ধর

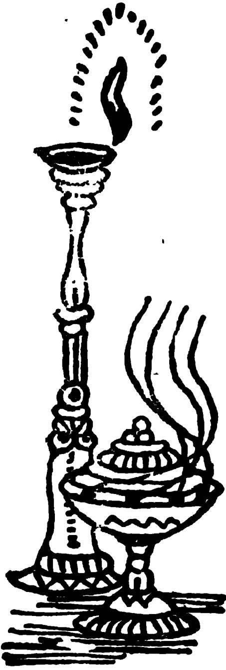
মুদ্রণ :
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

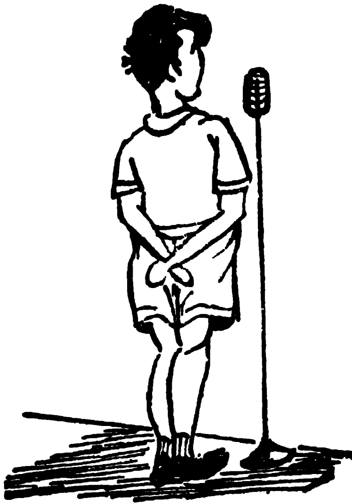
প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী, ২ কার্তিক বসু রোড, কলিকাতা-৯

গ্রন্থন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ১০১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র





ভূমিকা

এবার ৺পূজার পূর্বের সুসংবাদ—বিশেষ জরুরী ক্ষমতা আইন। মূল্যবৃদ্ধির উৎপাত যেভাবে দিনে দিনে ধাপে ধাপে বেড়ে উঠছিল তাতে সাধারণ মানুষ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তারই সঙ্গে ছিল ভেজাল ও ঘুষের উপদ্রব। গভর্মেণ্ট জরুরী বিশেষ আইন প্রয়োগ করে তার প্রতিবিধানে এগিয়ে এসেছেন। দুর্নীতি দমন হচ্ছে, সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে। এই আইন যতো ব্যাপক হবে, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ততো বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। সেইজন্যই আমরা এই বিশেষ আইনকে স্বাগত জানাই।

পূজা আসছে, এই পূজার চাঁদা আদায়ের ব্যাপারেও সাধারণ মানুষ যেন বিব্রত না হয় গভর্মেণ্ট সেদিকেও যেন দৃষ্টি দেন, আমরা এই অনুরোধ জানাই।

বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। অতিরিক্ত বর্ধিত মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা কমেছে,—এইটাই আশার কথা।

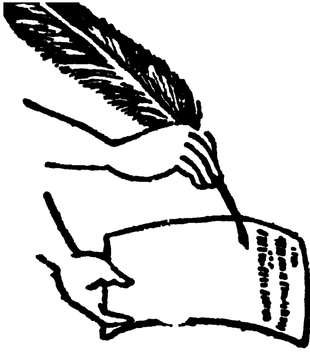
আমরা মূল্যবৃদ্ধি চাই না বলেই বইয়ের দাম বাড়ালাম না। গত বছরের চেয়ে এবারের পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু বাড়লো, তবু যাঁদের লেখা আমরা স্থানাভাবে ছাপতে পারলাম না, তাঁরা যেন আমাদের অক্ষমতাকে ক্ষমা করেন।

গত দশ বছর 'আনন্দ' পড়ে যারা খুসি হয়েছে, এবারেও যদি তারা খুসি হয় তাহলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মানবো।

পূজার দিনগুলি সকলের আনন্দে কাটুক এই প্রার্থনা করি। ইতি।

—সম্পাদক





সূচী ঃ

ছড়া ঃ

আনন্দ



আমদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহারা যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান্ পায় না।···

একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয় স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।···

—রবীন্দ্রনাথ



আমরা শরীরের যতই যত্ন লই না কেন শরীর তো একদিন যাইবেই। ইহার স্থায়িত্ব নাই। ধন্য তাহারা, যাহাদের শরীর অপরের সেবায় নষ্ট হয়।… এ জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য—এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কাজে না গিয়া ভাল কাজে যায়, তবে তাহা খুব ভাল বলিতে হইবে।

—বিবেকানন্দ



কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখাপড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরূপ internal desciplin3 অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরের সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না।

-সুভাষচন্দ্র



আনন্দ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

গুরু অঙ্গদ দেহ রাখিলেন, অমর হইল গুরু,
গুরুজীর কাছে অমর দাসের যোগাভ্যাসের স্থরু।
সেবা ধর্মের প্রতীক যে তিনি, করুণার অবতার,
দলে দলে তাই শিখরা আসিয়া শরণ লইল তাঁর।
'দাতু' আর 'দাসু' অধম পুত্র অঙ্গদ গুরুজীর,
অমর দাসের প্রভাব দেখিয়া রাগে হল চৌচির।
আশ্রমে যবে শিখরা গাহিছে অলখ নিরঞ্জন,
গুরু-বিশ্বাস করে তাহাদের সব ভয় ভঞ্জন।
দাতু ছুটে আসি পদাঘাত করে অমর দাসের গায়ে,
হাসিয়া বৃদ্ধ বলেন দাতুরে, বড় ব্যথা পেলে পায়ে।
তাড়াতাড়ি তিনি কাছে টেনে নিয়ে দাতুর চরণখানি,
ব্যথা নিরাময় তরেতে বুলান আপনার দু'টি পাণি।
হেরিয়া কাণ্ড বিস্ময় মানে সমবেত নর-নারী,
দাতুর নয়নে উছলিয়া উঠে অনুশোচনার বারি।
ক্ষমা চায় দাতু অমর দাসের চরণে লুটায়ে প'ড়ি,
আবেগে গুরুজী নাচেন তাহারে বক্ষে জড়ায়ে ধরি।
অমর দাসের চোখ হতে ঝরে পড়ে আনন্দধারা,
ভক্ত, শিষ্য, সারা আশ্রম আনন্দে দিশেহারা।



বুড়ীর বাড়ীতে ভোম্বোল

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভোম্বোল হাঁফাতে হাঁফাতে চলছে।

পথের দু-ধারে খড়ের বাড়ী-ঘর। চালে চালে চাল-কুমড়ো। আর লাউয়ের গাছ। চাল-কুমড়ো গাছগুলোর কোন-কোনটায় চাকা-চাকা হলদে ফুল ধরেছে, জালি পড়েছে। ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে। কোন কোন বাড়ীর বার-উঠানের শেষে ধানের মরাই, কারুর বাড়ীর বাইরের দিকে গোয়াল।

রাস্তার ধারে এক জায়গায় আমতলায় কতকগুলো ছেলে জটলা করছিল। কয়েকজন একটা কুকুরের লেজের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে একটা কানেস্তারা বাঁধছে। কুকুরটা বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভোম্বোলও দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো।

ছেলেগুলো দড়ি বেঁধে কুকুরটাকে ছেড়ে দিলে। কুকুরটাও অমনি দিলে ছুট্। সে যত ছোটে ততই টিনের ধমাধম আওয়াজ হয়। ছেলেগুলো হাসতে হাসতে, হাততালি দিতে দিতে তার পিছনে ছুটতে লাগলো। ভোম্বোল হেসেই সারা।

সে আবার চলতে লাগলো। যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে দেখলো, কুকুরটা মাঠ দিয়ে লেজ তুলে ছুটছে। লেজে দড়িটা বাঁধা কিন্তু কানেস্তারাটা নেই।

ভোম্বোল আরও কিছুদূর গিয়ে পথের ধারে একটা বেত ঝোপের কোনে বসে পড়লো। রাস্তাটার ওপারে খান দুই ছোট খড়ের ঘর। একটা চাল-

কুমড়ো গাছ লম্বা কঞ্চি বেয়ে একটার চালে লতিয়ে উঠেছে। বাড়ীটার চারধারে অড়হর-কাঠির বেড়া। সামনে একটু উঠোন—পরিষ্কার, তকতকে, আর সেখান থেকে কিছু তফাতে অনেক কালের একটা পুকুর দাম-কলমী-হিন্‌চে ভরা। তার পাড়ে কয়েকটা নারকেল গাছ। ঐ যে পুকুরটার ভাঙ্গা ঘাটে দেখা যায়।

বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। কপালে তার ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগছে। খিদে ও ক্লান্তিতে ভোম্বোলের দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে বাতাবী লেবুটা কোলে রেখে হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে দেখলো, ঘর দুখানার ঐ কোণ থেকে এক বুড়ী কাকে যেন বকতে বকতে বেরিয়ে এলো। বুড়ীর চুলগুলো পাটের মতো সাদা, মুখে একটাও দাঁত নেই।

বুড়ী চেঁচিয়ে বললে,—'শুনছিস্ হতভাগী, এটুকু খেয়ে যা। সারাদিন এরপর বেড়ার ধারে ঘুরবি, মারধোর খাবি। লোকে কয়, আমি তোরে খেতে দিই নে। কৈ? এলি? ও স্বরো—স্বরো! আর মুখপুড়ির সাড়া নেই! এতক্ষণ পাড়া মাথায় করছিলি যে—'

ভোম্বোল মনে করলো, বুড়ী বুঝি তার নাতনীকে বকছে। বুড়ী গুটি গুটি এসে পথের ওপর দাঁড়ালো। ভোম্বোল এবার দেখলো, বুড়ীর হাতে একখানা মাজা কাঁসি, বুড়ী আবার ডাকলো,—'ও স্বরো—সৈরভী ধন—'

এবার সে সাড়া পেলো—'হাম্ বা—আ—আ।' সঙ্গে সঙ্গে ও-পাশের ঝোপ-জঙ্গল থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো একটা শাদা রঙের শিং ভাঙা গাই, তার পিছনে লাল রঙের বাছুর।

ওরই নাম সৈরভী? ভোম্বোল আপন মনে হাসতে লাগলো।

বুড়া বললে,—'ওরে, এই ফ্যানটুক খেয়ে যা—আয়—'

সৈরভী বুড়ীর দিকে বড় বড় চোখে একবার ফিরে তাকিয়ে, মাথা দুলিয়ে, কান ঘুরিয়ে, লেজ তুলে ওধারে ঝিঙে ক্ষেতের দিকে দিলে দৌড়।

বুড়ী কাঁসির ফেন পথের ধারে ঘাসের ওপর ঢেলে দিয়ে বকর্ বকর্ করতে লাগলো।

বুড়া এতক্ষণ ভোম্বোলকে দেখতে পায় নি। চোখ ও ভ্রূ কুঁচকে ভোম্বোলকে কিছুক্ষণ দেখলো। তারপর বললে,—'ওখানে বসে কে রে?'

ভোম্বোল বললে,—'আমি।'

—'নাম কী?'

—'ভোম্বোল।'

বুড়ী কানে হাত দিয়ে ঘাড় কাৎ করে জিগ্যেস করলে,—'কী বললি? টম্বোল?'

ভোম্বোলের রাগ হলো; চেঁচিয়ে বললে,—'না—না—না—ভো-ও-ম্ বোল।'

বুড়ী বললে,—'তা যাই হোক! তুই ওখানে বসে কেন? সরে আয়—সরে আয়। ওখান থেকে সেদিন মস্ত এক কেঁউটে বেরিয়েছিল। রেখো মালোর ব্যাটা ছিমন্তটা আর একটু হলেই গিয়েছিল আর কী!'

ভোম্বোল এক লাফে সেখান থেকে উঠে এসে বুড়ীর সামনে দাঁড়ালো। তারপর ঝোপটার দিকে সভয়ে তাকালো।

বুড়ী বললে,—'কাদের ছেলে রে তুই?'

—'চাকী মশাইয়ের।'

—'চাকী মশাইয়ের? এ গাঁয়ে তো চাকী নেই, বাড়ী কোথায়?'

ভোম্বোল বললে,—'সে তুমি চিনবে না।'

—'বলই না। দেখি চিনতে পারি কী না—'

ভোম্বোল বললে,—'সেই দুর্গাপুর।'

—'দুগ্‌গোপুর? দুগ্‌গোপুর আর চিনি নে? রেলে যেতে হয়, আমার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ী ছিল ওখানে—'বলতে বলতে বুড়ীর শুকনো চোখ দুটো ছল-ছল্ করে উঠলো, তারপরে বললে,—'তারা আর কেউ নেই। নাতিটাও চলে গেছে! তা, তুই যে এ গাঁয়ে এসেছিস্, এখানে কেউ আছে নাকি?'

—'না।'

—'তবে?'

ভোম্বোল উত্তর দিলে না।

বুড়ী বললে,—'বুজিছি। আমার নাতিটাও এমন করতো—ঘরে থাকতে চাইতো না। তোরা সব বুনো—বাঁদর—ঘরে মন বসে না। তোর বাপ আছে?'

ভোম্বোল ঘাড় নেড়ে বললে,—'না।'

—'মা?'

—'না।'

বুড়ী বলে উঠলো—'তা পোড়াকপালে! সব খেয়েছো? তবে আর তোরে ধরে রাখবে কে?'

তারপর ভোম্বোলের খুব কাছে সরে গিয়ে তার থুৎনিতে হাত দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—'কিছুই খাস্ নি বুঝি? মুখখানা শুকিয়ে গেছে দেখছি। সেটাও এমনি না খেয়ে বনে-বাদাড়ে, পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতো। চল্—ঐ আমার ঘর। যা হোক্ চারড্ডি জলপান মুখে দিবি। চল্—চল্—'

ভোম্বোল কিন্তু সেখান থেকে নড়লো না।

বুড়ী বললে,—'নজ্জা করিস্ নি। চল্—চল্—' বলতে বলতে ভোম্বোলের হাত ধরে টানতে টানতে তার বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেল।

বুড়ীর ঘরের দাওয়াটি বেশ নিকোনো, এক কোণে রান্না হয়, হাঁড়ি-কুঁড়ি সব তখন তে-কাঠায় তোলা। খালি উনুনের পাশে এক বোঝা বাঁশ ও কাঠ। তার পাশে একটা ছাই রঙের বেড়াল তপস্বীর মত চোখ বুজে বসেছিল। সে তাদের পায়ের শব্দে যেন অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকিয়ে মিহিসুরে একবার ডাকলো,—'ম্যাও—'

বুড়ী বললে,—'তোমার আবার কী? একটু সবুর করো।' বলে দাওয়ায় উঠে দরজার শিকল খুলে ঘরে ঢুকলো, তারপর একখানা নলের চাটাই এনে দাওয়ায় পেতে ভোম্বোলকে বললে,—'নে—উঠে এসে বোস্।'

ভোম্বোল তখনও ছেঁচতলায় দাঁড়িয়েছিল। বুড়ীর কথায় আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে চাটাইয়ের ওপর বসলো।

বুড়ী আবার ঘরে ঢুকে হাঁড়ি থেকে ছ'কুন্কে টাটকা মুড়ি একটা ধামীতে ঢাললো। তারপর শিকের হাঁড়ি থেকে বড় বড় দুটো নারকেলের নাড়ু বার করে মুড়িগুলোর ওপর রেখে বাইরে এসে ভোম্বোলের হাতে দিয়ে বললে—'খা মনি।'

ভোম্বোল বুড়ীর হাত থেকে ধামীটা নিতে নিতে বললে,—'এই বাতাবীটা কী করবো, আজীমা?'

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। এক গাল হেসে বললে,—'কী বলে ডাকলি?'

—'আজীমা।'

বুড়ীর আনন্দ আর ধরে না। সে ভোম্বোলের সামনে উবু হয়ে বসে পড়লো। হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলে,—'ও নেবু তুই পেলি কোথায়?'

—'কুমোর বাড়ীর গাছে।'

—'মতে কুমোরের গাছের নেবু? খাস্ নে বাছা—সইবে না। তোরে আমি ভাল নেবু খাওয়াবো। ওটা ফেলে দে। অমন হাড়-কিপ্টে আমার সাড়ে তিনকুড়ি বছর বয়েসেও দেখিনি—'

ভোম্বোল লেবুটা কিন্তু ফেললো না; পাশে রেখে দিয়ে মুড়ি নাড়ু খেতে লাগলো। বুড়ী তাকে একটি ছোট কাঁসার ঘটিতে জল এনে দিলে। ঘটিটি রূপোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। তারপর বললে,—'ব'সে ব'সে খা। আমি চারটে কলমী শাক তুলে আনি। আর, দেখি গে যদি এক-আধটে ন্যাটা-পুঁটি পাই—'

ভোম্বোলকে সে দুপুরে খেতে দিলে আউস চালের রাঙা রাঙা ভাত, মাস-কলায়ের ডাল ও কাঁচা লঙ্কা আর সর্ষে ফোড়ন দিয়ে কলমী শাক ভাজা। সে ল্যাঠা বা পুঁটি কিছুই ধরতে পারে নি। ভাতের সঙ্গে একবাটি ঘন দুধও সে ভোম্বোলকে দিলে। তার সরখানা ঠিক কাঁথার মতো পুরু—ওপরে গর্ত-গর্ত। ভোম্বোল দুধের সর খেতে ভালোবাসে। দুধটা সৈরভীর। পেট ভরে খেয়ে সে দুপুরে বেশ এক ঘুম দিলে। উঠলো যখন, বাঁশবনের মাথায় বেলা গড়িয়ে গেছে।

বুড়ী বললে,—'মনি, তুই আমার কাছেই থাক্। এই ঘর—বাড়ী, ঐ পুষ্করিণী—বাঁশঝাড়টা আমার, বিঘে সাড়ে তিন ধেনো জমিও আছে। সব তোরে দেবো, বুঝলি?'

কিন্তু ভোম্বোল এ সব নিয়ে কী করবে? সে যাবে সে-ই টাটানগর। সেখানে গিয়ে কত কাজ শিখবে। এখানে এই গাঁয়ে, ঐ মাঠে কি আছে? এখানে সবাই যেন ঘুমোচ্ছে। ধ্যেৎ!

সে বুড়ীর কথায় কোন জবাব না দিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে মনে মনে ঠিক করতে লাগলো, কোলকাতা কোন্ দিকে, ঐ যেদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে? সে মনে মনে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো। হাঁ—তাই-ই। একবার কোলকাতায় গেলে টাটানগর যাওয়া কিছুই কঠিন নয়, এখান থেকে রেলেও কোলকাতা যাওয়া যেতে পারে।

কোলকাতা কতদূরই বা? তাদের দুর্গাপুর থেকে মোটে একশ' দশ মাইল। এখান থেকে না হয় একশ' ত্রিশ মাইল হবে। সে হিসেব কোরে দেখলো, রোজ যদি দশ মাইল করে হাঁটে, তা'হলে তেরো দিনে কোলকাতায় গিয়ে পৌছবে, তবে আর ভয় কী?

ওদিকে মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার করে এসেছিল। ঝড় ওঠে ওঠে, বুড়ী বললে,—'কোথাও যাসনে, ভীষণ দেয়া নামবে।'

সৈরভীও 'হাম্বা—হাম্বা' করতে করতে বাড়ী ছুটে এলো। বুড়ী তাকে ও বাছুরটাকে গোয়ালে পুরে মাটির গামলায় জাবনা দিলে। সে-দিন আর গোয়ালে সাঁজাল দিলে না। যে হাওয়া! এখনই হয়তো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে।

ভোম্বোল একটু এদিক-ওদিক ঘুরে এসে দাওয়ায় উঠে বসলো। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সন্ধ্যে উতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ডাকতে লাগলো—গুড়্ গুড়্ গুড়ুম। বিদ্যুৎ চোখ-ধাঁধানো ঝিলিক হান্‌ছে। হঠাৎ সোঁ সোঁ করে বৃষ্টি নামলো, এলোমেলো বাতাস বইতে লাগলো।

বুড়ী সে রাতে আর রাঁধলো না। ক্ষীরের মতো ঘন লাল দুধে মুড়ি, মর্তমান কলা ও আখের গুড় দিয়ে দুজনে ফলার করলো।

রাতে শুয়ে শুয়ে বুড়ী গল্প জুড়ে দিলে—'এক যে ছিল রাজা—তার সাত রানী।' কিন্তু গল্পটি বেশিদূর এগোলো না, পাটরানীর ঘরের দরজায় পৌছতে পৌছতেই বুড়ীর নাক ডাকতে লাগলো। কিন্তু ভোম্বোলের চোখে ঘুম আর আসে না।

ঘর অন্ধকার, বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝর্ ঝর্, সন্ সন্। পুকুরের ব্যাঙগুলো ডাকছে—ক্যাঁ-কোঁ, কটর্-কটর। তাদের সঙ্গে দাম-কলমী-হিঞ্চে বনে এক জোড়া ডাহুক-ডাহুকী যোগ দিলে—দেই-দেই। সারা রাতের মধ্যে তাদের হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকির বিরাম রইলো না। সকলে যেন পরামর্শ করে ভোম্বোলের চোখের ঘুম কেড়ে নিলে। তার মন ছুটে গেল তাদের দুর্গাপুরে নদী-তীরে।

সে—ই ও-পারে বন-ঝাউয়ে ঢাকা বিশাল বালুচর। তার শেষে আকাশের কোল-বরাবর গাঁ। এ-পারে তাদের বাড়ী। পূব-দুয়ারী ঘরখানার জানালার ধারে এমনি বর্ষায় বসে সে যেন গান ধরেছে। ঝাউ বনে, নদীর বুকে বাতাস লুটোপুটি করছে আর কি যেন কইছে·········

ভোরের দিকে সব শান্ত হতে, ভোম্বোল ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর চুপি চুপি সকাল হলো, বুড়ী দেখলো ভোম্বোল ঘুমোচ্ছে, সে পুকুর ধারে চলে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে দেখে, চাটাই খালি, ভোম্বোল নেই; মনে করলো, এখনই

আসবে। কিন্তু ক্রমে রোদ উঠলো, মেঘ সরে গেল, ভোম্বোল তবু ফিরে এলো না। সে বেরিয়ে গিয়ে ফাঁকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় ডাকলো,— ‘টম্বো-ও-ল! ওরে টম্‌ব্‌লা—আয় রে দাদা—ফিরে আয়—’

কিন্তু কোথায় তার টম্বোল? সে তখন আধ ক্রোশ দূরে মানিকপুরের পাকা সড়ক ধরে বরাবর পশ্চিম দিকে চলেছে। তার হাতে কঞ্চি, বগলে বাতাবী লেবু।

মশা-মাছি-সংবাদ

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

এক যে ছিল মশা।—
দিব্যি ছিল নাদুসনুদুস শরীর মাজাঘষা।
রক্ত খেয়ে বদ-হজমে করতো ওঠা-বসা।
কেউ মশারির ভেতর গেলে হোত বেজায় গোঁসা।
একদিন সে কি কুক্ষণে কামড়ালো এক শশা,
সেদিন থেকে ভাঙলো শরীর, কাহিল হোল দশা।

এক যে ছিল মাছি।—
ভনভনিয়ে ঘুরতো ঘেঁয়ো মুখের কাছাকাছি।
যা পেতো তাই খেতো, কোনো নেইকো বাছাবাছি
ভেলি গুড়ের গন্ধ পেলে করতো নাচানাচি।
একদিন সে কি কুক্ষণে শুনলো মামার হাঁচি,
সেই থেকে ও ঘর ছেড়েছে, পালিয়ে গেছে রাঁচি।

মাছরাঙা

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত



গ্রামের মাটিতে আছে কত খাল-বিল,
ডোবা ও ডহর, আছে কত নদীনালা,
তা পিছনে ফেলে লালে নীলে ঝিলমিল
পাখা মেলে কেন ধোঁয়া ধুলো কালি ঢালা
এই শহরেতে এসেছ হে মাছরাঙা ?
ডেকে ডেকে কেন করছ গলাটি ভাঙা ?

এখানে কোথায় টলমল করা জলে
খলসে পুঁটির চাঁদা ট্যাংরার খেলা ?
আম জাম লিচু হাজারো গাছের তলে
এখানে কোথায় বসবে পাখীর মেলা ?
কোন্‌খানে ধরবে বল ত মাছ ?
আলসেয় বসে পাও না রোদের আঁচ ?

তার চেয়ে যাও শহরতলীর মুখে,
যেতে যেতে পথে পাবে ঢের জলাশয়,
ঝুপ করে জলে ডুব দিয়ে মনসুখে
মাছ ধরে খাও এক দুই চার ছয়।
তারপরে বস কোন ছায়া ঘেরা গাছে
এখানে শহরে না খেয়ে কি মজা আছে ?

অথবা তোমার মন আজ উড়ু উড়ু
নূতন আকাশে তাইতে মেলেছ পাখা ?
কাছে দূরে তাই সফর করেছ স্বরু
দীঘি সরোবর নদী ঝিল গাছ ঢাকা।
আছে কিনা কিছু, যেখানে নূতন করে,
তুলবে আবার আরামের নীড় গড়ে।

সোনার তাল

শ্রীমন্মথ রায়



[বনপথ। এক সন্ন্যাসী একটি ভজনগান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন। দেখিলেন, কোন ইটপাথর নয়—একতাল সোনা বনপথে পড়িয়া রহিয়াছে।]

সন্ন্যাসী॥ এ কি! এ যে একতাল সোনা। এই বনপথে পড়ে! কে হয়তো ফেলে গেছে। কিন্তু কে ফেলে গেল!...উঃ! একতাল সোনা। (লুব্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল দেখিয়া) নিয়ে যাই, হ্যাঁ, নিয়েই যাই—একতাল সোনা নিয়ে কি না হতে পারে! কী না হতে পারব!...একটা রাজ্য গড়ে তুলতে পারবো। দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর সব হবে।...একটা রানী—হ্যাঁ, তাও! ...তাই তো! আমি না সন্ন্যাসী! ছি-ছিঃ, একি দুর্লোভ! ভগবান! ভগবান! এ তো সোনা নয়, জলন্ত পাপ, সাক্ষাৎ নরক। (হাত হইতে সোনার তাল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) আমাকে রক্ষা কর ভগবান, আমায় রক্ষা কর।

[ছুটিয়া পলায়নোদ্যত, এমন সময় তিনজন দস্যু, প্রথমজনের নাম হন্ত, দ্বিতীয়জনের নাম দন্ত এবং তৃতীয়জনের নাম হসন্ত—তথায় আসিয়া উপস্থিত! মুখে তাহাদের 'মাভৈঃ মাভৈঃ' রব।]

হন্ত॥ দুর ছাই। এ যে দেখছি এক সন্ন্যাসী বাবা!

দন্ত॥ একটা লোটা-কম্বলও তো নেই, তবে মিছি মিছি ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিলে কেন বাবা?

হসন্ত॥ ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়—এর দেখছি তাই!

সন্ন্যাসী॥ না, না, তোমরা জানো না, একতাল সোনা—সাক্ষাৎ নরক—বাঁচতে চাও তো পালাও। এসো—পালাই।

হন্ত॥ একতাল সোনা! সাক্ষাৎ নরক! কোথায় বাবা?

সন্ন্যাসী॥ না না, আমি বলবো না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। পরের ধন কুড়িয়ে পেলেও নিতে নেই...চল পালাই।

দন্ত ॥ বলে কি হে! এক তাল সোনা! পরের ধন!…ওকে ধর-ধর—

[হন্ত গিয়া সন্ন্যাসীর হাত চাপিয়া ধরিল]

সন্ন্যাসী ॥ লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু—তোমরা মরবে। তোমরা মরবে।

হসন্ত ॥ কিন্তু তার আগে তুমি মরলে। বল শিগ্‌গীর, কোথায় তোমার একতাল সোনা—

সন্ন্যাসী ॥ আমি বলবো না! আমি বলবো না! সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে আমি তোমাদের ঠেলে দিতে পারবো না!

হন্ত ॥ এরে ভাই দন্ত! ওরে হসন্ত! দেখ দেখি ঐ ঝোপটার দিকে বাবা ঠাকুর এত ঘন ঘন চাইছে কেন?

[দন্ত ও হসন্ত ঝোপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া সন্ন্যাসী চিৎকার করিয়া উঠিলেন]

সন্ন্যাসী ॥ হায়, হায়! সর্বনাশ হলো। গেল-গেল-এরা গেল!

[দন্ত গিয়া ইতিমধ্যে সোনার তাল উদ্ধার করিয়াছে।]

দন্ত ॥ এ কিরে! এ যে একতাল সোনা!

হসন্ত ॥ (দন্তের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া) তাই তো সোনা! সোনা! সোনার তাল! সোনার তাল। (সোনার তাল উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিল।)

দন্ত ॥ দেখি! দেখি!

হন্ত ॥ (সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দিয়া, উহাদের কাছে ছুটিয়া গিয়া) কই, দেখি! দেখি!

[হন্ত ও দন্ত উভয়ে হসন্তের হাত হইতে সোনার তাল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

হন্ত ও দন্ত ॥ আমায় দে—আমায় দে—

সন্ন্যাসী ॥ গেল! গেল! এরা গেল! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! এরা গেল।

হসন্ত ॥ (নাচিতে নাচিতে বলিয়া যাইতেছে) আর আমায় পায় কে রে বাবা! এত সোনা। রাজা হবো! রাজ্য হবে! রানী হবে! হাতীশালে হাতী—ঘোড়াশালে ঘোড়া। সোনার ঘর! সোনার বাড়ী! সোনার ভাত! সোনার—! আমি খাবো! (গান শুরু করিল)

॥ গান ॥

ওরে আমার বনের পথে
কুড়িয়ে পাওয়া খাঁটি সোনা ;
সোনা নয়তো, সোনার মাণিক
সোনার বরণ চাঁদের কোণা !

হন্ত ॥ সোনার তাল রাখ্ বলছি। ভালো চাস্ তো রাখ্-রাখ্—

দন্ত ॥ নইলে আজ তোরই একদিন কি আমাদেরই একদিন—

সন্ন্যাসী ॥ শুরু হয়েছে! লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু! এদের মৃত্যু শুরু হয়েছে! ভগবান! এদের রক্ষা করো। এদের রক্ষা করো।

[সন্ন্যাসী তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন।]

দন্ত ॥ ওরে, সন্ন্যাসী ঠাকুর সরে পড়লো যে! ধর ধর ওকে ধর।

হন্ত ॥ তাহলে হসন্ত সরে পড়বে, একা তুই ওকে ধরে রাখতে পারবিনে। দেখ হসন্ত, ভালো চাস্ তো সোনার তাল রাখ্! তিনজনে ভাগ হবে—সমান ভাগ।

হসন্ত ॥ (গান ধরিল)

ওরে আমার সোনা!
ওরে চাঁদের কোণা
তোমার কৃপায় আসবে জানি
সোনার মুকুট সোনার রানী,
মণি-মাণিক আসবে কতো
যায় না সে তো গোণা।
ওরে আমার সোনা!
তোমায় পেয়ে রাজা হবো,
খাবো পানের দোনা।

হন্ত ও দন্ত ॥ বটে! তবে রে চোর।…

[একসঙ্গে হসন্তকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।]

হসন্ত ॥ কেন বাবা লড়াই করছো? একটু স্ফূর্তি করেছিলাম—তাও সইলো না?…নাও বাবা, নাও—তিনবন্ধুতে সমান ভাগ হোক।

দন্ত ॥ তাই বলো।

হন্ত ॥ পথে এসো। উঃ! ঘেমে গেছি।

দন্ত ॥ খিদে পেয়েছে। সারা দিন খাওয়া হয়নি—

হসন্ত ॥ তার ওপর এই হৈ হৈ! দাঁড়া, আমি ফল আনছি—কিন্তু দেখো ভাই, ফল আনতে গেলে তোমরা যেন আমায় কলা দেখিয়ো না—ধর্মে সইবে না। এসে যদি দেখি তোমরা নেই, পালিয়েছ, আমি সোজা ছুটবো কোতোয়ালের বাড়ী। গিয়ে সব বলে দেবো, হ্যাঁ।

[হসন্ত বনের দিকে চলিয়া গেল।]

হন্ত ॥ কিন্তু·· তিন ভাগ হলে···এক এক ভাগে কি পড়বে আমি তাই ভাবছি।

দন্ত ॥ কিন্তু তিনভাগ না হলে হসন্ত ব্যাটা ছুটবে কোতোয়ালের বাড়ী—শাসিয়ে গেল···শুনলে না?

হন্ত ॥ ও ব্যাটা হসন্তকে একেবারে অন্ত করে দেওয়াই ভালো, কি বলো?

দন্ত ॥ আমার মনের কথাটি বলেছ ভাই হন্ত!

হন্ত ॥ কিন্তু···দুভাগ হলেও বহু কম—বহু কম হবে না কি?

দন্ত ॥ তার মানে, এক ভাগই করতে চাও নাকি?

হন্ত ॥ হলে ভালো হতো নাকি?

দন্ত ॥ আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু শেষে এত ভেবে দেখলাম, তোমাতে আমাতে লড়াই হলে, হয় তুমি মরবে না হয় আমি মরবো, কে যে মরবে তার তো কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই! তাই বলছিলাম—

হন্ত ॥ বেশ, তবে দু'ভাগই হোক—তোতে আর আমাতে—

দন্ত ॥ হ্যাঁ, আর ঐ ব্যাটা হসন্ত—আসামাত্রই অন্ত।

হন্ত ॥ চুপ, ব্যাটা আসছে! এসে দাঁড়ানো মাত্র ফল নিতে গিয়েই দুজনে এক সঙ্গে ওকে ছুরি মারবো বুঝলে?

দন্ত ॥ হুঁ!

[কতকগুলি ফল লইয়া হসন্ত আসিল।]

হসন্ত ॥ যাক্ তাহলে ধর্ম আছে পালাও নি দেখছি!

দন্ত ॥ সে কি ভাই! তিনজনে হচ্ছি আমরা জন্মজন্মান্তরের বন্ধু। কেউ কাউকে ফাঁকি দিতে পারি। দে ভাই দে—খেতে দে—

হন্ত ॥ খিদেতে মারা গেলাম রে ভাই হসন্ত! মাত্র ওই কটা ফল এনেছিস! কি ফল রে? পেয়ারা?

হসন্ত ॥ হাতের কাছে যা পেলাম, আনলাম।

[হন্ত ও দন্ত ফল খাইতে গিয়া একসঙ্গে হসন্তকে ছুরিকাঘাত করিল।]

হসন্ত ॥ [মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে করিতে) তোদের মনে এই ছিল! ওরে, তোদের মনে এই ছিল! আমি তোদের জন্যে ফল আনলাম, আর তোরা কিনা আমায়—অঃ! আঃ!

হন্ত ॥ ফল এনেছিস, খাচ্ছি—

দন্ত ॥ হঁ্যা, দুঃখ কি? তোর ফল একটাও পড়ে থাকবে না, এই দেখ—

[হন্ত ও দন্ত ফলে কামড় দিতেই হসন্ত মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।]

হসন্ত ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[হন্ত ও দন্ত ফল খাওয়া মাত্র ঢলিয়া পড়িল।]

হসন্ত ॥ ভেবেছিলাম, তোদের ফাঁকি দেবো। তাই ফলগুলোতে বিষ মাখিয়ে এনেছিলাম—

[হন্ত ও দন্ত মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর, আর্তনাদ করিতে লাগিল।]

হসন্ত ॥ তা দেখছি, কেউ কাউকে ফাঁকি দিতে পারলাম না! জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধু আমরা—এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে ভাই। সন্ন্যাসী ঠিকই বলেছিল দেখছি—লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু!

[তিনজনেই ক্রমশঃ মৃত্যুবরণ করিল। সোনার তাল যেখানে ছিল, সেখানেই পড়িয়া রহিল।]

[যবনিকা]

হাতি এবং নাতি

শ্রীপলাশ মিত্র

হাতিবাগানের হাতি
চালতাপাকুড় খেয়ে যে তার
ইয়া বুকের ছাতি।

হঠাৎ সেদিন উপোস ক'রে
বললে, আমি গেলুম ম'রে
জল্‌দি-জল্‌দি আনরে কিনে
কাশীর জরদা পাতি:
খবর শুনেই ফেললো কেঁদে
হাতির ছোটো নাতি।



উচিত জবাব

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

বজরাতে উঠি' আকবর শাহ নিত্যদিনের মত,—
প্রথমে শুধান সবার কুশল পাত্র মিত্র যত।
তারপর নানা গল্পের ছলে ধর্মের কথা উঠে,—
যমুনার জল আরো কালো হয়, আকাশেতে তারা ফোটে।
বাদশা হঠাৎ প্রশ্ন করেন, "দেখ হে টোডরমল !—
আমাদের চেয়ে তোমার দেবতা—অসহায় দুর্বল।
তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতার কত না বাহন আছে,
তবু কেন তাঁরা নিজে ছুটে যান ভক্তজনের কাছে ?
আমার খোদার অঢেল দোয়া, এমনি মেহেরবাণী,—
পয়গম্বর দুঃখ ঘোচান, পীরেরা মোছান পানি।
আসমানে বসে খোদাতালা শুধু করেন হুকুম জারি,—
ভক্তের তরে তামাম বিশ্বে তালিম চলিছে তারি।"
"এ বড় দুরূহ কঠিন প্রশ্ন", হেসে বীরবল কয়,—
"বন্ধুর হ'য়ে উচিত জবাব দেবো আমি নিশ্চয় !
আদেশ করুন তবে, জাঁহাপনা, সাতদিন পরে ফের—
পণ্ডিতে পুছি' দেবো সমুচিত উত্তর প্রশ্নের।"
আগ্রায় ফিরে বন্ধু দু'জন—পরামর্শের পর—
আনলেন ডেকে আগ্রার সেরা নাম করা কারিগর।
কহিলেন তাঁকে বীরবল ডেকে, "শোন হে শিল্পী ভাই,
একটি দামাল ছেলের মতন মোমের পুতুল চাই।
দিতে পারো যদি ঠিক বাদশার ছেলেটির মত করে,
যত চাও দেবো মোহর কেবল তোমার দু'হাত ভরে।"
প্রস্তাব শুনি' কহিল শিল্পী, "একশ মোহর পেলে,
আমি, জাঁহাপনা, গড়ে দেবো সেই নিখুঁত জ্যান্ত ছেলে।"

সাধনার মাঝে সার্থক হ'বে জাগ্রত অনুভূতি—
বিদায়ের কালে জানালো শিল্পী সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি!
সপ্তাহ পরে জ্যোৎস্না-প্লাবন এসেছে যমুনা কূলে,—
সেদিনের সেই প্রশ্নের কথা বাদশা গেছেন ভুলে।
যমুনার স্রোত ধীরে বয়ে যায়, উঠে কল্লোল তান—
তানপুরা ল'য়ে মাতোয়ারা সুরে তানসেন গাহে গান।
"সাবাস! সাবাস!" চলছে তারিফ, বাদশাহ মশ্‌গুল,-
তন্ময় যেন আকাশের চাঁদ, শ্রোতারাও বিলকুল!
বজরাতে বসে মতলব ভাঁজে একপাশে বীরবল,—
মাঝ্‌দরিয়ায় রাংতার মত চিক্‌ চিক্‌ করে জল!
সামনে ঘুরেই হঠাৎ নৌকা বাঁদিকে যখন টলে,—
চমকে তখন বাদশা দেখেন কি যেন পড়েছে জলে!
যায় বুঝি ডুবে যমুনার জলে বাদশার ছোট ছেলে,—
ঝাঁপ দেন জলে বাদ্‌শা সহসা সভা পরিষদ ফেলে।

হাঁ হাঁ করে উঠি' বীরবল বলে, "একি, একি সম্রাট!—
একটি মোমের পুতুলের তরে এত কেন বিভ্রাট?
নফর বান্দা সকলেই পারে তুচ্ছ যে কাজ হেন,—
তার-ই উদ্ধারে শাহন্‌শাহ আপনি স্বয়ং কেন?
একবার যদি করতেন শুধু একটু আদেশ দান,—
পুতুলের তরে প্রস্তুত ছিল বান্দারা দিতে প্রাণ!"
জল থেকে উঠি' বাদশা বলেন, "নিজ সন্তান জ্ঞানে,—
হৃদয়ের টানে ঝাঁপ দিয়েছিনু যমুনার মাঝখানে।
ছেলের বিপদে স্বয়ং পিতার চুপ করে থাকা দায়,—
স্নেহের তাগিদে সব অহমিকা মন থেকে মুছে যায়।"
বীরবল বলে, "পেয়েছি জবাব প্রশ্নের জাঁহাপনা,—
মোর দেবতার সবচেয়ে প্রিয় ভক্ত-আপন-জনা।
তাই পুত্রের বিপদ জ্ঞানেই ভক্তজনের প্রেমে,—
আমার দেবতা বার বার করে মর্তে আসেন নেমে।"



বাড়ী বদলের কাহিনী

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

যে বাড়ীটায় আমরা এতদিন ছিলাম সেটায় আমাদের আর কিছুতেই কুলোচ্ছিল না—কম করে আরও দুটো ঘর অন্ততঃপক্ষে দরকার। কিন্তু দরকার বললে কি হবে, দরকার মত বাড়ী খুঁজে পাওয়া যে অসম্ভব। কলকাতা সহরে পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায় শুনেছি, কিন্তু প্রাণ দিলেও যে তোমার দরকার মত বাড়ী পাবে না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। কলম্বস যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁকেও চ্যালেঞ্জ করলে তিনি হেরে যেতেন—বলতেন—ভাইরে, আমেরিকা আবিষ্কার করা এ বাড়ী আবিষ্কার করার চেয়ে অনেক সোজা ছিল।

যাই হোক আমার ছোট ভাই মিণ্টু চমৎকার একটা বাড়ীর খোঁজ এনে দিল ভবানীপুরে টাউনসেণ্ড রোডের উপরে। আমাদের বাড়ীর সকলে পাক্কা সাতটি মাস ধরে বাড়ী খুঁজে বেড়িয়েছি—খবরের কাগজের "বাড়ী ভাড়া" দেখে দেখে চশমার পাওয়ার বেড়ে গেছে তবুও একটিও দরকার মত বাড়ী মিলল না—শেষকালে ঐ পুঁচকে মিণ্টেটা আমাদের সকলকে মেরে দিল। চমৎকার বাড়ীটা, আর সবচেয়ে চমৎকার দোতলার দক্ষিণের ছোট্ট ঘরটি। একজনের থাকার পক্ষে এমন সুন্দর ঘর বেশী দেখা যায় না। একপাশে একটি ছোট খাট থাকবে আর একদিকে থাকবে চেয়ার টেবিল—মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁক দিয়ে একটি কোণে ছোট একটি আলমারি···বাঃ চমৎকার হবে! বাবাকে বললাম, "ঐ ঘরটা আমার হলে বড় সুবিধা হয়—বেশ নির্জ্জনে পড়াশুনার সুবিধা···" বাবা রাজী হলেন। সেইদিনই নিজের মনের মত করে ঘরটি গুছিয়ে নিয়ে অধিষ্ঠান করতে সুরু করে দিলাম। এ ঘর স্বর্গ! মিণ্টুটার জন্যই তো হোলো—ওকে ডেকে আমার পুরানো ফাউনণ্টেন পেনটাই দিয়ে দিলাম পুরস্কার স্বরূপ। তবে একটা কথা—কোথাও নতুন বাড়ী ভাড়া নিলে বাড়ীটা শুধু ভাল হলেই চলে না, প্রতিবেশী ভাল না হলে বড় মুস্কিল। যে বাড়ীটা ছেড়ে চলে এলাম তার পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার

এত ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল—এত ভাল লোক তাঁরা। তার উপর তাঁদের বাড়ীতে ছিল হুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে—বয়সে বোধহয় বছর সাত-আট হবে। কি মিষ্টি, কি সুন্দর তারা। তারা ছিল আমার খুব প্রিয়।

এ পাড়ায় এসে নতুন বাড়ীতে ভাল ঘর পেয়ে যেমন আনন্দ হোলো—দুঃখও হোলো তেমনি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গ হারিয়ে। নিজের ঘরটায় বসে সেদিন কত কি ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি আমার ঘরের পুবদিকের জানালা থেকে হাত-কয়েক দূরে পাশের বাড়ীর জানালায় একটি বছর ছয়েকের ছেলে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলে—"এই, এই!" আমি চোখ তুলে তাকাতেই এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম—ওঃ! শুধু সুন্দর ঘর নয়! সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর ছোট একটি ছেলে আমারই পাশের বাড়ীতে। চীৎকার করে উঠলাম—"মিণ্টু, মিণ্টু!"

মিণ্টু ছুটে এল, বললে, "কি বলছ দাদা?"

"আরে, এই বাড়ীটাতে একটা ছোট ছেলে আছে রে—আমাকে এক্ষুণি ডাকছিল।

"ছেলে আছে তা কি হয়েছে?"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম—"ওর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।"

মিণ্টু আমার কথায় বাধা দিয়ে বললে, "আলাপ করতে হয় তুমি করগে, আমার তাতে কি?"—বলে মিণ্টু যেন একটু বিরক্তভাবেই চলে গেল। ও চায় যে ওকেই কেবল আমি ভালবাসব, আর কাকেও ভালবাসা ও সহ্য করতে পারবে না। আমি বাড়ীর ভিতর ছুটলাম। সকলকে এ সংবাদ দিতে লাগলাম। মেজদা তোয়ালে কাঁধে করে বাথরুমের দিকে যাচ্ছে, বললাম—"মেজদা, পাশের বাড়ীতে একটি লাভলি বয়"—মেজদা হেসে বললে, "দেন এ কিংডম্ ফর ইউ, এ্যাঁ!"

ছোড়দি দেখি পান সাজছে ভাঁড়ার ঘরে, বললাম—"ছোড়দি, পুতুলের মত একটি ছেলে পাশের বাড়ীতে, কি সুন্দর দেখতে, চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া, ধব্-ধব্ করছে রং—মুখখানা দুষ্টুমিতে মাখা—" ছোড়দি মুখটা একটু ভার করলে; ওর ছেলেটা দেখতে ভয়ানক খারাপ যে, ও কারো ছেলেকে ভালো বলা বা ভালোবাসা সহ্য করতে পারে না।

চীৎকার করে ডাকলাম—"মা, ও মা।"

মা তখন সমস্ত জিনিষপত্র গোছাচ্ছেন—মহা ব্যস্ত, বললেন, "কি চেঁচাচ্ছিস কেন?"

বললাম, "মা, পাশের বাড়ীতে সুন্দর ছোট্ট একটি ছেলে—"

মা বললেন, "এই জন্যে এত চেঁচানো? তা, নিয়ে এস সেই মূর্তিমানকে মাথায় করে নাচি; জ্বালাতন, ও-বাড়ীতে দুটোয় পাগল করে দিত আবার এ-বাড়ী এসেও জুটেছে ঠিক?"

কেউ দেখি বিশেষ খুসী হোলো না—কেন যে হয় না বুঝি না। ছোট ছেলেমেয়েরা হয়ত একটু দুষ্টুমি করে, হয়ত একটু জিনিষপত্র নষ্ট করে; কিন্তু তাতে কি হয়? যখন মিষ্টি কথা বলে, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে; কি আনন্দ যে হয় তখন তা এরা কেউ বোঝে না।

সেইদিনই আলাপ করলাম—ছেলেটির সঙ্গে নয়, ছেলেটির বাবার সঙ্গে। শুনলাম ছেলেটি তাঁদের বড় আদরের। চার মেয়ের পর ঐ ছেলেটি—ও ওঁদের চোখের মণি।

ভদ্রলোককে বললাম—"সুরেশবাবু, আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেবেন। আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বড্ড ভালবাসি।" সুরেশবাবু একটু হেসে বললেন—"বেশতো, তবে, ও যা দুরন্ত!"

আমি বললাম—"দুরন্তই তো ভাল; ছেলেপিলে দুষ্টুমি করবে না তো কি আপনি আমি দুষ্টুমি করব—"

ভদ্রলোক খুসী হয়ে বললেন—"তা সত্যি!—বেশ, তবে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়ারও দরকার হবে না—ও নিজেই আলাপ করে নেবে।"

হলোও ঠিক তাই—পরের দিন সকালে দেখি সেই ছেলেটি জানালায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে—"এই এই—ই—" আমি মুখ তুলে তাকালাম। আজ আর সে পালালো না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তুই কে?"

খুব ভাল লাগল—আমি বললাম, "আমি তোমার বন্ধু—" ও এবার মুখ ভেংচে বলল—"বন্ধু না 'কচু'!"

বললাম, "বেশ, তোমার আমি আজ থেকে 'কচুই' হলাম—"

কলেজের বেলা হয়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি কলেজ চলে গেলাম।

বৈকালে বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম জানালার ধারে—কিন্তু দেখা পেলাম না তার। একবার ভাবলাম ডাকি—'বন্ধু'—না না, 'কচু',—কিন্তু ওদের বাড়ীর লোকে কি ভাববে ভেবে আর ডাকলাম না।

…পরদিন সকালে নীচে চা খেতে গিয়েছি—খানিক পরে দেখি মিণ্টু টা চেঁচাতে চেঁচাতে এসে হাজির—"ছোড়দা তোমার ঘর কি হয়েছে দেখবে চল!"

সকলেই জানত আমি অত্যন্ত গোছালো পরিষ্কার লোক। কোনও জিনিষ এদিক-ওদিক হলে আমার মহা অস্বস্তি মনে হয়। আমি চমকে উঠলাম, বললাম, "কি হয়েছে রে?"

মিণ্টু একটু মুচকি হেসে বললে, "চল না দেখবে।"তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি আমার ঘরটায় নরক কাণ্ড হয়েছে। সমস্ত ঘর পেয়ারার খোসা আর ছিবড়েতে বোঝাই—খাট, বিছানা, বই-এর টেবিল, চেয়ার, সব ভরে গেছে। দেখেই আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল—চীৎকার করে উঠলাম, "কে করেছে এসব?" "হিঃ হিঃ! আমি করেছি"—তাকিয়ে দেখি ওদিকে জানালায় দাঁড়িয়ে ওদের বাড়ীর সেই খোকন—তার হাতে তখনও একটা পেয়ারা।

আমার পিছু পিছু এসেছিল অনেকে—সবাই হেসে উঠল। ছোড়দি বলল "কেমন লাগছে এখন?"

আমি তখন নরম হয়ে গেছি, বললাম, "তাতে কি হয়েছে, ছেলেমানুষে করেছে তা কি হয়েছে?"

ছোড়দি বললে, বেশ একটু বিরক্ত হয়েই—"বেশতো, কিছু হয়নি। কিন্তু অন্য কেউ পরিষ্কার করে দেবে না—নিজেই পরিষ্কার করো।"—

ঘর নিজে পরিষ্কার করলাম—কিন্তু খারাপ লাগল না কিছুই—ছেলেমানুষ যদি একদিন করেই থাকে ঘর ময়লা! ‥কিন্তু একদিনের উপর দিয়েই গেল না; দু'দিন পরে দেখি ঘরটি ধূলো কাদায় ভর্তি। ও-বাড়ীর খোকন ফেলেছে বুঝলাম—কাকেও কিছু না বলে সেদিনও পরিষ্কার করে ফেললাম; কিন্তু এবার একটু বিরক্ত বোধ করলাম। এরপর আবার একদিন কলেজ থেকে এসে দেখলাম পেয়ারার ছিবড়ে বা ধুলো-কাদা নয়—বড় বড় ইঁট ঘরের চারদিকে ছড়ানো—একটা ইঁট টেবিলের উপরকার দোয়াতটায় লেগে দোয়াতটি গেছে উল্টে—কালিতে টেবিলক্লথ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—দু'একখানা বইয়েতে কালির দাগ লেগেছে। জানালার কাছে ছেলেটা আসতেই বেশ বিরক্তভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম—"ঢিল ছুঁড়েছ কেন?" সে বেশ অম্লানবদনে সব কটি দাঁত বার করে বললে, "বেশ করেছি, আবার করব—"

বুঝলাম এ-ছেলে সাধারণ নয়—ও-বাড়ীর শিবরাত্রির সলতে এ-ছেলে শুধু দুরন্ত নয়, এ ছেলে ভীষণ!

জানালায় মোটা দেখে পর্দা টাঙিয়ে দিলাম—ইট পাটকেল, ধুলো-বালি পড়া বন্ধ হলো; কিন্তু বিপদ হলো আর এক দিক দিয়ে। আমার কলেজ বন্ধ হলো টেস্টের পর। আগে সকালে নটায় কলেজে চলে যেতাম, ফিরতাম বৈকালে বা সন্ধ্যায়। কাজেই ও-বাড়ীর খোকনের সাক্ষাৎ পরিচয় বিশেষ পাইনি কারণ সন্ধ্যাবেলা সে ঘুমিয়ে থাকত, আর সকালবেলা কতটুকু সময়ই বা! কিন্তু এখন সমস্ত দিনের যা পরিচয় পেতে লাগলাম তাতে বুঝলাম এইসব ছেলে বড় হলেই বোম্বেটে হয়।

আমার পরীক্ষা সম্মুখে—অঙ্কে অনার্স। পাগল হয়ে গেছি পরীক্ষার চিন্তায়। দিনরাত আমার তখন অঙ্ক করা দরকার, ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স না পেলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে বসলাম; কিন্তু কার সাধ্যি যে একটা অঙ্ক কষে! কি চীৎকার সারাদিন—কি হৈ হৈ রৈ রৈ ঐ একটা ছেলেতে করছে। কেউ কিছু বলে না বা বলতে পারে না। ওর দিদিরা কেউ কখনও যদি ওর অত্যাচারে অস্থির হয়ে কিছু প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবা তাড়া দিয়ে ওঠেন—বলেন, "হয়েছে কি? আহা গলে গেলেন, ঐটুকু ছেলে একটু চুল ধরে টেনেছে কি একটু গায়ে হাত দিয়েছে তো মরে গেলেন—মা খেঁকিয়ে ওঠেন,—"ও মেয়ের হিংসে ওর উপর; একটু কিছু হলেই বাড়ী মাথায় করে।" বুড়ী ঠাকুমা বলেন—"তা একটু সহ্য করতে হবে বৈকি দিদি; তোরা হলি চার-চারটে মেয়ে—আর ও-তো ঐ একটি সাত রাজার ধন এক মাণিক—"

কাজেই বুঝলাম ও মাণিকের দৌরাত্ম্য, সমানেই চলবে। কি সে করব বসে বসে তাই ভাবছি সেদিন। বাড়ীতে কাকেও বললে তো আর রক্ষে থাকবে না—বসে বসে ভাবছি এমন সময় শুনি পাশের বাড়ীর ছোট একটি মেয়ের করুণ আর্তনাদ, "উঃ বাবারে, মরে গেলাম রে—ওরে বাবারে, ওরে বাবারে—"

বুঝলাম—সাত রাজার ধন খোকনমণি তার কোন দিদির উপর বিশেষ রকম একটা কিছু অত্যাচার করছে।

দু'মিনিট আর্তনাদ চলল। আমি জানি যতক্ষণ ঐ মাণিক নিজের ইচ্ছায় তাঁর অত্যাচার না থামাবেন যতক্ষণ মেয়েটিকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে; বাড়ীর কেউ এসে ওর ওই অত্যাচারে বাধা দেবে না। কিন্তু হঠাৎ আর্তনাদ গেল থেমে, তার পরেই যেন মনে হলো কার পিঠে মাথায় বেশ দু'চার ঘা

পড়ল জোরে; সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার। বুঝলাম খোকনের দিদি আর সহ্য করতে না পেরে আজ দিয়েছে দু' ঘা বসিয়ে।

খোকনের জীবনেও বোধহয় এটি প্রথম প্রহার। অন্য সময় হলে এটুকু ছেলেকে মারলে আমি হয়ত ক্ষেপে যেতাম। আজ দেখলাম আমার বেশ আনন্দই হলো—মনে হলো আরও দু-ঘা দিল না কেন ওকে। খোকনের গায়ে হাত! তার মা এসে মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে দিলেন ভীষণ প্রহার—বাবা এসে কান দুটো টেনে বোধহয় ছিঁড়েই ফেললেন। সত্যিই তো, সাত রাজার ধন এক মাণিক—তার গায়ে হাত! ঠাকুমা এসে বললেন, "ওকে আজ খেতে দিও না, ঘরে বন্ধ করে রাখ।"···এদিকে সেই মাণিকের কান্না থামে না কিছুতেই; কত আদর, কত খাবার, কত খেলনা—কিছুতেই কি না—সমানে সেই কান্না—"ছোড়দি আমায় মারলে কেন?" সবাই বোঝাচ্ছে যে ছোড়দির তার জন্য খুব শাস্তি হয়েছে, খেতে দেওয়া হয়নি—ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তবুও তার কান্না থামে না।···বিরক্ত হয়ে উঠলাম, আমার অঙ্ক কষা মাথায় উঠে গেল। এই ব্যাপার যখন ঘটল তখন সকাল আটটা—সেই থেকে খোকনের কান্না সুরু হলো, আর বেলা দশটাতেও থামল না। সমানে সেই এক কথা বলে কান্না—"ছোড়দি আমায় মারলে কেন?" স্নান করে খেয়ে-দেয়ে উপরে গিয়ে দেখি তখনও সমানে চলছে—"ছোড়দি আমায় মারলে কেন? ছোড়দি আমায় মারলে কেন?" আমি হতাশ হয়ে অঙ্কের বই এবং খাতা বন্ধ করে বিছানায় সটাং চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার একটা খেয়াল হলো, আচ্ছা, গুনে যাই কতবার বলে—"ছোড়দি আমায় মারলে কেন?" শুয়ে শুয়ে গুনতে আরম্ভ করলাম—এক, দুই,···তিরিশ···সাতাশী···একশ উনিশ··· দুশ তিপ্পান্ন···তিনশ ষাট···সাতশ নব্বই···

মাথার মধ্যে কি-রকম করতে লাগল—চোখে যেন সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। কোন দেশে শুনেছিলাম মহা গুরুতর অপরাধ করলে শাস্তি হত, হাত-পা বেঁধে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে কোনও একটা শব্দ তার কানের কাছে এক নাগাড়ে করে যাওয়া—শেষকালে সে লোকটা পাগলের মত চীৎকার করতে আরম্ভ করত। আমিও আর খানিকক্ষণ ঐ কান্না শুনলে পাগল হয়ে যাব। কিন্তু কি করি—ডাকলাম মিণ্টুকে—"মিণ্টু, গুণে যা ঐ কান্না, ভাল একটা ফাউণ্টেন পেন—পুরানোটা আর তোকে ব্যবহার করতে হবে না।"

মিণ্টু ফাউণ্টেন পেনের লোভে গুনতে আরম্ভ করল আমার গোনার পর থেকে। সাতশ একানব্বই, সাতশ বিরানব্বই।

আমি বার হয়ে গেলাম—একটু মাঠের দিকে। ঘুরে-ফিরে ঘণ্টাচারেক পরে বাড়ী ফিরে দেখি···বেচারা মিণ্টু! আমার বিছানার উপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—সামনে একটা প্রকাণ্ড কাগজ পড়ে—তাতে পর পর বহু সংখ্যা দু'হাজার তের পর্যন্ত লেখা রয়েছে—কান্না কিন্তু তখনও চলেছে, তবে অনেকটা ঢিমে হয়ে এসেছে।

যাই হোক, মানুষ তো—দম ফুরোবেই এক সময়—কাজেই সন্ধ্যার পর সে থামল। কিন্তু আবার এক মুস্কিল বাধল এমন একটি জিনিষ নিয়ে যার দম তাড়াতাড়ি ফুরোয় বটে কিন্তু তাকে দম দিতেও বেশীক্ষণ লাগে না। সেটি হচ্ছে গ্রামোফোন। খোকনের কান্না থামাবার জন্য তার বাবা এনে দিলেন একটি কলের গান। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল সেই কলের গান। খোকনের আব্দার—থামাবার উপায় নেই—কখনও তার দিদিরা গান দিচ্ছে কখনও তার মা দিচ্ছেন কখনও বা চাকরেও দিচ্ছে। তাই কি নানা রকমের গান? তা নয়, একটিমাত্র গান—"চাঁদের আলো ছড়িয়ে গেলো সারা আকাশময়"—সেইটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে লাগল। সকালে শুনি "চাঁদের আলো—" দুপুরে খেয়ে এসে শুনি "চাঁদের আলো—" বৈকালে বেড়িয়ে এসে শুনি "চাঁদের আলো—।" "চাঁদের আলো" আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেপিয়ে তুলল।

পাক্কা তিনটি দিন "চাঁদের আলো—" শোনবার পর বাধ্য হয়ে আমায় গৃহত্যাগ করতে হল। আমার একটি বন্ধুর বাড়ী আশ্রয় নিলাম—বাড়ীতে বললাম, "দুজনে একসঙ্গে পড়লে পড়ার সুবিধা হবে।"—ভোরে উঠে চলে যেতাম আর রাত্রে ফিরতাম, তখন ওদের খোকনমণি পড়তো ঘুমিয়ে। এমনি ভাবে চলল কিছুদিন—হঠাৎ সেদিন সকালে উঠে পাশের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিয়ে আবার তাকালাম—হ্যাঁ ঠিক, ভুল নয়।—আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করল। মনে হলো চেঁচিয়ে গান করি। ভাবলাম, আজ একটা কিছু করতে হবে এই আনন্দের দিনে। বায়োস্কোপ যাব? না, মোটর ভাড়া করে বেড়িয়ে আসব? না; আজ সন্ধ্যাবেলা একটা ছোট-খাট ভোজ দেওয়া যাক। তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লাম বন্ধু-বান্ধব ও কয়েকজন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ

করে এলাম—পাড়ার দুচার-জনকেও নিমন্ত্রণ করলাম, এমনকি সুরেশবাবুকেও। সকলেই একটু বেশ অবাক হয়ে গেল। দিদিমার দেওয়া টাকাগুলি পোস্ট অফিস থেকে তুলে এনে বাজার করে আনলাম—সন্ধ্যাবেলা বিরাট আয়োজন করে ফেললাম। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই বেশ তৃপ্ত হয়েই খেল—সুরেশবাবু এসেছিলেন, তিনিও খেলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আমি সুরেশ-বাবুকে দুঃখিত ভাব দেখিয়ে বললাম, "আপনারা এ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কি যে খারাপ লাগছে তা কি বলব! বিশেষতঃ খোকনের অভাব হয়ত সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।" মনে মনে ভাবলাম, বাড়ী ছেড়ে ওঁরা গেলে বাঁচি—মা কালীকে পূজো দেব···কিন্তু সুরেশবাবু অবাক হয়ে বললেন—"আমরা উঠে যাব আপনাকে কে বলল ?"

আমার মাথাটা গুলিয়ে গেল—বললাম, "সকালে দেখলাম আপনাদের বারান্দায় 'টু-লেট' টাঙানো রয়েছে।"

সুরেশবাবু হেসে উঠলেন—বললেন, "ও, ঐটে আমাদের ঐ পিছনের বাড়ীটার জন্য। রাস্তা থেকে ও-বাড়ী তো দেখা যায় না, তাই আমাদের বাড়ীতেই বাড়ীওয়ালা টাঙিয়ে রেখেছে।

তখন আমার সামনে পৃথিবী টলছে। কি অন্যায়, ভাড়া দেবে একটা বাড়ী, আর একটা বাড়ীতে 'টু-লেট' টাঙানো ? চীটিং চার্জ—মানুষ ঠকানোর দায়ে এদের জেলে দেওয়া উচিত। সেই রাত্রে আমার জ্বর এল। এবার সকলকে আমার দুঃখের কথা খুলে বললাম। আমার এই চরম অবস্থা দেখে আর কেউ ঠাট্টা করলে না—সে বাড়ী আমাদের ছাড়তে হলো শেষ পর্যন্ত।

আমরা দু'বৎসর হল হরিশ মুখার্জির রোডে আর একটা বাড়ীতে উঠে এসেছি,—ও-বাড়ীটার মত না হলেও এ বাড়ীটা মন্দ নয়, তবে একটা সৌভাগ্য যে, পাশাপাশি কোথাও খোকন নেই······

টাউনশেণ্ড রোড দিয়ে মাঝে মাঝে যাই, রোজই দেখি আমরা যে-বাড়ীটা ছেড়ে এসেছি সেটাতে "টু-লেট" টাঙানো, সমানে দু'বৎসর ধরে খালি পড়ে আছে, ভাড়া হচ্ছে না। সেদিন দেখি 'টু-লেট'-এর তলায় আর একটি লাইন যোগ করা হয়েছে, "পাশের বাড়ীর সে খোকনেরা উঠিয়া গিয়াছে।" বুঝলাম এইবার ও বাড়ীটা ভাড়া হবে, কিন্তু যে পাড়ায় খোকনরা গেছেন সে পাড়ায় আশপাশের দু'চারটে বাড়ী আবার বেশ কিছুদিনের জন্য খালি হয়ে যাবে।

সবজান্তা

শ্রীধীরেন বল

সব আমাকে জানতে হবেই,
নামটা যে সবজান্তা !
তাই তো চেখে দেখছি যে ভাই—
পান্ত থেকে পান্তা !
দুধ চেখেছি, মাছ চেখেছি,
ভুট্টা এবং বার্লি,
সবাই বলে খেয়ে খেয়েই
পেটের দশা সারলি !
রাজভোগ আর রসগোল্লা
মাছ ডিম আর মাংস,
সবজান্তার জানা তো চাই
সবেরই সারাংশ !
বইপড়া-জ্ঞান ঘৃণা করি,
কাজের বেলা পারবে ?
খেয়ে খেয়ে, ঘুরে ঘুরেই
জ্ঞানের সাগর বাড়বে !
অখাদ্য আর কুখাদ্য সব
দেখছি যে তাই হটকে,
মূর্খ বলে নইলে তখন
দিবি তো ঘাড় মটকে !

গেলাম কন্যাকুমারীতে,
গেলাম কান্যকুব্জে,
সবাই বলে—পা দুখানা
লম্বা হলো খুব যে !
চীন-জাপান আর কিউবা গেলাম,
কেই বা অতো পারবে ?
লাইবেরিয়া সাইবেরিয়ায়
ভটভটিয়া হারবে।
সবজান্তা ক্ষান্ত ত নয়,
অলিম্পিকে ছুটবে,
জানার যতো, আনার যতো
দু'হাতে সব লুটবে !
দেশ বেড়ানোর চেষ্টা এতো,
খাবার এমন চেষ্টা,
চ্যাংড়ামি কী হ্যাংলামি নয়,
নিছক জ্ঞানের তেষ্টা !
এবার দেখো চন্দ্রে যাবো,
তার পরে ঠিক শুক্রে,
বাড়ী থেকে ছাড়বে কি—না—
সেইটা শুধু দুখ্‌্ রে !!



কেটা

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)

ডাক্তারি করি। সাধারণ ডাক্তার নয়, সরকারী ডাক্তার; অর্থাৎ চিকিৎসা যা করি, তার চেয়ে অনেক বেশী করি চাকরি। আজ চাটগাঁয় পাহাড়তলীতে ব'সে কালাজ্বর তাড়াচ্ছি, কাল হয়তো খবর এল—জলপাইগুড়ির টেরাইতে গিয়ে ম্যালেরিয়া ঠ্যাঙাও। এমনি ক'রে রোগজীর্ণা বঙ্গমাতার রোগের ঘাঁটি প্রায় সবগুলোই ফেরা হয়ে গেছে।

তখন আশ্বিনের মাঝামাঝি; শরতের নীলাকাশ জুড়ে রোদ আর ধরে না। চেয়ে চেয়ে মাটী কেমন হাল্‌কা হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা মনে হয় ভারী। থার্মোমিটারটা বগলে লাগাব কিনা ভাবছি, এমন সময় এল এক টেলিগ্রাম। পড়ে দেখি বদলির হুকুম। রাণাঘাটের রেল থেকে দার্জিলিঙের জেল। দার্জিলিঙ্‌!! মনটা যেন নেচে উঠল। এতদিন পরে কপাল ফিরল!

শিলিগুড়ি পৌঁছতেই এক গাদা মোটরওয়ালা ধরলে চেপে। সবারই মুখে এক কথা—"বহুৎ জলদি পৌঁছ যায়গা।"

আমি বললাম—"জলদিই যদি পৌঁছব, তবে দেখব কি?"

আসল কথা, মোটর হচ্ছে অতি পুরাণ জিনিস। কিন্তু ঐ যে ছোট ছোট পালকীর মত খেলাঘরের রেল, ওটা একেবারে নতুন জিনিস, দেখলেই মনে হয় চ'ড়ে বসি। ওতেই উঠলাম। গাড়ী চলল নিবিড়-ছায়া-ঢাকা হিমালয়ের বনপথ বেয়ে, এঁকে-বেঁকে উপরে উঠে, নীচে নেমে, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে। তিনধরিয়া ছাড়াতেই চোখে পড়ে ডাইনে, বাঁয়ে, সুমুখে, পিছনে সহস্রশীর্ষ হিমালয়ের গভীর উপত্যকা, শ্যামলে শ্যামল—কোথাও এতটুকু রুক্ষতা নেই। যে মেঘ ভেসে যায় আকাশে, তাকে দেখলাম পায়ের নীচে বনঝোপের মাথায়। দেখলাম বাতাসিয়া লুপ। যেখানে গার্ডের গাড়ী আর এঞ্জিনে প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি। ইষ্টিশনের নামগুলো—তাতেও যেন পাহাড়ী সুরের মায়া—'রংটং—কার্সিয়াং—টুং—ঘুম্—দার্জিলিঙ্‌।'

যার জায়গায় যাচ্ছি, সেই ডাক্তারবাবুটি একেবারে তৈরী হ'য়ে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন—"এই যে এসেছেন। আমি ক্রমাগত দিন গুনছি।"

আশ্চর্য লাগল, দার্জিলিঙে ব'সেও কেউ দিন গোনে? বললাম—"আপনার এখানটা ভালো লাগে নি?"

"আরে রামো, দায়ে না পড়লে এদেশে মানুষ থাকে? এই দেখুন না, সব দাঁতগুলো রেখে যাচ্ছি, আর নিয়ে যাচ্ছি বাত"—ব'লে তিনি হাঁ ক'রে দাঁতের ফাঁকগুলো দেখিয়ে দিলেন।

তারপর আমাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে বললেন—"এই দেখুন আপনার বাসা, আর এই জিনিসগুলো বুঝে নিন, সরকারী জিনিস, ভালো ক'রে মিলিয়ে নিন, আবার যেন চিঠি লিখে বলবেন না, এটা পাইনি।" ব'লে একটা লিস্ট আমার হাতে দিলেন।

আমি জিনিসগুলো মিলিয়ে নিলাম এবং তাঁর কথামত প্রত্যেক জিনিসের গায়ে ঢ্যারা দিলাম—একটা শিল, আধখানা নোড়া, একটা তিন পা-ওয়ালা চেয়ার, গোটা দুই বালতি, একটা জলের ড্রাম (তাতে চাল থাকে), একটা ভাঙা টিনে খানিকটা ফিনাইল ইত্যাদি। আমি বুঝে নিয়ে সই দিলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন—"আর একটা জিনিস আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি যখন একা এসেছেন, কাজে লাগবে।" বলেই হঠাৎ বাড়ী ফাটিয়ে হাঁক দিলেন—"কেটা, এই কেটা—আ-আ-আ!" কেউ সাড়া দিলে না।

তিনি তখন রান্নাঘরে গিয়ে একটা ছেলেকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন। বছর পনেরো বয়সের একটা পাহাড়ী ছেলে, ঠোঁট দুটো অতিরিক্ত সিগারেট টেনে টেনে কালো, চোখ দুটো লাল, পরনে ফর্সা বেনিয়ান আর ভীষণ ময়লা স্থরুয়াল (পায়জামা); তার চেহারা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে কোনও দিন সে জলের মুখ দেখে নি।

আমি বললাম—"এটিও কি সরকারী নাকি? কিন্তু লিস্টে তো পেলাম না!"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন—"আজ্ঞে না, এটি আপনার প্রাইভেট, চমৎকার Combind hand—একাধারে ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান, বেয়ারা; সব করবে—জুতা ঝাড়া থেকে ভাত রাঁধা। খুব কাজের লোক, তবে ঘুমটা একটু বেশী।"

বললাম—"তোর নাম কি রে?"

কেটা গম্ভীরভাবে বললে—"ব্যম্ বাহাদুর গুড়ুম।"

অর্থাৎ কেটা মানে কেউকেটা নয়, রীতিমত ব্যম্ বাহাদুর গুড়ুম। শুনে

ভয় হ'ল, কেননা, দিনের মধ্যে বার পাঁচেক ব্যম্ বাহাদুর আওড়ালে মাস-খানেকেই দম ফুরোবার সম্ভাবনা। ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিলেন—"ও সব ছেড়ে দিন্, ওর নাম কেটা, এদেশে সব ব্যাটাই কেটা।"

ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছিলেন। কেটা খুবই কাজের লোক। শুধু একজন লোক চাই তাকে জাগিয়ে রাখতে। ডাক্তারবাবু সেটা নিজেই করতেন। তাঁর বাজখাঁই গলার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে তাঁর বাড়ীতে আর যাই থাক, ঘুম যে থাকতে পেত না এ কথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মুস্কিল হ'ল আমার, হয়তো জলতেষ্টা পেয়েছে, বললাম—"কেটা, এক গেলাস জল দে তো।"

কেটা অমনি গেলাস হাতে ছুটলো। আর দেখা নেই। মিনিট পনেরো পরে গিয়ে দেখি ডান হাতে গেলাস, বাঁ-হাত কুঁজোর গায়ে—কেটা ঘুমুচ্ছে।

সকাল ন'টায় বললাম—"কেটা, এক সের মাংস লে আও।" যখন সে ফিরল, তখন বেলা দুটো, কি ব্যাপার? রাস্তায় চলতে চলতে ঘুম পেয়ে গেল। প'ড়ে গেল সেখানেই, পুলিশ এসে ডেকে দিয়েছে। সকাল নেই, দুপুর নেই, পাইখানার সিঁড়িতে, বাথরুমে, কয়লার গাদায়, উনুনের ধারে, কেটার নাক ক্রমাগত ডেকে চলেছে; কিন্তু তোমার ডাক তার কানে পৌছবে না, অনিদ্রা রোগের চিকিৎসা অনেক করেছি, এবার এই অতিনিদ্রা রোগ নিয়ে পড়লাম। খুব কড়া চা খেতে দিলাম, ফল হ'ল উল্টো। আগে কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচালে উঠত এখন টেনে না তুললে ওঠে না। তখন ব্যবস্থা হ'ল ঠাণ্ডা সরবৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ফল। সরবৎ কি খেতে চায়, জন দুই কয়েদী চেপে ধ'রে তিন বেলা সরবৎ খাওয়ায়! মাসখানেক পরে ঘুমটা একটু কমে এল।

তোমরা মনে যাই কর, আমি একটু সাহেবী ধরণের লোক। চাকরদের নাম ধ'রে হাঁক-ডাক আমি পছন্দ করি নে। আমার পকেটে সব সময়ে একটা 'কলিং বেল' থাকে, যখন দরকার হয় বাজিয়ে দিই। এখানেও সেই নিয়ম চালাতে সুরু করলাম। সেদিন কয়েকজন হোমরা-চোমরা বন্ধু এসেছেন; চা চাই, কলিং বেল ঠুকে দিলাম—একবার, দু'বার, তিনবার, কোন সাড়া নেই, অগত্যা গলা ছাড়তে হল, তাতেও জবাব নেই। উঠলাম, গিয়ে দেখি উনুনের উপর আলুর দম পুড়ে কয়লার দম হ'য়ে গেছে, কাছে শুয়ে ব্যম্ বাহাদুরের নাসিকা গর্জনে রান্নাঘর গম গম করছে। টেনে তুলে বললাম—"চা লে আও চার কাপ,—জলদি।"

কেটা সঙ্গে সঙ্গে বললে—"ল (অর্থাৎ আচ্ছা)।"

মিনিট দশেক পরে বসবার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হ'ল; বম্ বাহাদুর মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে জানালেন—"চিয়া ছৈনা (চা নেই)।"

সর্বনাশ! সে কথা এখানে এসে না জানালেই হত না? তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে জেলারবাবুর বাড়ী থেকে চা আনানো গেল। আবার মিনিট দশেক, দরজা ফাঁক, কেটার মুখ, বললাম—"কি রে!"

জবাব এল—"চিনি ছৈনা।" সেটাও আনানো গেল, আশা করছি এবার চা আসবে।' পাঁচ মিনিট পরে দরজা সবটা খুলে গেল। কেটার শুধু মুখ নয়, সর্বশরীর প্রকাশিত হ'ল, বললাম—"কি হ'ল রে?"

—"দুধ ছৈনা।"

বন্ধুরা বললেন—থাক, থাক, আপনার বড্ড কষ্ট হ'ল! চা আমরা বাড়ী গিয়েই খাব।"

জেলার বাবু এলেন, সিগারেট কেসটা আনবার জন্য কলিং বেল ঠুকছি, তিনি বললেন—"কেন মিছে যন্তরটা ভাঙছেন। কলিং বেল তো দূরের কথা, কলিং ঢাক পিটলেও ওর ঘুম ভাঙবে না। তার চেয়ে এক কাজ করুন, একটা লম্বাদড়ি রাখুন তার একদিক থাকবে আপনার হাতে, আর একটা দিক ওর টিকিতে বাঁধা, দরকার হ'লেই এক টান। এ ছাড়া আর পথ নেই।"

সেদিন অফিসে বড্ড কাজের ভিড়। বিকালে সকাল-সকাল বেরোতে হ'ল। বেশ শীত পড়েছিল, কেটাকে ডেকে বললাম—"ঠিক চারটেয় উনুনে আগুন দিয়ে লুচি মাংস ক'রে রাখবি।"

কেটা বলল—"ল।"

ফিরতে রাত সাড়ে আটটা হ'য়ে গেল। ক্ষিধে যা পেয়েছিল, মনে হ'ল পেটের ভিতর একটি নাড়ীও বাকী নেই, সব হজম হ'য়ে গেছে, কিন্তু একি? চারদিক অন্ধকার! কোথাও এতটুকু সাড়া নেই। কেটা পালাল? রান্না ঘরটা খাঁ খাঁ করছে, হায় রে লুচি মাংস! ছেলেমানুষের মত দু' চোখ জলে ভরে গেল।

বসবার ঘরে একটা চেয়ারে হতাশ হ'য়ে ব'সে পড়লাম, ব'সে ইতস্ততঃ তাকাতে তাকাতে দেখলাম ঘরের কোণে একটা কম্বলের পুঁটলি প'ড়ে আছে। ওটা তো ওখানে আগে দেখি নি। কাছে গিয়ে খোঁচা মারতেই সেটা ন'ড়ে উঠল এবং তার পরেই শ্রীমান বম বাহাদুর মুখ বার ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—"চার বাজ্ গিয়া?"

পেটের আগুন চ'ড়ে গেল মাথায়! ইচ্ছে হ'ল এখুনি ওর মাথার উপর জুতা দিয়ে চার বাজিয়ে দিই। কোন রকমে নিজেকে সামলে বললাম—"চুলামে আগুন লাগাও।"

কেটা ছুটে গেল এবং মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে জানাল—"কয়লা ছৈনা।"

—"স্টোভ্ জ্বালাও।"

—"ইস্পিরিট ছৈনা।"

ইস্পিরিট ছৈনা? কাল একটা পুরা বোতল আনা হয়েছে! ধমক দিয়ে বললাম—"কি করেছিস্?"

কেটা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল—"জু"।

শুনে মাথা ঘুরে গেল, একদিনে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট কেউ খেয়ে ফেলতে পারে, কে বিশ্বাস করবে? মানুষের সবই সহ্য করবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গিয়েছিই। বললাম—"নিকাল যাও, উল্লুক, আভি নিকাল যাও।"

কেটা কোন কথা না ব'লে কাপড়খানা নিয়ে জুতো জোড়া প'রে বেরিয়ে চ'লে গেল।

পরদিন সকালে আবার বদলির হুকুম, মেদিনীপুর কলেরা-ক্যাম্প! আকাশ থেকে পড়লাম। তারপর মনে হ'ল বেশই হয়েছে, কেটা ব্যাটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। ওকে ডেকে পাঠিয়ে মাইনে চুকিয়ে দিলাম এবং সেই সঙ্গে আর একটা টাকা বখশিস্ দিয়ে বললাম—"আমার মালগুলো দেখে শুনে বাসে তুলে দিস!"

ঠিক হ'ল জিনিসপত্তর নিয়ে একটা বাস রিজার্ভ ক'রে শিলিগুড়ি যাব।

শিলিগুড়িতে পৌঁছে মাল গুনে নিচ্ছে, তেরটা হবার কথা, হচ্ছে চৌদ্দটা, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে, বেশী কি ক'রে হ'ল? দু'জন কুলি মাল নামাচ্ছে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটা কুলি "রামা হো" বলে এক হাঁক দিয়েই কলাপাতার মত কাঁপতে লাগল।

—"কী—কী—কীরে?"

—"ঐঠো হেলতা হ্যায়, বাবুজি!"

—"কোনঠো রে?"

"ঐ কম্বল,"—ব'লে সে কেঁদে ফেলে আর কি!

আমি গিয়ে এক ঠেলা দিতেই বেরিয়ে এলেন আমার মূর্তিমান্ ব্যাম্ বাহাদুর। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কেটা চারদিক্ দেখে একেবারে অবাক। সে মোটেই ইচ্ছা করে আসে নি, মাল তুলে দিতে এসে ঘুম পেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে কম্বল-মুড়ি, তার পরেই শিলিগুঁড়ি। দার্জ্জিলিং ছাড়লে কি হয়, কেষ্টার হাত থেকে আমার ছাড়া নেই।

রথের ছবি

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়



জগন্নাথের চল্‌ছে রথ।
সবাই স'রে দিচ্ছে পথ॥
বিষ্টি এলো চড়বড়িয়ে।
চললো রে রথ গড়গড়িয়ে॥
চলেন ঠাকুর মাসীর বাড়ী।
বিকোয় পথে খেলনা, গাড়ী॥
কাঠের ঘোড়া, বেলুন, বাঁশী।
ছড়িয়ে দোকান রাশি রাশি॥
বেজায় রকম লোকের ঠেলা।
মহেশতলা রথের মেলা॥

হাপুস চোখে দেখছে টুকু।
নাগরদোলা চড়ছে খুকু॥
খাচ্ছে গজা ভিড়ের মাঝ।
খুকুর যে কী ফুর্তি আজ॥
পাঁপর ভাজা ভর্তি ঝুড়ি॥
ভাজছে বসে ফোক্‌লা বুড়ী॥
সবাই স'রে দিচ্ছে পথ।
জগন্নাথের চল্‌ছে রথ॥



রাজা ও ঋষি

শ্রীমায়া বসু

সূর্যবংশ কুলগৌরব রাজন অম্বরীষ ;
কায়মনপ্রাণে বিষ্ণুর পূজা করেন অহর্নিশ ।
ভক্তিতে তাঁর তৃপ্ত শ্রীহরি, বরদান করি কন ঃ
"বিপদে তোমারে রক্ষা করিবে আমার সুদর্শন ।"

অতি খল ছল দুর্বাসা মুনি মনে তাঁর সদা আশ
কোন্ কৌশলে করিবে অম্বরীষের সর্বনাশ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব বাঁধা যার তপস্যা বলে,
এক অভিশাপে তাকেই পাঠাবে নরকের রসাতলে ।
একদা একটি দীর্ঘ বরষ ধরি,
বিষ্ণু ভক্ত মহারাজা তাঁর যজ্ঞ পূর্ণ করি
তিনদিন তিনরাত্রি রহেন নিরম্বু উপবাসে
চতুর্থ দিন ইষ্টে পূজিয়া ব্রত পারণের আশে
উদ্যত যেই জল পান করিবারে—
দুর্বাসা মুনি সহসা আগত হইল তাঁহার দ্বারে ।

ত্যজি বারি পান, প্রণাম করিয়া রাজা তাঁর শ্রীচরণে,
কহেন, "আজ্ঞা করহে তপস্বী, যা আছে তোমার মনে !"
বহু জন্মের বহু ভাগ্যের ফলে,
তব পদধূলি পড়েছে আমার যজ্ঞের সভাতলে ।
ছলনায় পটু দুর্বাসা কয়, "বেশী কিছু সাধ নাই,
মহা সুকঠিন যজ্ঞ পূর্ণ করিয়াছ তুমি তাই

বহুদূর হতে বহু শ্রম করে এসেছি তোমার কাছে
নৃপতি শ্রেষ্ঠ ! তোমার নিকটে এক প্রার্থনা আছে,
ক্ষুৎপিপাসায় জরজর আমি উপবাসী বহুক্ষণ ;
আমারে তৃপ্ত করি তারপর কর তুমি ভক্ষণ।"

মুনি গেল স্নানে , দিনের উপরে দিন হল অপগত
ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় রাজা তবু প্রতীক্ষারত।
মুখে কন, "হরি হরি।
এই নিদারুণ সঙ্কটে প্রভু, বল কি উপায় করি ?"
মনে বুঝিলেন মন্ত্রীরা, খল ঋষির অভিপ্রায়
তাঁর কৌশলে রাজা ও রাজ্য সবই বুঝি আজ যায়।
অনেক ভাবনা চিন্তার শেষে রাজারে বুঝায়ে কন ;
"ভঙ্গ করুন উপবাস প্রভু ! আপনি অবুঝ নন !
কুশের অগ্রে গঙ্গার বারি জিহ্বায় করি পান
বাঁচুন পরাণে। পারণ করিয়া হউন পরিত্রাণ।"

দুর্বাসা মুনি ছিল অদৃশ্য ছিদ্র অন্বেষণে,
গঙ্গার বারি পান করিলেন মহারাজ যেই ক্ষণে,
অগ্নিসমান ক্রোধে অপমানে জ্বলে
এলায়িত জটা, উপবীত হাতে ধেয়ে আসে সভাতলে।
"আমারে তৃপ্ত না করিয়া আগে, কর তুমি বারি পান ?
এতই দম্ভ ? ব্রহ্মতেজের দাও নাকো সম্মান ?
শিখা উপবীত ছিঁড়ে অভিশাপ দিব তোমা মহারাজ
এই দুর্দিনে দেখি কোন্ হরি বাঁচান তোমারে আজ।"

জোড় করি কর স্মরিলেন রাজা, "নারায়ণ নারায়ণ !"
বিষ্ণু আদেশে বিদ্যুৎগতি চক্র সুদর্শন
এহেন সময়ে মুনিরে বধিতে সহসা ছুটিয়া আসে
এই বুঝি কাটে মুণ্ড তাঁহার !. দুর্বাসা কাঁপে ত্রাসে !

অতি বেগভরে ছুটিয়া পালায় দেব ব্রহ্মার কাছে,
সেখানে অভয় না পেয়ে ছুটিল যেখানে ত্রিশূলী আছে।
সেখানেও মুনি পেল নাকো বরাভয়,
বলিলেন শিব: "বৈকুণ্ঠেতে লহ তুমি আশ্রয়।"

অগ্নি ঝলকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ঘূর্নন—
প্রাণভয়ে মুনি ছুটে যায়, পিছে ছুটিছে সুদর্শন।
বৈকুণ্ঠেতে অন্তর্যামী, যেথা দয়াময় হরি,
নিজ অপরাধ বুঝি দুর্বাসা, তাঁর শ্রীচরণ ধরি,
কেঁদে কয়, প্রভু, ক্ষম অপরাধ, বাঁচাও আমারে, আর
নাকে খৎ দিনু, এই মহাদোষ হবে না দ্বিতীয়বার।"

মুচকি হাসিয়া কহেন শ্রীহরি: "আমি ভক্তের দাস,
জান তুমি তবু কেন চাও বল তাহার সর্বনাশ?
তপস্বী হয়েও ক্রোধ রিপু আজো করনি সংবরণ
সেই পাপে পেলে এই লাঞ্ছনা, হয়ো না বিস্মরণ।
ক্ষমা চাও যদি, যাও তবে যেথা রাজা উপবাসী আছে
দয়ার সাগর, আমার ভক্ত অম্বরীষের কাছে।"

রাজার সকাশে মুনি ফিরে আসে ক্ষোভে আর লজ্জায়
ক্ষমা চাহিবার আগেই যে রাজা ধরে তাঁরই দুটি পায়।
বহু উপচারে, রাজোচিত সমাদরে—
তুষ্ট করিয়া মুনিকে বসান সিংহাসনের 'পরে।
মরমে মরিয়া ভাবে মুনি মনে মনে:
রাজা আর ঋষি, কোন্ জন বড় বুঝিলাম এতদিনে।



পরাজয়

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একি, কী হলো? সতীশবাবু চেয়ারটা ঠেলে অনেক দূর সরিয়ে নিলেন পিছনে।

আগন্তুক মেঝেয় একেবারে তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

ভিক্ষুক শ্রেণীর বলে মনে হয়—একেবারে নিম্নস্তরের না হলেও মধ্যবিত্ত ভিক্ষুক, অর্থাৎ ময়লা হলেও গায়ে একটা শার্ট আছে, ছেঁড়া হলেও পায়ে আছে ক্যাম্বিশের জুতো, রুগ্ন অপরিচ্ছন্ন চেহারা হলেও যেন একটু ভদ্রতার ভাব আছে কোথাও।

কিন্তু তাই বলে এমনি মাটির উপর লুটিয়ে পড়বে নাকি রাস্তায় ভিক্ষুকের মতো? শুধু লুটিয়ে পড়া নয় কুণ্ডলী পাকিয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করেছে।

'এখানে কী?' কপালের উপর দু'চোখ তুলে সতীশবাবু স্তম্ভিতের মতো তাকিয়ে রইলেন: 'এখানে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছ কোন্ হিসাবে? বাইরে যাও, বাইরে চলে যাও বলছি।'

লোকটা গুঙিয়ে উঠলো: 'আমি মনোমোহন।'

"আহা, নামে একেবারে মন মোহিত হয়ে গেল।' সতীশবাবু ভেঙচিয়ে উঠলেন, 'যা বক্তব্য বাইরে থেকে বলো তো শুনতে পারি, নইলে এখুনি আমাকে চাকর ডাকতে হবে,' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ডাকতে লাগলেন: 'গোবর্ধন, গোবর্ধন—ও গোবর!'

নিজেই এগিয়ে গেলেন আগন্তুকের দিকে এবং তাকে স্থির চোখে একটু দেখে চমকে উঠলেন তৎক্ষণাৎ। মনোমোহনকে চিনতে পেরেছেন বলে নয়, তার যন্ত্রণাটাকে চিনতে পেরেছেন বলে।

কেননা এ তাঁরও যন্ত্রণা। এই তো, সেদিনও তিনি এমনি কাৎরিয়েছেন কুণ্ডলি পাকিয়ে।

চাকর না এসে এলেন সুরধুনী, সতীশবাবুর স্ত্রী, অক্লেশে এগিয়ে গেলেন সামনে, কেননা যে লোকটা মাটিতে শুয়ে কাঁদছে সে কখনোই সম্মানার্হ নয়, তার পদমর্যাদা নেই; সে হয় গরিব, নয় রোগক্লিষ্ট, নয় ক্ষুধাতুর, এমনি কোনো ভদ্রলোক হলে তিনি আসতেন না কখনো বাইরের ঘরে।

'কী হয়েছে? পেটে ব্যথা বুঝি?' সুরধুনীও যন্ত্রণাটা চিনতে পেরেছেন এক নিমেষে। অনেকদিন আছেন এর কাছাকাছি, সেবা নিয়ে, অনিদ্রা নিয়ে, নিরুপায় উৎকণ্ঠা নিয়ে।

'অসহ্য। অসহ্য!' মনোমোহন ককিয়ে উঠলো।

'তোমার সেই ওষুধটা এনে দেব?' সুরধুনী স্বামীর দিকে চেয়ে উদ্বেগ-কাতর মুখে প্রশ্ন করলেন। 'ব্যথাটা এখুনি কমে যেতে পারে তা হলে।'

'রাখো।' সতীশবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন: 'অসুখ করেছে, হাসপাতালে চলে যাক না, এখানে কেন মরতে এসেছে? কে-না-কে, তার জন্যে আমি আমার দামী-দামী ওষুধ বের করে দি।'

'কে-না-কে নই,' এক হাতে কোট চেপে ও অন্য হাতে মেঝেতে ভর দিয়ে মনোমোহন আস্তে আস্তে উঠে বসলো, 'আমি আপনাদের ছেলে।'

কথাটা সতীশবাবু মোটেই গায়ে মাখলেন না। বললেন, 'অমন ঢের দেখা গেছে। "কাজের বেলায় ছেলে, কাজ ফুরলে জেলে।" ও-সব চালাকি এখানে চলবে না। এখন দিব্যি উঠে বসতে পেরেছে, সটান হাঁটা দাও।'

'এখনো ব্যথাটা নরম পড়েনি, বাবা।' মনোমোহন কষ্টক্লিষ্ট মুখে বললে, 'এখনো ঠেলা মারছে থেকে থেকে।'

বাবা কথাটা অভ্যাস বশে বাবুই শুনে থাকবেন সতীশবাবু। তাই তিনি হ্লেন না। পুরুষকণ্ঠে বললেন, 'এর উপর কি আরো ঠেলা খেতে চাও নাকি? পেটের উপরে ঘাড়ে?'

কিন্তু অতটা নিষ্ঠুর হতে পারলেন না সুরধুনী। নম্রকণ্ঠে বললেন, 'কিছু পয়সা দেব?'

'পয়সা? পয়সা দিয়ে কী হবে?'

'কিছু খাবে?'

'খাবো?' মনোমোহনের চোখ ছলছল করে উঠলো। 'মাগো, খেতে পাইনি বলেই তো এই ব্যথা। কারুর ব্যথা হয় খাওয়ার থেকে, আমার হয়েছে ক্ষুধার থেকে, সেইদিনের সেই ক্ষুধার সময় কেন আসো নি মা? এসেছ আজ এই ব্যথার সময়।'

'তবে তুমি কী চাও?' সতীশবাবু গর্জন করে উঠলেন।

'ছোট এক ঘটি জল।'

এত কান্নার পর এই কাণ্ড! সুরধুনী জল নিয়ে এলেন।

মনোমোহন সতীশবাবুকে লক্ষ্য করে বললে, 'এবার জুতো থেকে পা বের করে এই জলের মধ্যে ছোঁয়ান—যে-কোনো-পা।'

'তার মানে?'

'তার মানে—আপনি ছোঁয়ালে পর মা এসে ঠেকাবেন তাঁর পা।'

'তুমি কি পাগল?'

'পেট আমার গেছে বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক আমার সুস্থ আছে, বাবা।'

বাবা-কথাটা সতীশবাবু এবার স্পষ্ট শুনলেন আর তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। প্রথম কথা—তিনি নিঃসন্তান বাবা-ডাক শুনতে অভ্যস্ত নন; আর প্রধান কথা—এমন কিনা বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলে! সতীশবাবুর বয়স যদি চল্লিশ, মনোমোহনের পঞ্চাশ।

'জল খেয়ে কী হবে?'

'কী হবে!' মনোমোহনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো: 'কর্পূরের মত আমার ব্যথাটা উবে যাবে দেখতে দেখতে।'

সুরধুনীর কৌতূহল জাগ্রত হল, বললেন, 'কী করে জানলে'?

'স্বপ্ন দেখলাম, মা, স্বপ্ন দেখলাম, মা-কালী আমার কানে কানে বলছেন, তোর এ রোগের ওষুধ আছে তোর বাপ-মার কাছে, বাপ-মা তো কবেই হারিয়েছি বলে কেঁদে উঠলাম। মা-কালী বললেন, এ তোর এ জন্মের বাপ-মা নয়, আগের জন্মের বাপ-মা, ফরিদপুরের সতীশ মোক্তার ও তার স্ত্রী, পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়গে, তাদের পা-ধোয়া জল খা গে এক ঘটি, ছাখ, ব্যথা তোর কেমন সেরে গেছে এক পলকে। তাই আমি সোজা চলে এসেছি মা—এক আধ মাইলের রাস্তা নয়,—সটান গোপালগঞ্জ থেকে, সন্তানকে দয়া করো—'

'ছাখো, এসব বুজরুকি এখানে চলবে না।' সতীশবাবু শাসিয়ে উঠলেন।

'আমি টাকা-কড়ি কিছুই আপনাদের কাছে চাই না—শুধু একটু চরণের ধুলো। দিন না দয়া করে,' মনোমোহনের গলায় মিনতি ঝরে পড়লো, 'যদি ব্যথাটা আমার সারে, যদি আবার আমি চাঙ্গা হয়ে উঠি।'

সুরধুনীর মন করুণায় ভিজে গেল। কেউ তাকে নিঃসংশয়ে মা বলে ডেকেছে এ তিনি প্রাণ থাকতেও উপেক্ষা করতে পারেন না। কে সে সন্তান, কত তার বয়স, কেমন সে দেখতে—কিছু আসে যায় না। তিনি মা, এ জন্মের না হলেও গত জন্মের মা, এতেই যেন তাঁর তৃপ্তির শেষ নেই। স্বামীকে

বললেম,—এতে তাদের কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু লোকটা যদি সত্যি সেরে ওঠে—তাতে আপত্তির কী আছে!

'আর মনে করে দেখুন এই যন্ত্রণার চেহারাটা! নিজেরও তো আছে আপনার।' মনোমোহন মনে করিয়ে দিল।

সতীশবাবু শিউরে উঠলেন, পেটটা যেন চিন চিন করে উঠলো। আমতা-আমতা করে বললেন, 'এতে কখনো সারে? কত হাজার-হাজার টাকা ব্যয় করলাম এ রোগের পিছনে। কিছুতেই কিছু হবার নয়। তার চেয়ে গাঁজা ধরলে পারতে মনোমোহন।'

'হতেই হবে। এ যে দেবাদেশ।' মনোমোহন চোখ বড়ো বড়ো করে বললে, 'এমন আমার জগদ্ধাত্রীর মতো মা, মহেশ্বরের মতো বাপ—এ কখনোই ব্যর্থ হবার নয়, কখনোই নয়।'

সতীশবাবু আর স্বরধুনী জলের ঘটতে পা ডোবালেন। আর এক ঢোকে ঘটিটা মনোমোহন নিঃশেষ করে বিশাল একটা ঢেকুর তুললো। আর সেই উদ্গারে তার সমস্ত ব্যথা গেল অন্তর্হিত হয়ে।

এটাকে কী বলতে হয়? ভোজবাজি না ইন্দ্রজাল? যন্ত্রণায় মুমূর্ষু লোকটা চক্ষের এক পলকে নীরোগ হয়ে গেল—চোখের সামনে দেখেও যে বিশ্বাস করা যায় না। না, সমস্তটাই অভিনয়, প্রতারণা? একটা কিছু জটিল ষড়যন্ত্র?

কিন্তু যে যাই বলুক, মনোমোহনকে স্বরধুনী ছাড়লেন না। চাকর-ঠাকুর-গয়লা-মুদি সবাই তাকে মা বলে ডাকে বটে, কিন্তু কারুর ডাকই এমন বুকের মধ্যে এসে পড়ে না, মনোমোহন বলে, 'তুমি আমার সত্যিকারের মা বলেই তো আমার ব্যথায় সময় তুমি এসেছ, ব্যথা ভুলিয়ে জাগিয়েছে এমন ক্ষুধা।'

আর নিজের হাতে তার সামনে ভাতের থালা সাজিয়ে স্বরধুনী বলেন, 'আর তোমায় কোনদিন উপোস করে থাকতে হবে না, মনো। আমি জোগাব তোমার ভাত।'

মনোমোহনকে স্বরধুনী বাগানের কাজে লাগিয়ে দিলেন—মাইনে দিলেন সাত টাকা। এটা ঠিক মাইনে নয়, ছেলেকে কেউ মাইনে দেয় না—এটা পকেট খরচ। যে শার্ট পরে প্রথমে সে এসেছিল, তাতে পকেট ছিল কিনা সন্দেহ; এখন তার গায়ে উঠেছে তিন পকেটওয়ালা ঢিলে পাঞ্জাবি—

ভিক্ষে করে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, দস্তুরমতো নগদ দামে কিনে আনা দোকান থেকে। তা ছাড়া পায়ে জুতো, মাথায় তেল, গায়ে সাবান, মায় দাড়ি কামাবার জিনিস। এ মূল্য মনোমোহন তাঁকে শুধু মা করেছে জাল নয়, তাঁকে দেবতার মর্যাদা দিয়েছে বলে!

কিন্তু সতীশবাবুর সহ্য হচ্ছিল না কিছুতেই। একটা প্রবঞ্চক এমন করে তাঁরই সংসারে খাওয়া-পরার কায়েমী বন্দোবস্ত করে নেবে, এ তিনি কোন দিন কল্পনা করতে পারেন নি। ঠাকুর-চাকরের উপর তম্বি—কোথায় তার বাবা-মার যত্নের ত্রুটি হচ্ছে, কোথায় সংসারে হচ্ছে ক্ষুদ্রতম অপচয়। সহ্য হয় না তার এই মুরুব্বিয়ানা, এই বিগলিত ভক্তির ভাবটা। কিন্তু সুরধুনীকে মুখ ফুটে কিছু বলেন তার সাধ্য কী।

'ও কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবে নাকি এ-সংসারে?' সতীশবাবু একদিন আর থাকতে পারলেন না।

'দু'বেলা দু-মুঠো ভাত—আর একটু আরাম আর আশ্রয়, এতে আমাদের কী এমন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে যাচ্ছে?' সুরধুনীরও বিরক্তিকর লাগল এই চিত্তদারিদ্র্য।

'তা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠকিয়ে খেয়ে যাচ্ছে আরামে, প্রতি মুহূর্তে এই চেতনাটাই সইতে পারছি না। ওর অসুখটা যে আগাগোড়া ভাণ, তা বোঝ নি তুমি?'

'হোক সে ভাণ, কিন্তু তার মা-ডাকটা তো ভাণ নয়। মার কাছে ছেলে এলে মা তাকে খেতে দেবে না বলতে চাও?' সুরধুনী রাগ করে চলে গেলেন ঘর থেকে।

কিন্তু ঘোরতর বিপদ একটা কোথাও সাজছে সতীশবাবুর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই দেখতে আসে মনোমোহনকে—যে লোকটা ভাঁওতা মেরে ভাতের ব্যবস্থা করে নিল অনায়াসে। এঁদের দিকে যদি বা তাকায়, করুণার চোখে তাকায়। এঁদের মধ্যে যে দেবতার অংশ আছে কেউ তা বিশ্বাস করতে চায় না, হাসাহাসি করে। দেবতার অংশই যদি থাকবে, সতীশবাবুর নিজের অসুখ তা হলে সারে না কেন?

সতীশবাবু সায় দেন গলা খুলে। বলেন, 'ভগবান ওর ভাত মাপিয়েছেন এ সংসারে, কিছুদিন খেয়ে নিক। হোক কিছু গুণগার। কিন্তু প্রতারিত হলেও আমি আমার স্ত্রীর বিশ্বাসে হাত দিতে পারবো না।'

সুরধুনী অটল—ঠাট্টাই করো আর যুক্তিই দেখাও, তাতে শুধু দেবীর মাহাত্ম্য নয়, আছে মাতার মাহাত্ম্য।

কিন্তু বিপদের দিন বেশি দূরে নয়।

সমস্ত দিন পেটে যন্ত্রণা ভোগ করে সন্ধ্যের দিকে সতীশবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এখন রাত প্রায় মাঝামাঝি। হঠাৎ ঘরের মধ্যে কার চলাফেরার আওয়াজ পেয়ে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডাকলেন, ঘুমো গলায় উত্তর করলেন সুরধুনী, ঘরের মধ্যে চলাফেরাটা আরো স্পষ্ট ও দ্রুত হয়ে উঠলো।

শরীর দুর্বল হলেও সতীশবাবু উঠে বসলেন বিছানায়, বললেন, 'চোর।'

সুরধুনীও চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন: 'মনো।'

মনোমোহনের টিকিও দেখা গেল না। দরজা খুলে পালাতে গিয়ে চোর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বাতি জ্বালিয়ে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করে বেরোতে-বেরোতে চোরকে আর দেখা গেল না।

আর দেখা গেল না মনোমোহনকেও।

কি যে চুরি গেছে এক নজরে বোঝা গেল না কিছু। যেখানকারটা সেইখানেই আছে বলে মনে হয়। যা চুরি গেছে বলে ভাবা হয়, তা খুঁজে দেখা যায় সেইখানেই ঠিক আছে।

তা থাক, কিন্তু চুরি করতে এসেছিল যে তাতে সন্দেহ কী? লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়েছে, দরজার উপর পড়েছে হুমড়ি খেয়ে—এ তো সুরধুনীর নিজের দেখা, নিজের শোনা। লজ্জায় ও অপমানে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠলো। দেবী-প্রতিমার রাংতা খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো যেন ভিতরের খড়।

কিন্তু চরম একটা প্রতিশোধ নেবেন, সতীশবাবু ক্ষেপে উঠলেন। থানায় খবর দিলেন তিনি—একটা কিছু চুরি গেছে নিশ্চয়ই—না যায় বানিয়ে বলতে বাধবে না তাঁর। মনোমোহনকে ধরতে হবে, পুরতে হবে তাকে জেলে। "কাজের বেলায় ছেলে, কাজ ফুরুলে জেলে"—ভোলেন নি তিনি।

মনোমোহনকে পাওয়া গেল কাছেই, একটা গাছের তলায়। পেটের অসহ্য ব্যথায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

জেলে নেবার আগে তাকে সুস্থ করা দরকার। তাই তাকে নিয়ে আসা হলো হাসপাতালে।

অনেক পরে মনোমোহন চোখ মেলে চাইলো। ডাকলো: 'মা।'

দেখলো- কেউ কোথাও নেই।

'মাগো, আমি হেরে গেলাম, হারিয়ে দিলাম তোমাকে। সারলো না আমার এই পেটের ব্যথা, সারাতে পারলো না তোমার পায়ের অমৃত, হাতের অমৃত।' মনোমোহন কেঁদে উঠলো।

একজন কে জানতো বোধ হয় ব্যাপারটা, জিগগেস করলো : 'শেষকালে চুরি করতে গেলে কেন?'

'চুরি?' মনোমোহন চমকে উঠলো : 'চুরি করতে গিয়েছিলাম মার মানের জন্যে। সন্ধ্যে থেকে আমারো ব্যথাটা উঠলো ঠেলা মেরে—মুখে হাসি এনে মার কাছ থেকে লুকোলাম সেই ব্যথা, কিছু হয়নি বোঝাতে গিয়ে খেয়ে নিলাম এক পেট—মা যে কাছে বসে খাওয়ালেন। কিন্তু যাবে কোথায় সেই অত্যাচারের ফল? ঘৃতে আহুতি পড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। পেটের মধ্যে চলতে লাগলো শূল আর শাবল এক সঙ্গে; মাগো, তারপর চুরি করতে গেলাম। চুরি করতে গেলাম তোমার চরণের অমৃত নয়, খাবার ওষুধ, টেবিলের উপর যা-সব থরে থরে সাজানো আছে—সেই ওষুধ যা খেয়ে বাবার ব্যথা নরম পড়ে গিয়েছিল, যা খেয়ে শান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সন্ধ্যেবেলায়। চিনে রেখেছিলাম তখন থেকে, ভেবেছিলাম সেই ওষুধ খেয়ে সারাবো এই যন্ত্রণা, ঢেকে রাখবো আমাদের পরাজয়ের কথা। কিন্তু, মাগো, অন্ধকারে খুঁজে পেলাম না সেই ওষুধ, লণ্ঠনের পলতেটা বাড়াতে গিয়ে নিবে গেল আচমকা।'

মনোমোহন দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতিক ষ্ট উঠে দাঁড়ালো।

মনোমোহনকে পুলিশ আটকালো না। কিছুই চুরি যায়নি—শেষ পর্যন্ত এই রিপোর্টই সতীশবাবু পাঠিয়ে দিলেন, যখন শুনলেন আবার ব্যথায় কাবু, জব্দ হয়েছে মনোমোহন। কিন্তু সে যেন আর তাঁর বাড়িমুখো না হয়—পরাজয়ের প্রতারণার গ্লানি যেন সে আর বহন করে না আনে—এই শর্তে।

মনোমোহন শুধু আরেকবার বললে—'মাগো'—

সেকাল একাল

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

রামভজুয়া গাইতো ভালো,
নাচতো ভালো সীমু,
সারেঙ্গীতে তান বাজাতো
জানবাজারের হিমু।

বহুরূপীর সাজ দেখাতো
মোমিনপুরের দাশু,
খিল্‌খিলিয়ে হাসতো ভালো
হাস্‌নাবাদের হাসু।

যাত্রাগানে সাজতো রাজা
মুর্গীহাটার রামা,
হারু দর্জি পারতো কেবল
বানাতে তার জামা।

খেতেন বটে তৃপ্তি নিয়ে
জনার্দনের খুড়ো,
এক কামড়ে সাব্‌ড়ে দিতেন
তিনটে রুইয়ের মুড়ো।

ছিল বটে ময়রা সে এক
কান্তি ঘোষের নাতি,
ছানা দিয়ে রোজ বানাতো
জেব্রা এবং হাতী।

সে-সব এখন গল্প-কথা
শুনতে লাগে মিছে,
এখন শুধু রাজনীতিটাই
ঘুরছে সবার পিছে।

হাস্‌নাবাদের হাসু কোথায়
কোথায় দাশু রামা ?
ফ্রক কেটে হয় তৈরী এখন
ছোক্‌রা ছেলের জামা

সরল সোজা জীবনটা আজ
থিতিয়ে কেবল চলে,
মুখের হাসি-তাও বানানো
কলিকালের কলে॥

লিমেরিক

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

১

রাখহরি দাস ঘোষ
ভাগ্যকে দেয় দোষ,
এত সাবধানে থাকে
তবু তার নাক ডাকে,—
তাই নিয়ে আপসোস !

২

বিষ্ণুচরণ শর্মা
ভীষণ করিৎ-কর্মা
চাকরি পেলো
তাই তো গেলো
বম্বে ছেড়ে বর্মা।

পরোপকার

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র



ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি আমাদের বাড়ীর সবাইকার থেকে আমি আলাদা ধাতের।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, আমার ভায়েদের সঙ্গে আমার বিশেষ মিল নেই। আমার ভায়েরা সবাই ষণ্ডা, জোয়ান, শুধু তাই নয়, তারা সব কাজের লোক, পাড়ায় যে-কোন কাজেই লোকে সবার আগে ডাকতে আসে আমার ভায়েদের, প্রতিবেশীদের দায়ে-অদায়ে আমার ভায়েরা যায় এগিয়ে, সবার আগে, দুপুর-রোদে পাঁচ ক্রোশ রাস্তা পরের মোট ঘাড়ে করে বয়ে দিয়ে আসা তাদের কাছে ছেলেখেলা, কন্‌কনে শীতের রাত্রে, লেপের ভেতর থেকে হাত বার করে বাতির সুইচটা টিপতেও যখন আলস্য হয়, তখনও তারা অম্লান-বদনে গামছা কোমরে বেঁধে মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাবার ডাকে বেরিয়ে পড়ে।

তাদের তুলনায় আমি বোধহয় একটু আয়েসী। গ্রীষ্মকালে গরমটা আমার বড় বেশী লাগে, রাতে ঘুমোবার চেষ্টা করে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে দুপুরে না ঘুমালে চলে না। আর শীতকালে ঠাণ্ডাটা আমায় এমন কাবু করে ফেলে যে নড়তে চড়তে বড় ভালো লাগে না। বর্ষাকালে শহরটা কি বিশ্রী হয়ে ওঠে সে ত' জানই! তাতে আর বেরুনই বা কেমন করে যায়! বৎসরের বাকী মাসগুলো আমার এসব ঋতুর ধাক্কা সামলাতে যায়। সুতরাং আমাকে কাজের লোক ঠিক বলা চলে না।

বাইরের লোক ত' এই নিয়ে আমায় ঠাট্টা করেই, বাড়ীর লোকেও বাদ দেয় না।

মা হয়ত বলেন, "ওরা সব ঘোষালদের বিয়েবাড়ীতে খাটতে গেছে, বাজারটা তুই আজ করে নিয়ে আয় সুধীর!"

বাজারের নামেই আমার আতঙ্ক হয়। দোকানদারের সঙ্গে দরদস্তুর করবার কথা ভাবলে আমার গায়ে জ্বর আসে, দরদস্তুর না করে সোজাসুজি বাজার করে আনলে বাড়ীতে গঞ্জনা সইতে হবে—"তুই কোন কর্ম্মের নয়, একেবারে ডাহা ঠকে এলি।" আর দর করতে গিয়ে দোকানদারের দাম থেকে

এক পয়সা কমাবার জো আছে! তার সে বিস্মিত বিদ্রূপের দৃষ্টিতে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজসাহেবকেই যেন একটা বেফাঁস গালাগালি দিয়ে ফেলেছি। না, বাজার করা বড় হাঙ্গাম।

বলি "বাজার! আজ আর বাজার করে কি হবে মা? বেশ বাদ্‌লা বাদ্‌লা আছে, খিচুড়ি কর না।"

মা রেগে চলে যেতে যেতে বলেন, "হ্যাঁ খিচুড়ি করবে! তোকে দিয়ে যদি একটা কাজ হয়!"

দাদা-বৌদিদের ঠাট্টা ত' আছেই।

খেতে বসে আবার বড় বৌদি বলেন, "তোমার মাংসটা শিলে একটু বেটে এনে দেব ঠাকুরপো, নইলে তোমার চিবোতে কষ্ট হবে!"

ডাক-পিয়ন হয়ত মেজদার চিঠি দিয়ে গেছে, তাঁকে সেটা এনে দিতেই তিনি তাড়াতাড়ি পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "হাওয়া খা, হাওয়া খা, একেবারে, হাঁফিয়ে গেছিস্ যে!"

ঘরে বাইরে এত উপহাস আর কতদিন সওয়া যায়! মনে মনে একদিন আমি কঠোর সঙ্কল্প করে ফেললাম—এবার থেকে কাজের লোক হ'বই। পরের উপকার করতে গিয়ে প্রাণটাও যদি দিতে হয় তাও স্বীকার! সুযোগও জুটে গেল।

বাড়ীশুদ্ধ সবাই আমরা তখন দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙে সে-বার শীতটা একটু বেশী। তারি ভেতর শরীরটাকে একেবারে লোহার মত শক্ত করবার জন্যে পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়ে সেদিন সকালে আমি মাইল দশেক জেদ করে ঘুরে এসেছি, সমস্ত শরীর এমন টাটিয়েছে যে মুখে ভাতের গ্রাস তুলতেও কষ্ট হয়। এমন সময় রবি মামার এক চিঠি এসে হাজির।

রবি মামা একটি পোষ্ট কার্ডে অত্যন্ত কাতরভাবে লিখেছেন যে তাঁর অত্যন্ত অসুখ, এবার তিনি বাঁচবেন না। বাড়ীর আরও নানা হাঙ্গাম, কে কাকে দেখে! লোকজনের অভাবে তাঁর শুশ্রূষাও হচ্ছে না, আমরা যদি তাঁকে শেষ দেখা দেখতে চাই তা হলে এই পোষ্ট কার্ডটিকে টেলিগ্রাম মনে করে যেন অবিলম্বে চলে আসি ইত্যাদি।

রবি মামা আমার মায়ের আপনার ভাই নন—তিনি মায়ের পিসতুতো ভাই। কলকাতায় তাঁদের প্রকাণ্ড পরিবার। লোকজন গিজ্ গিজ্ করছে বললেই

হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর এই দুরবস্থার কথা শুনে আমার প্রাণটা একেবারে গলে গেল।

বড়দা যখন চিঠিটা পড়ে মার হাতে দিয়ে একটু হেসে বললেন, "রবি মামা ত আবার মর-মর। দেখবার কেউ নেই; আমাদের ত' যেতেই হয়।" তখন বড়দার হাসিতে আমি রীতিমত চটেই গেলাম।

এটা কি হাসির ব্যাপার ? চট করে বসলাম—"তোমাদের কাউকে যেতে হবে না, আমিই যাব।"

দাদারা প্রথমতঃ সবাই অবাক্। অনেকক্ষণ আমার দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থেকে শেষে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

মেজদা বললেন—"সেই ভালো! তুই-ই! রবি মামার যোগ্য লোক জুটেছে এবার।"

কিন্তু তখন কোন পরিহাস আর আমায় দমাতে পারে না। আমি সঙ্কল্প একেবারে ঠিক করে ফেলেছি, বললাম—"যাই বল তোমরা, আমি যাচ্ছি।"

মা হেসে বললেন—"তুই যেমন পাগল। কোথায় যাবি ?"

নিজের মূল্য প্রমাণ করবার এই স্থযোগ কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নই। পরোপকারের গভীর প্রেরণায়, দাদাদের ঠাট্টা, মায়ের নিষেধ সব উপেক্ষা করে সত্যিই বেরিয়ে পড়লাম।

রওনা হবার সময় মা শুধু একটু হেসে বললেন—"একান্তই যখন যাবি বলে জেদ ধরেছিস্ তখন আর কি বলব! ত ড়াতাড়ি ফিরে আসিস্।"

মায়ের হাসির মানে যদি তখন বুঝতাম।

দার্জিলিঙের ঠাণ্ডা থেকে বাংলাদেশের গরমে নেমে আসবার সময় কি আরাম যে হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। গরম বোধ হওয়া মাত্র জামা জোড়া খুলতে দাদারা বারণ করে দিয়েছিলেন, ঠাণ্ডা লাগার ভয়।

কিন্তু দাদাদের নিষেধ মানা শক্ত হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল গরম জামাকাপড়ের ভেতর সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় পৌছতে পৌছতে হাড় মাংস আলাদা হয়ে যাবে।

দার্জিলিং মেল সেদিন একটু লেট ছিল। শিয়ালদায় পৌছলাম বেলা আটটায়। সেই সকালেই মনে হল বড় যজ্ঞি-বাড়ীর রান্নাঘর। তাতে গা-হাত-পা ঝলসে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি পরোপকারে চলেছি—কোন কষ্টই গ্রাহ্য করব না এই পণ, সোজা শিয়ালদা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে মামার বাড়ী চললাম।

মামার বাড়ী শহরের একেবারে ও-প্রান্তে এমন একটি গলির ভেতর সেখানে গাড়ী ঢোকে না। সঙ্গে মোটঘাট বেশীই ছিল, একলা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাছে পিঁঠে মুটে মিলল না। ট্যাক্সীওয়ালাকে একটু দাঁড়াতে বলে মামার বাড়ী থেকেই চাকর এনে মোটঘাট নিয়ে যাবো ভেবে এগিয়ে গেলাম।

গলির ভেতর হলেও মামাদের সেকেলে বাড়ী। মামা যে রকম চিঠি লিখেছেন তাতে গিয়ে কি না জানি দেখব তাই অত্যন্ত বিষণ্নমুখে যাচ্ছিলাম। বাড়ীর সামনের উঠোনে ছেলেপুলেদের দল পরমোৎসাহে ব্যাটবল খেলছে। যে বাড়ীতে এতবড় একটা অসুখ সে বাড়ীর ছেলেপুলের এতখানি খেলায় উল্লাস ঠিক শোভন ঠেকল না। তবু ভাবলাম আর কি তারা বোঝে।

আর একটু এগোতেই মামার বড় ছেলের সঙ্গে দেখা। সেজে-গুজে ফিট-ফাট হয়ে সাইকেল নিয়ে কোথায় বেরুচ্ছে। মামাত ভাইএর ওপর একটু রাগই হ'ল। বাপের সাঙ্ঘাতিক অসুখের সময় এত সাজগোজ কেমন করে সে করলে!

আমায় দেখেই আনন্দে হাত বাড়িয়ে সে বললে—"এই যে ছোড়দা কোথা থেকে? তোমরা না দার্জিলিঙে ছিলে?"

"ছিলাম ত।" বলে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"ক'দিনেই এক পোঁচ রঙ যে উঠিয়ে ফেলেছ", বলে সোৎসাহে সে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। তার পিতৃভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহটা আমার বেড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু তার পরের কথায় একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম।

সাইকেলের পা-দানিতে একটা পা রেখে সে বললে—"একটু তাড়াতাড়ি আছে ভাই, ক্যারাম কম্পিটিসনের সেমি-ফাইন্যাল, এসে তোমার সঙ্গে কথা কইব।"

সাইকেলে উঠে পড়ে চালিয়ে যেতে যেতে সে বলে গেল, "যাও না বাবা বাইরের ঘরেব দাবা খেলছেন।"

দাবা খেলছেন! বাইরের খরে ঢুকে আমি তো অবাক। রবি মামা লম্বা তক্তপোষের ওপর বসে গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে পণ্ডিত গোছের চেহারার একটা লোকের সঙ্গে দাবা খেলছেন।

আমার প্রবেশ তিনি লক্ষ্যই করলেন না—বড়ের একটা কিস্তি তিনি সবে

মাত্র দিয়েছেন। প্রতিপক্ষের দিকে চেয়ে বিজয়গর্বের হাসি হেসে তিনি বললেন—"কি ঠাকুর, বড় যে ঘর বেঁধেছিলে, সামলাও এবার!

অপর পক্ষের শুকনো ছুঁচলো মুখে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ধীরে ধীরে রবি মামার দাবাটি তিনি তুলে নিলেন।

রবি মামার হাসি মিলিয়ে গেল একপলকে। পণ্ডিতমশাইর হাত থেকে দাবাটা একরকম থাবা মেরে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন—"আরে মুখে দিয়ে দিলাম নাকি, দেখতে পাইনি ঠাকুর, দেখতে পাইনি। আরে ও কি আর একটা খেলা হ'ল।"

অপর পক্ষ তখন নির্বিকার মুখে দাবাটি ফিরিয়ে দিলেন।

এর ভেতর একটু অবসর পেয়ে ডাকলাম—"মামাবাবু!"

মামাবাবু পলকের জন্য আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন—"আরে সুধীর যে! কবে এলি?"

তারপর উত্তর শোনবার সময় আর তাঁর রইল না। আবার দাবার চালের ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বিস্মিত হয়ে অগত্যা তক্তপোশেরই একপাশে বসলাম। মামাদের খেলা চলতে লাগল। মাঝে আর একবার তিনি আমার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বললেন—"আরে সুধীর যে! কবে এলি?" পর মুহূর্তে আর তাঁর সাড়া রইল না।

রীতিমত চটে যাচ্ছিলাম। একবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবার চেষ্টা করলাম—"মামাবাবু আপনার না—"

কিন্তু আমার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—"দাঁড়া দাঁড়া, সব শুনব, ঘোড়াটাকে বড় বেকায়দায় ফেলেছে।"

বসে বসে মনে মনে গুমরাতে লাগলাম, ট্যাক্সিওয়ালা নেহাৎ যদি সরে না পড়ে থাকে, এতক্ষণে তার মিটার বহুদূর বেড়েছে।

ঘোড়া সামলে মামাবাবুর আর একবার ফুরসৎ হ'ল। বললেন—"কাল এসেছিস? এইখানেই থাকিস্ অথচ দেখা করিস্ না কেন? বলতে বলতে মামাবাবুর পূর্বকথা বোধ হয় একটু স্মরণ হ'ল।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "চিঠি পেয়েছিলি আমার? বাঁচবার আশা আর ছিল না রে! কোন মতে বেঁচে গেছি—ওকি! কিস্তি দিচ্ছ কি ঠাকুর? তোমার গজ নড়ে না যে!"

বললাম—"আজ তা হলে উঠি মামাবাবু!"

"উঠবি? তোর মামিমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাবি না? আচ্ছা কাল আসিস্ কিন্তু, অনেক দরকারী কথা আছে।"

মনের কথা মনেই চেপে বেরিয়ে এলাম। বড় রাস্তায় এসে দেখলাম ট্যাক্সি ওয়ালা চোর নয়, তার মিটারই যথেষ্ট।

পরের দিন যাওয়া উচিত ছিল না, তবু গেলাম, মানুষের দোষ ত্রুটি আমাদের অত গায়ে মাখালে চলে না। সৌভাগ্যের বিষয় মামাবাবু সেদিন দাবা খেলবার লোক পাননি। কাতর ভাবে অনেক দুঃখের কথা জানালেন। একটা কাজ আমায় তাঁর জন্য করে দিতেই হবে। বড় ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকবে এবার। কলকাতার কোন বড় কলেজে সায়েন্স পড়বারই তার ইচ্ছে। কিন্তু অঙ্কে নম্বর কিছু কম আছে। এজন্য কলেজের কর্তারা হয়ত নেবে না। আমি যখন সেই কলেজেরই ছাত্র এবং এখানে আছি, তখন আমি যদি চেষ্টা চরিত্র করে তাকে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। এটুকু উপকার আমার করতেই হবে। আমার ওপরই ছেলেটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—আমি ছাড়া আর কেউ একাজ পারবে না ইত্যাদি নানা কথা বললেন।

পরোপকার করতে এসে একেবারে কিছু না করে ফেরা যায় না।"

সুতরাং রাজী হলাম। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে দু'দিন নানা জায়গায় হাঁটা-হাঁটি করে পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেল বললেই হয়।

অনেক খোশামোদ, অনেকজনকে ধরে শেষ পর্যন্ত কলেজে আমার মামাত ভাইকে ঢোকাবার ব্যবস্থাও করলাম।

তার পরদিন মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি বিকেলবেলা। মামাবাবু বাড়ী ছিলেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর অবশ্য তাঁর দেখা পাওয়া গেল।

আমায় দেখেই মামাবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন—"এই যে এসেছ, তা হলে! আমি ভাবলাম বুঝি দার্জিলিঙই চলে গেছ আবার।"

বললাম—"না, বেণুকে সেই আমাদের কলেজে ঢোকাবার ব্যবস্থাটা না করে কি যেতে পারি!"

মামাবাবু উদাসীনভাবে শুধু একটু 'ওঃ।' বলেই চুপ করলেন।

নিজেকেই আবার কথাটা তাই পাড়তে হ'ল। বললাম—"অনেক কষ্টে প্রিন্সিপালকে রাজী করিয়েছি।"

"তাই নাকি!" বলে মামাবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

আবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম—"ওকে একবার দেখা করতে হবে যে!"

মামাবাবু এবার হতাশভাবে বললেন—"তা করবে। তবে গোটা কতক টাকা লোকসান হবে এই যা!"

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"টাকা লোকসান?"

"হ্যাঁ, লোকসান বই কি! আজ আবার আর্ট স্কুলে ওকে ভর্তি করিয়ে এলাম কি না!"

মনে অত্যন্ত রাগ হলেও মুখে বললাম—"ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছেন, তা হলে কি দরকার আবার সায়েন্স পড়তে যাবার?"

মামাবাবু খুশি হয়ে বললেন—"আমিও তাই বলি! কি জান? লেখাপড়া ত' ওর হবে না। কিন্তু আঁকার হাত ওর ভালো। ছেলেবেলা একটি গরু এঁকেছিল একেবারে গরুর মত শিং, চারটে পা, লেজ, সব ছিল তাতে।"

জীবনে আর মামার বাড়ীমুখো হ'ব না সঙ্কল্প করেই সেদিন সেখান থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু সঙ্কল্প ঠিক রাখতে পারলাম না—

আবার দার্জিলিঙ ফিরে যাবার সব ঠিক করে ফেলেছি এমন সময় পরের দিন বেলা এগারোটার সময় যে মেসে আমি উঠেছিলাম সেখানে মামাবাবু এসে হাজির।

আমায় দেখেই মামাবাবু একরকম কাঁদো কাঁদো। তাঁকে অনেক কষ্টে শান্ত করে যে কথা কয়টি আদায় করতে পারলাম, তাতে বুঝলাম যে এবার তাঁর বাড়ীতে সত্যি বিপদ হয়েছে, বেণু হঠাৎ কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাড়ীর বয়স্করা সবাই ইতিমধ্যে অফিস গেছে। তাঁরও অফিস আছে! অফিস যাবার আগে যে একজন ডাক্তার ডাকবেন সে ক্ষমতাও তাঁর নেই। ভয়ে ভাবনায় তিনি এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন যে, কোন্ ডাক্তারকে যে ডাকবেন তা ঠিকই করতে পারছেন না। এদিকে আজকাল যা কড়াকড়ি, অফিস না গেলেও চাকরি নিয়ে টানাটানি হবার সম্ভাবনা।

তাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—"আপনার কিছু ভাবনা নেই। আপনি অফিসে যান। আমি এখুনি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি।"

আমার দুটি হাত ধরে মামাবাবু আর একবার করুণ স্বরে বললেন—তোমার ওপর ভরসা করে যাচ্ছি, দেখো, বাবে তো বাবা?"

"সে কি কথা! আমি এখুনি যাচ্ছি।" বলে তাঁকে বিদায় করে পাঞ্জাবিটা মাথায় গলাতে গলাতে আমি ডাক্তার খুঁজতে বেরুলাম। অধিকাংশ ডাক্তার তখন 'কলে' বেরিয়েছেন, তাঁদের সন্ধ সন্ধ পাওয়া শক্ত, অনেক কষ্টে ভালো একজন বিশেষজ্ঞকে পেলাম। ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের গাড়ী আনতে পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু সময় সংক্ষেপের জন্য তাও তাঁকে করতে দিলাম না।

একটা ট্যাক্সি ডেকেই তাতে তাঁকে চাপিয়ে সোফারকে জোরে হাঁকাতে বললাম। নিজের কর্মতৎপরতায় নিজেরই বিস্ময় লাগছিল। ভাবছিলাম—বড় ঠাট্টা করে দাদারা। একবার যদি এখন দেখতে পেত!

আগেই বলেছি মামাদের গলিতে গাড়ী ঢোকে না। বড় রাস্তা থেকে ট্যাক্সি বিদায় করে ডাক্তারবাবুকে হাঁটিয়েই নিয়ে গেলাম। ডাক্তারবাবু বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন হলেন। কিন্তু তা তখন আমার দেখবার সময় নেই।

বাড়ীতে এবার সত্যই যে বিপদ হয়েছে কাছাকাছি যেতেই তা স্পষ্ট বোঝা গেল। বাইরে কোন লোকজন নেই। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ।

কিন্তু বাড়ীর দরজাটাও যে বন্ধ! সজোরে গিয়ে ধাক্কা দিলাম। কোন সাড়া শব্দ নেই। হ'ল কি তাহলে? ভয়ে আমার বুকটা কাঁপছিল। মামাবাবুর নাম ধরে ডেকে আবার কড়া নাড়া দিলাম। এবারেও কোন সাড়া নেই।

ডাক্তারবাবু খানিকটা দূরে দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আরো জোরে ধাক্কা দিলাম। এবার ভেতর থেকে সাড়া পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কিন্তু খানিক বাদে নিদ্রাজড়িত চোখ রগড়াতে রগড়াতে মামাদের পুরনো চাকর মধু যখন দরজা খুলে দাঁড়াল তখন অবাক্ হয়ে গেলাম।

মধু বিরক্ত হয়েই উঠে এসেছিল, আমায় দেখে একটু প্রসন্ন হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললে, "কেউ ত বাড়ী নেই বাবু!"

"বাড়ী নেই কিরে?

"না বাবু, সব দক্ষিণেশ্বর গেছে যে, আমি শুধু আছি পাহারা দিতে।"

অবাক্ হয়ে বললাম—"বেণুবাবুর অসুখ করেছে না?"

"অসুখ?" মধু অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললে যে, "অসুখ ত বাবুর করেনি। তবে বেণুবাবু ভাতের সঙ্গে চুল না কি খেয়ে একবার বমি করেছিলেন বটে, কিন্তু সে ত' কিছু নয়, দিদিমণির বাড়ী থেকে মোটর আসতে তাঁরা সবাই বেশ সুস্থ শরীরে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গেছেন।"

দূর থেকে ডাক্তারবাবুর মৃদু কাশির শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হ'ল দ্বিধা হও, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে এভাবেই কি করে ফেরান যায়! একটা কিছু উপায় ত' ঠাওরান দরকার—

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম—"ডাক্তারবাবু, একটু ভেতরে আসবেন?"

ডাক্তারবাবু বেশ গম্ভীর মুখে ঘরে এসে ঢুকে একবার গলা খাঁকরি দিলেন।

প্রত্যুত্তরে আমি একবার গলাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন—"রোগী কোথায় মশাই?"

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে বললাম—"আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না, আমার নিজের জন্যেই আপনাকে ডাকা!"

পলকের জন্য ডাক্তারবাবুর ভুরু দুটো বোধহয় একটু কুঁচকে উঠল, তারপর নিতান্ত নির্বিকারভাবে তিনি আমার হাতটা টেনে বললেন—"কি অসুখ? জ্বর?"

"আজ্ঞে না, এই পেটের এইখানটায় একটা ব্যথা!"

"হুঁ, শুয়ে পড়ুন।"

তাই পড়লাম। পেটের ব্যথার কথাটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সত্য হয়ে উঠল, ডাক্তারবাবু সজোরে এক জায়গায় টিপে বললেন—"এইখানটায়, কেমন?"

কোন রকমে গোঁয়াতে গোঁয়াতে বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, উঠে পড়ুন, কাল একটা জোলাপ নেবেন। আর এক হপ্তা খালি জল বার্লি পথ্য।"

"আজ্ঞে যা বলেন।"

ডাক্তারবাবু হাত বাড়ালেন, করকরে আটটা টাকা নিজের পকেট থেকে বার করে সে হাতে দিলাম। ডাক্তারবাবু টাকাটা পকেটে ফেলে টুপিটা বগলে চেপে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন—"দেখুন।"

"আজ্ঞে!"

"রোগটা আপনার পেটের নয়, মাথার! বুঝেছেন?" এই বলেই ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। নিঃশব্দে তাও হজম করলাম।

দার্জিলিঙ ফিরে আসার পর দাদা-বৌদিরা কি বলেছেন সে কথা কারুর শোনবার প্রয়োজন নেই।



পিঁপড়ের ডাক

শ্রীসরল দে

হরবোলা গো হরবোলা !
পথে পথে বেড়াও ঘুরে পর-ভোলানো ঘর-ভোলা ।
রকম রকম ডেকেই তুমি সত্যি পাড়া মাৎ করো,
হঠাৎ ডেকে শেয়াল-পেঁচা দিনকে তুমি রাত করো ।
নকল করো সকল গলা নয় তা অতিরঞ্জিত,
বাঘের গলা শুনেই কাঁদে ছোট্ট আমার বোন্‌ঝি তো ।
ডাকছ ব্যা-ব্যা ছাগল-গলায়, ডাকছ গরুর হাম্বা রে,
দেশে দেশে পাড়ায় পাড়ায় তাই না তোমার নাম বাড়ে ।
নকল করো সকল গলা, ডাকতে পারো সব রকম,
ডাকতে পারো কিচির-মিচির, ডাকতে পারো বক্‌বকম্ ।

হরবোলা গো হরবোলা !
'পিঁপড়ে ডাকো' বললে তুমি হঠাৎ কেন স্বর-ভোলা ?
পিঁপড়ে কি আর ডাকছে না গো ? ডাকছে মৃদুমন্দ রে,
ডাকছে তারা মনের সুখে গর্ত-বাসায় অন্দরে ।
পিঁপড়ে ডাকে কেমন করে ? আচ্ছা শোনো মন দিয়ে—
শুনতে কিছু পাচ্ছ না হে ? ভাবছো মিছে ফন্দি এঁ ?
পিঁপড়ে ডাকে শব্দ ছাড়া, সে-ডাক অতি সূক্ষ্ম রে—
মনের কানে শুনতে হবে প্যাঁচার মতন মুখ করে ॥

লিমেরিক

শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত

হরিপদ হালদার ব্যবসাতে ভালভার—
রাতারাতি ফুলে ফেঁপে হয়ে গেল মালদার ।
তার ছেলে তারাদাস
ভুগে ভুগে বারো মাস
জমাজমি বেচে হল ফেরিওলা খ্যা'লদার ।

অগ্নিযুগের যাত্রী

স্বপন বুড়ো



এক

চন্দনের এখন যে বয়েস তাতে তার খেলা-ধূলা করে, গাছ থেকে পাকা আম-জাম পেড়ে, আর নদীতে সাঁতার কেটেই আনন্দ পাওয়া উচিত। কিন্তু চন্দনের দারোগা বাপ তার কিশোর ছেলের বিষয়ে খুব বেশী আশা পোষণ করে না।

বাপ সব সময়ই কর্মব্যস্ত। চোর ডাকাত ধরবার জন্যে ছুটোছুটি তার লেগেই আছে। বেচারী বাড়ীতে আরাম করে বসবার আর কতটুকুই সময় পায়?

একদিন বাপ ধমক দিয়ে বললে, হ্যাঁরে চন্দন, তুই সব সময় ঝিম মেরে বসে থাকিস্ কেন? পড়াশোনা ত' গোল্লায় গেল। একটু ছুটোছুটিও ত' করতে পারিস—যাতে বুঝতে পারি তুই বেঁচে আছিস।

চন্দনের মা ওকে সব সময় চোখের আড়াল করে রাখতে চায়।

—আহা! বেচারী সেই ছেলেবেলা থেকে বড্ড ভোগে। ওকে তুমি বকাবকি কোরো না। বড় হলে সব সেরে যাবে।

চন্দনের বাবা মাথা নাড়ে।

—না, না, ছেলে-বয়সে ছুটোছুটি না করলে কখনো শরীরের বাড় হয়? যে বয়সের যা ধর্ম। গাছে ওঠ্, পাখীর বাসা চুরি করে আন। আম-জাম-জামরুল গাছ থেকে কোঁচড় ভরে ফল এনে খা। কুকুরটাকে নিয়ে ছুটোছুটি কর। তা নয় শুধু দিন রাত ঝিম মেরে বসে থাকবি। এর চাইতে লোক যদি ওর নামে এসে কেবলি নালিশ জানায়—চন্দন আমাদের লিচু গাছের ডাল ভেঙে ফল খেয়েছে, চন্দন আমাদের পাঁটা চুরি করে পালিয়ে গেছে, চন্দন আমাদের ময়না পাখীটাকে খাঁচা শুদ্ধ নিয়ে সরে পড়েছে, তা হলে আমি মনে-মনে বেশী খুশী হতাম। ভাবতাম ছেলেটার মধ্যে একটা জ্যান্ত প্রাণ লুকিয়ে আছে।

মা বলত, ষাট—ষাট। আমার চন্দন কেন অকারণ পরের অনিষ্ট করতে যাবে। ও আমার কোল জুড়ে বেঁচে থাক।

চন্দনের ভাব কিন্তু ওর বিষাণ খুড়োর সঙ্গে।

সারাদিন বিষাণ খুড়োর সঙ্গে কি গুজ্‌গুজ্‌ করে তা ওই ভালো করে জানে।

বাপ বলে, বিষাণই ওকে আরো মাটি করে তুলছে। দিনরাত্তির রূপকথা শুনলে শরীরে কখনো তাকত্‌ আসে? ছুঁড়ে ফেলে দে নদীর জলে আপনা-আপনি আকু-পাকু করে হাবু-ডুবু খেয়ে সাঁতার শিখুক। তা হলেও বুঝবো একটা কাজের মত কাজ হল!

মা আতঙ্কিত হয়ে উত্তর করে, না, না, ওই ক্ষীণজীবি ছেলেকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কখনো বাঁচে? ও থাক আমার কোল জুড়ে—বুক ভরে। বয়স বাড়লেই ওর সবকিছু রোগ-বালাই পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।

বাপ মত প্রকাশ করে, ওই রকম করেই ত' ছেলেটার মাথা খেলে! বড় হয়ে ও কুটোগাছটিও নাড়তে পারবে না।

বিষাণ খুড়ো কিন্তু সবকিছু শোনে আর আপন মনে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে।

একদিন বিষাণ খুড়ো কোমরে গামছা জড়িয়ে হাসিমুখে শুধোয়,—হ্যাঁরে চন্দন, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি?

চন্দনের মুখেও যেন কেমন একটা খুশী-খুশী ভাব। মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে—হুঁ। তুমি নিয়ে গেলে যাবো—

বিষাণ খুড়োর একটা ডিঙি নৌকো আছে।

সেইটে চড়ে সে আপন মনে ঝোপে-জঙ্গলে নদী-নালা খাল-বিলে ঘুরে বেড়ায়। দারোগার ভাই বলে কেউ কিছু বলে না।

আবার পাড়ার অনেকে মন্তব্য করে, ও বিষাণপাগলা ত? ওর অগম্য স্থান নেই, সাপ-খোপের ভয়ও নেই ওর প্রাণে। একেবারে নিশাচর বললেই হয়।

সেদিন বিকেলে চন্দনকে নিয়ে বিষাণ বেরুল তার ডিঙি নৌকোয় চেপে।

প্রথমে খাল বেয়ে ডিঙি নৌকো নদীতে গিয়ে পড়ল।

নদীর ধারে বালি চিকচিক করছে। নদীর জল কাকের চোখের মতো ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। জলের নীচে কত মাছ কিল্‌বিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয় হাত বাড়ালেই কত মাছ তোলা যাবে।

বিষাণ খুড়ো বললে, অমন করে ঝুঁকিসনে চন্দন। নৌকো উল্টে নদীর জলে পড়ে যাবি—

চন্দনের মনে তখন মহা আনন্দ।

—দেখেছ বিষাণ খুড়ো, নদীর জলে কত মাছ কিল্‌বিল্‌ করছে।

বিষাণ খুড়ো জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে চন্দন, তোর ভয় করছে না ত?

—না না, ভয় করবে কেন? ভারি মজা লাগছে। নদীর ধারে কত হাওয়া! আমাদের বাড়ীটা যেন গুমোট!

—জানিস ত' খোলা হাওয়ায় মন খোলে—বিষাণ খুড়ো মুচকি মুচকি হেসে বললো।

আরো কিছুদূর এগিয়ে নদীর বুকে একটা ছোট ঘর পাওয়া গেল। বিষাণ খুড়ো খুশী-খুশী মুখ নিয়ে বললে, আয় এই চরে আমরা ডিঙি ভেড়াই।

চন্দনও অনেকক্ষণ ডিঙির ওপর বসে আছে। তার পা'দুটি আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। মাটির ওপর হাঁটতে পারলে সেও যেন বাঁচে।

হাততালি দিয়ে বললে, সেই ভালো বিষাণ খুড়ো, ওই চরের বুকে আমরা ঘুরে বেড়াবো। দেখেছ চরটাতে কত কাশফুল ফুটে আছে। সাদা ধবধবে। হাওয়াতে হেলছে দুলছে। যেন আমাদের মাথা নেড়ে ডাকছে।

—ঠিক তাই। ওদের ডাকে আজ আমরা সাড়া দেবো।

ডিঙি নৌকোটা চরের বুকে উঠে পড়ল। বিষাণ খুড়ো নেমে ডিঙিটাকে বালির ওপর আরো ঠেলে তুলে দিল।

চন্দনের খুশীর সীমা নেই।

—দেখছ বিষাণ খুড়ো, চরের বুকে কত রঙ-বেরঙের পাখী—কি সব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ওর ভেতর কত বেলে-হাঁসও প্যাঁক্‌প্যাঁক্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পশ্চিমদিকে সূর্যিমামা লাল হয়ে উঠেছে। আর খানিক বাদেই পাটে বসবে। অবাক্‌ হয়ে চন্দন সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

বিষাণ খুড়োর মুখটাও যেন কেমন থমথমে হয়ে গেল। আর আগের মতো সেই হাসি-খুশী ভাব নেই। বিষাণ খুড়ো একটু চুপ করে থেকে বললে, আচ্ছা চন্দন, আমাদের দেশের কথা তোকে কত বলেছি—

—হ্যাঁ, বিরাট আমাদের দেশ।

—নাম কি?

—ভারতবর্ষ।

—সেই ভারতবর্ষ একদিন পরাধীন হল। স্বাধীনতার সূর্য ডুবে গেল। আজ যেমন লাল সূর্য ডুবে যাচ্ছে নদীর পশ্চিম পাড়ে।

—আমাদের দেশটা কত বড় বিষাণ খুড়ো?

—মস্ত বড় বিরাট—হিমালয় থেকে সাগর অবধি। কত নদী, কত পাহাড়—

পর্বত কত লাখো লাখো মানুষ। কত তাদের পোষাক, কত তাদের ভাষা। সব বলেছি তোকে।

হঠাৎ বিষাণখুড়ো চরের বুক থেকে একটি কাঠি হাতে তুলে নিল। চরের বুকে এঁকে দিল একটা ম্যাপ—

এই আমাদের নিজের দেশ মাতৃভূমি, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। আরো বড় হলে নিজে ঘুরে ঘুরে দেখবি সেই বিশাল ভারতবর্ষ।

বিষাণ খুড়ো হঠাৎ সেই ম্যাপের ওপর কাঠি দিয়ে লিখে দিলে—ব—ন্দে—মা—ত—র—ম্। বল—বন্দেমাতরম্।

চন্দন অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলে—ব—ন্দে—মা—ত—র —ম্।

অবাক্ হয়ে বিষাণ খুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দন জিজ্ঞেস করলে, 'বন্দেমাতরম' কি বিষাণ খুড়ো?

বিষাণ খুড়োর মুখের ওপর অস্তাচলের রবির রাঙা আভা এসে পড়েছে। তাতে চন্দনের মনে হল এ যেন তার চেনা বিষাণ খুড়ো নয়, অন্য এক মানুষ। যার মাথা হিমালয়ের মত উঁচু। পায়ের তলায় সাগরের ঢেউ।

চন্দন শুধলে, কি ভাবছ বিষাণ খুড়ো?

বিষাণ খুড়ো উত্তর দিলে, বন্দেমাতরমের মানে জানতে চাস? মানে হচ্ছে মাকে বন্দনা করো—পূজো করো। তোর ঘরে যেমন তোর নিজের মা রয়েছে—তেমনি আমাদের দেশ—আমাদের মাতৃভূমি আর এক মা। যাকে বলে দেশ-জননী। তাঁকে পূজো করার মন্ত্র হচ্ছে—বন্দেমাতরম্—! বল—প্রাণ খুলে, মন খুলে—এই খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বল—বন্দেমাতরম্—

—ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্।

—তবে একটা কথা। বিষাণ খুড়ো একটু ইতস্ততঃ করল।—শোন, তোকে বলি—। সবাইকার সামনে বলবি নে।

—কেন বিষাণ খুড়ো? চন্দন অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

—এটা যে মন্ত্র। মাতৃপুজোর মন্ত্র। মন্ত্র কি সবাইকার সামনে উচ্চারণ করে?

—করে না বুঝি?

—না, মন্ত্র হচ্ছে রক্ষাকবচ। আর একটু বড় হলেই বুঝতে পারবি। বল্‌বি শুধু নিজের কাছে। বলবি আপন মনে।

চন্দন আবার উচ্চারণ করল—ব-ন্দে-মা-ত-র-ম।

নদীর চরের পাখীগুলি কি একসঙ্গে গেয়ে উঠল—ব-ন্দে-মা-ত-র-ম !!!

দুই

নদীর জল অস্ত রবির রঙে একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে। আকাশ রাঙা, নদীর জল রাঙা, আর ওদের সারা দেহ-মনও যেন রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে।

স্বাধীনতার রবি ডুবে গেলে বুঝি এমনি হয়?—বিষাণ খুড়ো মুখ নীচু করে বললে, এইবার আমরা ফিরবো রে চন্দন—

চন্দন তার খুড়োর কথাটা ভালো করে শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। সে একবার মাথাটাকে উঁচু করে শুধালো, আচ্ছা বিষাণ খুড়ো, তুমি বলছ দেশ মায়ের চাইতেও বড়···সেটা কেমন?

বিষাণের মুখ চোখ কপাল অস্তাচলের সূর্যের আভায় লালে লাল। সে যেন অনেক দুঃখে অনেক অশান্তিতে মাথা তুললে। তারপর ধীর কণ্ঠে বললে, এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলি না? ধর, আমরা সুখে-শান্তিতে নিজেদের বাড়ীতে আছি, এমন সময় কয়েকটা দস্যু জোর করে তোদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। তোর মায়ের বুকে তাদের বুট পরা কাদা-মাখা পা জোর করে চাপিয়ে দিল। তখন তুই কি করবি?

চন্দন আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। তার নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। সে চীৎকার করে বললে, তাহলে আমাদের রাম-দাও নিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ব তাদের ওপর।

—তা হলেই দেখ্—বিষাণ খুড়োও উত্তেজিত হয়ে বললে, মায়ের ওপর অত্যাচার হলে কোনো ছেলের জ্ঞান-গম্যি থাকে না। হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে দস্যুর ওপর। মায়ের চাইতেও বড় হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের ভারতবর্ষ। একদল লাল বাঁদর জোর করে তাকে দখল করেছে। কাঁটা মারা বুট পরে মায়ের বুকের ওপর লাফালাফি সুরু করে দিয়েছে। এখন আমরা কি করবো? নানা রকম বিলাসে কাল কাটাবো? বিদেশী পোষাক পরে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবো? দস্যু মায়ের লাঞ্ছনা করছে করুক, আমরা তবু নানা রকম খাবার খাবো? গান গেয়ে নেচে নেচে কাল কাটাবো? বল তুই সত্যি করে চন্দন, বারো মাসে তের পার্বণ করবো?

খুড়োর এই রকম কথা শুনে চন্দন কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। শুধায়, আচ্ছা, সত্যি কি একদল লাল বাঁদর আমাদের দেশটাকে কেড়ে নিয়েছে?

—নিয়েছে বৈকি ! বিষাণ খুড়ো ডিঙি ভাসিয়ে দিয়ে ততক্ষণে গান ধরেছে—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়
এই যমুনা গঙ্গা নদী
ইহা তোদের হত যদি
তবে পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়।"

রাঙা নদীর বুকে ভেসে চলেছে ডিঙি নৌকো, আর বিষাণ খুড়োর ভরাট গলার গান যেন নদীর ওপর দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে একেবারে মাথার ওপর অনেক উঁচুতে উঠে গেছে।

ঘরে ফেরা পাখীর দল মালার মতো রাঙা আকাশে উড়ে চলেছে। এই গানের সুর কি তাদের ডানাও কাঁপিয়ে দিলে ? চন্দন অবাক্ হয়ে সেই পাখী ওড়া উঁচু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে বেশ আঁধার ঘনিয়ে এলো। চন্দনের মা ব্যস্ত হয়ে শুধালে, তোদের এত দেরী হল কেন রে ? সন্ধ্যে যে একেবারে উত্‌রে গেল !

চন্দন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, এই নদীর ওপরকার চরের ধার থেকে ঘুরে এলাম মা ! বেশ খোলামেলা ! খুব ভালো লাগল মা।

মা কিন্তু ব্যস্ত হয়ে ঘর-বার করছিল। তাই ওদের দিকে তাকিয়ে বললে, তা বলে এত রাত করে ? আমি ভেবে মরি ! নদীর পথ, কি জানি—কখন কি অঘটন ঘটে ! দিনের আলো থাকতে থাকতে ফেরা উচিত ছিল।

চন্দনের বাবা সারাদিনের কাজ-কর্মের শেষে নিশ্চিন্ত মনে ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল। আজ মন-মেজাজ দিব্যি হালকা ছিল। হুঁকোয় আমেজ করে টান দিতে দিতে বল্‌লে, জানো চন্দনের মা, আজ একদল অকাল কুষ্মাণ্ডকে ধরেছি। ওরা নাকি সায়েবদের তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন করবে। তোদের ভালো করে গোঁফের রেখা দেখা দেয়নি······তোরা সায়েবদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করবি ? শুনে হেসে বাঁচিনে ! একেই বলে ঢাল নেই, তরোয়াল নেই—নিধিরাম সর্দার ! দিয়েছি ওদের সব হাজতে পুরে। তারপর দেবো সোজা সদরে চালান করে।

আজ চন্দনের বাবা ভারি খোস-মেজাজে আছে। তাই তামাক টানতে টানতে বললে, জানো গিন্নি, ভাবছি,আর তামাক খাবো না। ওই যে বিলিতি সিগারেট এসেছে,—ভারি খোশবাই····· এখন থেকেই ওই সিগারেট টানবো।

মন-মেজাজ একেবারে দিলখোস হয়ে যাবে। হাজার খাটা-খাটুনি হলেও পরিশ্রম মনে হবে না।

আবার ওর গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানার শব্দ শোনা গেল। বিষাণ খুড়ো সেই যে গিয়ে তার ঘরের ভেতর সেঁধিয়েছিল, আর তার কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

চন্দন কয়েকদিন থেকে একটি পাখীর খাঁচা তৈরী করছিল। মনে মনে বাসনা ছিল—একটি চন্দনা পাখী জোগাড় করে ও পুষবে। তাই এই খাঁচা তৈরীর আয়োজন।

আজ সন্ধ্যায় নদীর চর থেকে ফিরে সে চুপচাপ ঘরের দাওয়ার বসে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। এক একবার তার মনে হচ্ছিল—, আচ্ছা, আমি যদি একটা পাখীকে খাঁচায় আটকে রাখি,—তাহলে সে ত' বন্দী হল। সে ইচ্ছে মত আকাশে উড়তে পারবে না, গাছের ডালে দোল খেতে পারবে না, অসীম শূন্যে পাখা মেলে দিয়ে গান গাইতে পারবে না। তা হলে সেও ত' পরাধীন হয়ে পড়ল! একটি পাখীর স্বাধীনতা আমি হরণ করবো? তাহলে লাল বাঁদরেরা কি দোষ করল? তারাও ত' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে!

খাঁচাটা তৈরী করতে গিয়ে চন্দন এবার সেটাকে সরিয়ে রাখল।

রাত্রে মা খেতে ডাকলেন।

খাওয়ার দিকে ওর মন নেই। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করল। কি যে খেলো—তা ভালো করে বুঝতে পারল না।

অনেক রাত্তির পর্যন্ত সে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল। কিছুতেই ঘুম আসে না। মাথার কাছের খোলা জানালাটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারা ভরা আকাশ···কত তারা কে গুনে দেখেছে! আচ্ছা, ওরা কি স্বাধীন? ওই যে আকাশে পাখীর দল নিজ নিজ নীড়ে ফিরে গেল—তারা ত' স্বাধীন। আবার ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নীড়ের মায়া ছেড়ে অসীম আকাশের বুকে উধাও হয়ে যাবে!

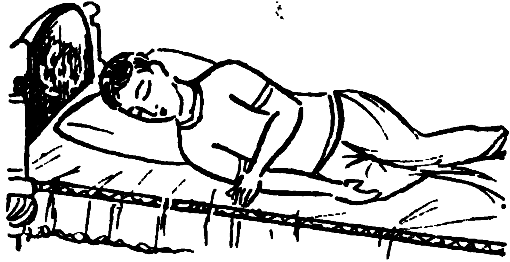
চন্দনের ভাবনার যেন আর শেষ নেই।

কত রাত্তিরে তার দুই চোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো, সে নিজেই ভাল করে জানে না!

গভীর রাত্রে চন্দন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল:

চারদিকে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে? এই রক্তের স্রোত কোথা থেকে আসছে, চন্দন ভালো করে ঠাহর করতে পারে না। হয়ত ভারতবাসীর রক্তেই এই উত্তাল বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।

আবার কিছুক্ষণ বাদেই দেখা গেল,—অন্ধকারের বুক চিরে রাশি রাশি পা এগিয়ে আসছে। শুধু পাদুকাগুলিই চোখে পড়ছে। মানুষগুলোর সারা দেহ অন্ধকারে ঢাকা।



পাগুলিতে বুট জুতো পরা। জুতোর তলায় তীক্ষ্ণ কাঁটা মারা। পাগুলো যখন এগিয়ে আসছে—তাদের মচমচ শব্দে সবাই আতঙ্কে চতুর্দিকে ছুটে পালাচ্ছে।

দেশ-জননীর বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে নির্মম কঠিন পাদুকাগুলি। প্রতিবাদ করবার কেউ নেই—নেই কোনো চীৎকার বা আর্তনাদ। লাঞ্ছিতা দেশ-জননী অসহায়ের মতো পড়ে আছে। মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত কেশ-পাশ থেকে অঝোরে রক্ত ঝরে পড়ছে। অন্ধকারের বুক চিরে একটা বীভৎস হাসি ভেসে আসছে।

সেই সঙ্গে অস্ফুট একটি ক্ষীণ ক্রন্দনের ধ্বনি!

কে এমন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে? ওর চোখের জল মুছিয়ে দেবার কি কেউ নেই?

সেই বীভৎস হাসির উল্লাস যেন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব অন্ধকারে একাকার। কোথায় কে দাঁড়িয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

হঠাৎ দেখা গেল শত সহস্র তরুণ এগিয়ে আসছে—এক হাতে তাদের স্বাধীনতার জয়-পতাকা—অপর হাতে তীক্ষ্ণধার ছুরি···

অন্ধকারের অন্তরাল থেকে কে যেন প্রশ্ন করল—কি তোমাদের সঙ্কল্প?

—মায়ের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ চাই।

আবার সেই প্রশ্ন—বুকের রক্ত ঢেলে দেবীর আহ্বান করতে পারবে?

—পারবো।

—তবে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করো—ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্।

সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'বন্দেমাতরম্'...

হঠাৎ চন্দনের ঘুম ভেঙে গেল। সারা দেহ তার ঘামে ভেজা। জানালা দিয়ে দেখল, পূব আকাশে আলোর ঝিলিক। ভোরের স্বপন কি সত্যি হয়?

তিন

বিষাণ খুড়ো আর একদিন চন্দনকে চুপি চুপি ডেকে বললে, ওরে, আজ তোকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবো। কিন্তু কাউকে বলতে পারবিনে— কোথায় গিয়েছিলি।

চন্দনের চোখে-মুখে কৌতূহল। উত্তর দিলে, ঠিক আছে। আমি কাউকে কিছু বলব না। আবার তুমি না ভুলে—সবাইকে সব কিছু জানিয়ে দাও।

ওর কথার ধরণ শুনে বিষাণ খুড়ো হো-হো করে হেসে ফেললে।

উঠোন থেকে চন্দনের মা জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ রে, তোরা খুড়ো-ভাইপোতে ঘরের ভেতর বসে পাগলের মতো হাস্‌ছিস কেন?

বিষাণ খুড়ো জবাব দিলে, না-না, আজ আমরা এক জায়গায় বেড়াতে যাবো কিনা—তাই চন্দনকে বলছি।

চন্দনের মা বললে, বেড়ানো ত' ভালো। তোরাই ত' ঘরের কোণ থেকে বেরুতে চাস না। ভগবান যখন সুমতি দিয়েছেন তখন প্যাঁচার মত ঘরের ভেতর বসে না থেকে চটপট বেরিয়ে পড়। হ্যাঁ, ভাল কথা, যাবার আগে চিড়ে ভাজা আর নারকেল কোরা খেয়ে যাস। যেখানেই যাস্ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। বেশী রাত করিস নি যেন।

মায়ের কথায় ওরা তুজনে তৈরী হয়ে নিল। পথে বেরুতে চন্দনের কয়েকজন ইস্কুলের ছাত্রের সঙ্গে দেখা। তারা সবাই একসঙ্গে কলরব করে উঠল। —হ্যাঁ চন্দন, তুই ইস্কুলের ছুটির পর আমাদের সঙ্গে খেলার মাঠে খেলতে আসিস নে কেন? —চল, চল, আজ আমরা হাডু-ডু খেল্‌বো। আমাদের দলের লোক কম পড়ে গেছে। তুই আমাদের দলের সঙ্গে আজ খেলবি চল—

বিষাণ খুড়ো বললে, আজ চন্দন আমার সঙ্গে একটা কাজে বেরিয়েছে। আর একদিন না হয় তোমাদের সঙ্গে খেলবে।

ছেলের দল কোলাহল করতে করতে চলে গেল।

চন্দন খেলার মাঠ ছাড়িয়ে, গাঁয়ের ডাকঘর বাঁয়ে রেখে, সনাতনের

রসগোল্লার দোকান পেরিয়ে, একটা পোড়ো বাগানবাড়ীকে পাশে রেখে একেবারে দক্ষিণ পাড়ার খালের ধারে এসে পড়ে।

এ জায়গাটা ভারি নির্জন।

চাষীদল সারাদিন ক্ষেত-খামারে খেটে গরু নিয়ে ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিয়েছে। গরুর গলার ঘণ্টা টুং-টাং বাজছে। আওয়াজটা চন্দনের কানে ভেসে আসছে।

খালের ধার দিয়ে আরো কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে একটা খামার বাড়ী। চারদিকে চাটাইয়ের বেড়া। বিষাণ খুড়োর সঙ্গে চন্দন সেই খামার বাড়ীর একেবারে ভেতরকার উঠোনে ঢুকে পড়ল।

কয়েকটি তার বয়সী ছেলে, আর জনাকয়েক বড় ছাত্র উঠোনটার এক ধারে বসে জটলা করছে। কেউ কেউ উঠোনের মাটি মেখে বুক-ডন দিচ্ছে, আবার কয়েকজন কেবলি ওঠ-বোস করছে।

এই নির্জন খামার বাড়ীর উঠোনে একদল ছেলে এইসব কাণ্ড করছে দেখে চন্দন ভারি অবাক্ হয়ে গেল।

বিষাণ খুড়ো তাকে উঠোনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিল। ছেলের দল কেউ তাদের ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। যেন ওরা যে আজ এখানে আসবে—সেকথা তাদের জানাই ছিল।

এইভাবে আরো কিছুক্ষণ ছেলেদের বুকডন আর ওঠ-বোস চলল। তারপর হঠাৎ কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, এই যে আমাদের মৌলভী সায়েব এসে গেছেন—

ওদের কথায় চন্দন ফিরে তাকিয়ে দেখল।

কী আশ্চর্য! তাদেরই ইস্কুলের মৌলভী সায়েব একেবারে উঠোনের মাঝখানে এসে হাজির হয়েছেন।

চন্দন ভাবলে, এখানে আসার জন্যে মৌলভী সায়েব কি তাকে বকবেন?

না বকাঝকা ত নয়। মৌলভী সায়েব চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। তাঁর চোখ দুটো যেন আনন্দে ছোট হয়ে গেল। মৃদুকণ্ঠে বললেন, তা হ'লে তুমিও হাজির হলে চন্দন! আমি বিষাণকে কতদিন বলেছি। আজ দেখছি ওর ঘুম ভেঙেছে।

মৌলভী সায়েব নিজের গায়ের পিরাণটা খুলে ফেলে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলেন। তফনটা গুটিয়ে নিয়ে মালকোচার মত করে পরলেন।

নিজের দুই হাতের গুল ভালো করে দলাই-মলাই করলেন। গুলগুলো বেশ ফুলে উঠে বলের মতো দেখালো। পিরাণের তলায় মৌলভী সায়েবের যে এমন পুষ্ট দেহ চন্দন তা একদিনের তরেও ভাবে নি। আজ বিকেলে এই নির্জন খামার বাড়ীর উঠোনে তাঁকে একেবারে অন্য মানুষ বলে মনে হল।

চন্দন অবাক্ হয়ে মৌলভী সায়েবের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ মৌলভী সায়েব এক সময়ে হাঁক দিলেন,—ওরে তোরা ঘর থেকে লাঠিগুলো বের করে নিয়ে আয়—

ছেলের দল হুড়োহুড়ি করে নিজের নিজের লাঠি নিয়ে এসে উঠোনে সার দিয়ে দাঁড়াল।

চন্দন তাকিয়ে দেখলে মৌলভী সায়েবও তাঁর নিজের তেলপালিশ করা লাঠিটি বাগিয়ে ধরেছেন।

মৌলভী সায়েবই ছেলেদের লাঠি খেলা শেখান। তিনিই এখানকার শিক্ষা-গুরু। অথচ কি ভাবে তিনি নিজেকে একেবারে আড়াল করে রেখেছেন। চন্দন ত' ইস্কুলে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগিরি করা ছাড়া তাঁর আরও একটা গুণ আছে। সত্যি, মানুষের মাঝে যে কত গুণ লুকিয়ে থাকে—অন্যে তার কতটুকু সন্ধান রাখে?

সুরু হল লাঠি খেলা শেখানো।

দারুণ বিক্রমে হুঙ্কার দিয়ে মৌলভী সায়েব লাঠি হাতে সারা উঠোনটা চষে বেড়াতে লাগলেন।

একের বাড়ি, দুয়ের বাড়ি, তিনের বাড়ি!

যেন মত্ত সিংহ হুঙ্কার দিয়ে একবার এগিয়ে আসছে, আবার পরমুহূর্তেই পেছিয়ে যাচ্ছে!

কি ভাবে এগিয়ে এসে আক্রমণ করতে হবে, আবার কি কৌশলে অপরের মার রুখতে হবে,—মৌলভী সায়েব তাঁর সাগরেদদের অতি কৌশলের সঙ্গে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ লাঠি খেলার পর সকলের গা বেয়েই দারুণ ঘাম ঝরতে লাগল। মৌলভী সায়েব হুঙ্কার দিয়ে বললেন—সবুর—! এইবার তোমাদের খেলার বিরতি।

খেলা শিখতে গিয়ে যাদের গায়ে চোট্ লেগেছিল—তাদের ক্ষত স্থান মৌলভী সায়েব পরীক্ষা করে দেখলেন। পিরাণের পকেট থেকে কি মলম

বের করে চোট্ লাগার জায়গায় ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলেন। বললেন, যা, আর কোনো দরদ থাকবে না—। ইয়ে আচ্ছা দাওয়াই হ্যায়—বিল্‌কুল সব ঠিক হো যায়েগা।

এরপর একটা গাছতলায় মৌলভী সায়েব সবাইকে নিয়ে বসলেন। লাঠি খেলতে গিয়ে কার কি ভুল-ত্রুটি হয়েছিল—সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করলেন।

দু-একটি নতুন ছেলে এসেছিল ভর্তি হতে। মৌলভী সায়েব তাদের দেহ পরীক্ষা করে দেখলেন—কোথায় বাড়ী—, কত দূর থেকে আসতে হবে—সব জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন। তাদের কাছে ডেকে সাবধান করে দিলেন যে, লাঠি খেলা শিখতে গেলে কোনো মতেই কামাই করা চল্‌বে না।

এইবার বোধকরি মৌলভী সায়েবের ফুরসৎ হল। তিনি চন্দনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি, মন-মেজাজ ঠিক রেখে শিখতে পারবে ত? আপনা দিল্‌কো পুছো—

চন্দনের যেন কেমন লজ্জা করতে লাগল। সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিষাণ খুড়ো ওর হয়ে উত্তর দিলে, আপনি ওকে ভর্তি করে নিন মৌলভী সায়েব। নিশ্চয়ই শিখবে। আর কামাই করবে কেন? আমি ওকে সঙ্গে করে রোজ নিয়ে আসবো।

মৌলভী সায়েবের মুখে তৃপ্তির হাসি। বললেন, বহুৎ আচ্ছা—সাকরেদ হয়ে পড়।

সেদিন বিষাণ খুড়োর সঙ্গে বাড়ী ফেরার পথে চন্দর মনে মনে কিসের যেন একটা শিহরণ অনুভব করলে।

আবার অন্তরে ভয়ও জাগে দ্বিধাও আসে। সত্যি সেকি মৌলভী সায়েবের কাছে লাঠি খেলা শিখতে পারবে? আবার ভাবে,—প্রাণপণ চেষ্টা করলে কেনই বা পারবে না?

ফিরতি পথে আসতে আসতে চন্দনের মনে হল,—সে যেন একটা অচেনা জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। যেখানে কিছুই তার জানা নেই। কিন্তু সেই অজানা-অচেনা জগতের আকর্ষণও বড় কম নয়।

ওখানে সে ঢুকবে, না কাপুরুষের মতো ফিরে আস্‌বে?

দেশ-জননীর লাঞ্ছনার কথা আবার নতুন করে মনে জাগল। লাঠি চালিয়ে

কি লাল বাঁদরদের মাতৃভূমির বুক থেকে দূর করা যাবে? ওদের রয়েছে কামান-বন্দুক সৈন্য-সামন্ত।

চলার পথে অশথ গাছের ফাঁক দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঁকি মারলে।

চাঁদ কি তাকে আশার কথা—ভরসার কথা শোনাচ্ছে?

চার

চন্দন এখন ইস্কুলের ওপরের দিকের ছাত্র।

পড়াশোনায় সে বরাবরই ভাল। শিক্ষকদের কাছে সুনাম আছে। এখন ওর নানা রকমের বই পড়ার দিকে ঝোঁক হয়েছে।

বিষাণ খুড়ো ওকে ছেলে বয়েস থেকেই নানা রকম বই এনে পড়াচ্ছে। রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, পুরাণের কাহিনী, জাতকের গল্প, রাণা প্রতাপের জীবনী, শিবাজীর জীবনী। এই সব বই। আরো বড় হলে পড়বে—ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডীর জীবনী, লেনিনের জীবনী, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, লাল ফৌজের কথা, সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথা প্রভৃতি—

ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকেও কিছু কিছু বই এনে পড়েছে। গতানুগতিক গল্প-উপন্যাসের দিকে ওর ঝোঁক কম। চন্দন কেবল অজানাকে জানতে, অচেনা জগতের অন্ধকারে প্রবেশ করতে চায়। ওর চোখ দুটো যেন মশাল। তাই জ্বালিয়ে সে বইয়ের রাজ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার খুঁজে বেড়ায়।

মহাশূন্যের কথা, গ্রহ-উপগ্রহের কাহিনী ওর খুব ভাল লাগে। সাগর তলার রহস্য ওর মনকে টানে। অজানা পথের আবিষ্কারে যারা জীবন পণ করে বেরিয়েছে—তাঁদের জীবনী চন্দন খুঁজে খুঁজে এনে পড়ে। উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের কাহিনী ওর মনকে আকর্ষণ করে। এভারেস্ট বিজয়ের কাহিনী ওর কাছে উপন্যাসের চাইতে রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়।

এই বই পড়ার নেশা ওকে অনেকটা কুনো করে তুলেছে। ছেলেরা যখন দল বেঁধে মাছ ধরতে যায়, কিম্বা ফুটবল ম্যাচ দিতে এগিয়ে চলে—তখন চন্দন সবাইকার আড়ালে হয়ত নিগ্রোজাতির কর্মবীর কিম্বা টমকাকার কুটীর পড়ছে। কখনো পড়ছে সিরাজদ্দৌলার জীবনী অথবা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।

ছেলের দল ওকে কত ডাকাডাকি করে—ওরে আয়—আমরা সবাই ঘুড়ি উড়িয়ে কাটাকাটি খেলবো—ও হয়ত তখন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, বড্ড মাথা ধরেছে রে, আজ আমি আর বেরুবো না।

ছেলেরা টিপ্পনী কাটে, দিন-রাত্তির বইয়ের পোকা হয়ে থাকলে মাথা ধরবে না? খোলা হাওয়ায় খেলাধূলো করতে হবে—তবেই না মাথাধরা ছাড়বে।

কিন্তু আসল কাজে চন্দন কিছু ফাঁকি দেয় না। রোজ বিকেলে গোপনে মৌলভী সায়েবের আখড়ায় গিয়ে হাজির হয়। আগে বিষাণ খুড়ো সঙ্গে নিয়ে যেতো, এখন একা-একাই যেতে পারে।

যে লাঠি-খেলাকে চন্দন এত ভয়ের চোখে দেখত, এখন সে মৌলভী সায়েবের সাকরেদী করে দিব্যি পাকা লাঠি-খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে। এখন সে লাঠি বাগিয়ে অনেক ছেলের মহড়া নিতে পারে। বিদ্যুৎ বেগে লাঠি ঘোরাতে শিখেছে চন্দন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়েতে পড়েছে, এই লাঠি নাকি বাঙালীর একমাত্র অস্ত্র। ঠিক মত চালাতে পারলে, লাঠি বন্দুকের গুলীও নাকি আট্‌কে দিতে পারে।

ইদানিং সে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ বইখানি পড়েছে। এই বই পড়ে তার মনে অনেক কিছু কল্পনা জাগে।

গ্রাম দেশের ছেলে সে। কিন্তু দূর থেকে অনেক রকম খবর তাদের পল্লী-গ্রামে এসে পৌছায়।

একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নাকি হিমালয়ের গুহার অন্ধকারে সবাইকার চোখের আড়ালে নীরবে তপস্যা করছে। তারা যখন সাধনার সিদ্ধিলাভ করে বেরিয়ে আসবে—তখন তাদের দুর্বার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। ভারতবর্ষের বুক থেকে ওরা নাকি লাল বাঁদরদের একেবারে দূর করে দেবে। তখন দেশ স্বাধীন হবে—এই আশায় নেতারা দিন গুনছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে কেন্দ্র করে বিষাণ খুড়োর মুখেও অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা শোনা যায়। কোথায় কোন্ গভীর অরণ্যের অন্তরালে 'ভবানী-মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে বাংলার যুবক সম্প্রদায় সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবে। তাদের তরবারী সূর্যকিরণে ঝল্‌সে উঠবে। এই সব ব্রহ্মচারী মায়ের সন্তানদল ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্যে আত্মবিসর্জন দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। এই সব সন্তানদল গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে গঞ্জে-হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়বে। দেশের যুবক সম্প্রদায়কে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দান করবে।

এই সব কাহিনী শুনতে শুনতে চন্দনের মনে শিহরণ জাগত। তাদের অঞ্চলে কোন সন্তান এগিয়ে আসবে না? তাদেরকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষা দেবে না?

আবার কিছুদিন পর-সংবাদ ভেসে আসে কোন গোপন কেন্দ্র থেকে :

অরবিন্দ ঘোষ বরদা থেকে বিরাট চাকরি ছেড়ে দিয়ে বঙ্গদেশে চলে আসছেন জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র এক গোপন সমিতি গড়ে তুলেছেন। দলে দলে যুব সম্প্রদায় সেখানে সব রকম শিক্ষালাভ করছে। ঢাকায় পুলিন দাস শত শত তরুণকে দীক্ষা দিয়ে এক বিরাট লাঠিয়াল দল গঠন করেছেন।

আবার জানা গেল—এক বিরাটদেহী পাঞ্জাবী—ইয়া লম্বা তার দাড়ি—সারা দেশে নৌকা চালিয়ে স্বদেশী ডাকাতি করে হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ করছে। কেউ বলছে তার নাম 'মহারাজ' কেউ বলছে 'কালিচরণ' কেউ বলছে 'বিরজা'। তাকে নাকি কেউ চোখে দেখেনি। বিরাট তার বাহিনী। জমিদার আর ব্যবসায়ীদের বাড়ী ডাকাতি করতে গিয়ে লাফ দিয়ে দোতলায় উঠে যায়—কেউ তার গতি রোধ করতে পারে না। পুলিশ তার খোঁজ নিতে গিয়ে একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

এই হাজার হাজার টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করা হবে। তারপর সবাই মিলে মাতৃভূমির বুক থেকে লাল বাঁদরদের তাড়িয়ে দেয়া হবে।

চন্দন এই সব কাহিনী শোনে আর রাত্তিরে তার দু'চোখে ঘুম আসে না। সে কি এই ভবানী-মন্দিরের সন্ন্যাসী-দলে গোপনে যোগদান করতে পারে না?

কে তাকে হদিশ বলে দেবে?

সে যদি কোনো রকমে গভীর অরণ্যের 'ভবানী মন্দিরের' সন্ধান পেত,—তা হলে কাউকে কিছু না জানিয়ে ঠিক বাড়ী থেকে পালিয়ে যেত।

কিন্তু কিশোর চন্দন কোনো পথের সন্ধানই খুঁজে পায় না।

চন্দন মৌলভী সায়েবের সাকরেদ হয়ে লাঠি-খেলায় ইতিমধ্যে খুব ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। মৌলভী সায়েব ওকে পিঠ চাপড়ে ঘন ঘন 'সাবাস্' ধ্বনি দিয়ে উৎসাহিত করে তুলেছেন।

কিছুদিন পরের কথা।

একদিন বিষাণ খুড়ো ওকে চুপি চুপি ডেকে বললেন, কাউকে বলিস নি যেন। আজ গভীর রাত্রে তোকে আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।

চন্দন আস্তে আস্তে উত্তর দিলে, গভীর রাত্রে? কিন্তু মা ত' যেতে দেবে না।

বিষাণ খুড়ো ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্‌লে, দূর বোকা ছেলে, সবাইকে

জানিয়ে যাবো নাকি? বাড়ী শুদ্ধ সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়বে,—তখন আমরা চুপি চুপি পা টিপে বেরিয়ে পড়বো। খবরদার, কাউকে বলিস নি যেন!

চন্দনের মনে দারুণ কৌতূহল। জিজ্ঞেস করলে, আজ রাত্রে কি বিষাণ খুড়ো?

বিষাণ খুড়ো শুধু মুখটিপে হেসে বললে, জানিস না বুঝি? আজ অমাবস্যা? আজ কিছু খাবি নে। উপোস করে থাকবি, বুঝলি?

এর বেশী বিষাণ খুড়োর মুখ থেকে আর কিছু বের করা গেল না।

গভীর রাত।

সারা পৃথিবীর মানুষ বুঝি ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

বিষাণ খুড়ো চন্দনের হাত ধরে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটছে ত' হাঁটছেই। পথ বুঝি আর শেষ হয় না।

অবশেষে নদীর ধারে একটা পোড়ো বাড়ীতে ওরা এসে উপস্থিত হল। ভাঙা জানালার ভেতর দিয়ে ক্ষীণ দীপালোক চোখে পড়ছে। ভেতরে গিয়ে একেবারে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দন।

অমাবস্যার রাত্রে কালী পূজোর আয়োজন করা হয়েছে। শ্মশ্রু-সমন্বিত এক বৃদ্ধ তাকে দেখে মৃদু হাস্য করলেন। বললেন, উপোস করে আছ ত? আজ তোমায় মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেবো। এই বাড়ীর পাশেই একটি পুষ্করিণী আছে, স্নান করে এসো।

মন্ত্রচালিতের মতো চন্দন এগিয়ে যায়।

যথা সময়ে ফিরে এসে দেখে মায়ের মন্দিরে কালী মূর্তির সামনে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। সামনে তামার টাটে রাশি রাশি জবাফুল।

বৃদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মায়ের পায়ে অঞ্জলি দাও—প্রতিজ্ঞা করো—"আমার জীবন দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করলাম। যতদিন ভারত স্বাধীন না হয়, ব্রহ্মচারী ব্রতধারী হয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত থাকব। নেতার আদেশ আজ থেকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।"

চন্দন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেবীর চরণে প্রণত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে। বৃদ্ধ এক হাতে তরবারী, আর এক হাতে 'গীতা' নিয়ে চন্দনের মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেন—জয় যুক্ত হও। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করো—

দূরে বনের অন্তরালে অজানা পাখীর ডাক শোনা যায়।

পাঁচ

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে চন্দন।

আনন্দে আর গর্বে ওর ছোট বুকখানি ভরে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়ত ভবানী-মন্দিরে, যাবার সুযোগ তার হবে।

সেই আশায় বুক বেঁধে সে নিজেকে সকল রকমে প্রস্তুত করছে। আবার দারুণ উৎসাহে মৌলভী সায়েবের কাছ থেকে লাঠি খেলার নতুন নতুন কৌশল শিখে নিচ্ছে।

ওদের অঞ্চলের চারটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। ওরাও দীক্ষা লাভ করেছে একই গুরুর কাছ থেকে।

আবার কিছুদিন পর ওদের কাছে নির্দেশ এলো প্রতি রবিবার তাদের অঞ্চলের বাড়ী বাড়ী থেকে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করতে হবে। সেই মুষ্টিভিক্ষার চাল সারা মাস ধরে একই জায়গায় সংগৃহীত হবে। তারপর সেই জোগাড় করা চাল হাটে বিক্রি করে যে পয়সা পাওয়া যাবে তা জমা দিতে হবে—নির্দিষ্ট এক কর্মীদাদার হাতে। তার কাজ হবে মূলকেন্দ্রে সেই সংগৃহীত অর্থ পৌঁছে দেয়া।

প্রথমে সকলকে বোঝাতে হবে—মুষ্টিভিক্ষা দেশের কাজের জন্যেই সংগ্রহ করা। একটা করে মালসা বা পাত্র থাকবে প্রত্যেকের বাড়ীতে। সাতদিন ধরে বাড়ীর গিন্নী তাতে এক মুঠি করে চাল রেখে দেবেন। সপ্তাহ শেষে ছেলেরা বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে সেই মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে।

অনেক বাড়ী আছে যে ছেলেদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সারা সপ্তাহের চাল একটি পাত্রে রেখে দেয়। সেখান থেকে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করা কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু সব বাড়ীর গিন্নী সমান নয়। অনেকে হাজার রকম প্রশ্ন তোলে। কেন এই মুষ্টিভিক্ষা দিতে হবে? এ করে কি দেশের কাজ হবে? ছেলেরা পড়াশোনা করুক—খেলাধূলা করুক ভালো কথা, আবার এ সব ঘোড়ারোগ কেন? কে তাদের এই সব কাজে নাচাচ্ছে—অনেক বাড়ীর গিন্নী সে কথা জানতে চায়।

আবার এমনও দেখা গেছে যে, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করতে গিয়ে নতুন নতুন ছেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। তারাও উৎসাহিত হয়ে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে দিয়েছে।

তাদের মধ্যে অনেকে আরো এগিয়ে আসছে।

লাঠি খেলার আসরে এসে যোগদান করেছে।

তাদের ভেতর নতুন-নতুন বইয়ের আদান-প্রদান চলেছে।

এইভাবে স্বাধীনতার সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নানা পল্লীতে সমিতির সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

চন্দন এই জাতীয় গঠনের কাজে নতুন উদ্দীপনা লাভ করেছে।

হঠাৎ জানা গেল, ওদের মহকুমায় একটি মেলা বসবে। সাতদিন ধরে এই মেলা চলবে। নানা অঞ্চলের লোক এসে স্টল খুলবে। তাদের হাতের তৈরী কাজের প্রদর্শনী হবে। যাদের হাতের কাজ সেরা বলে বিবেচিত হবে—মেলার কর্তৃপক্ষ তাদের পুরস্কার দেবেন।

এ ছাড়া কয়দিন ধরে যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক, বানরের খেলা, সাপ নাচানো—কত কি মজাদার ব্যাপার হবে।

এই সব কথা জানতে পেরে ছেলেমহলে হুল্লোড় পড়ে গেল। অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্যে নাম লেখালে। মেলার পক্ষ থেকে তাদের জামায় ব্যাজ লাগিয়ে দেয়া হবে। মেলায় ঢুকতে তাদের আর পয়সা লাগবে না।

চন্দনদের দলের কয়েকটি ছেলে ভাবছে,—তারা এই মেলায় কি কাজ করবে। তাদের সমিতির পক্ষ থেকে এখনও কোনো নির্দেশ আসে নি।

কিন্তু এত বড় মেলা হবে তাদের মহকুমায়,—গ্রাম, গঞ্জ থেকে হাজার হাজার লোক আসবেন এই মেলায় যোগ দিতে, কেউ সওদা নিয়ে, কেউ সওদা করতে; কেউ বা শুধু শুধু মজা দেখতে। তার ভেতর ওদের কি কোনো কাজ নেই।

হ্যাঁ, এই মেলাতে তাদেরও কাজ আছে।

সমিতির মূলকেন্দ্র থেকে নির্দেশ এলো—এই মেলাতে ঘুরতে ঘুরতে তাদের গোপনে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল বিলি করতে হবে। দেশের কাজে সকলেরই যে কিছু কিছু দায়িত্ব আছে, সেই কথা ছাপা থাকবে এইসব হ্যাণ্ডবিলে। বিলি করতে হবে—চাষী ভাইদের হাতে হাতে, দোকানদারদের কাছে, বড় বড় ব্যাপারীদের নৌকোয়, যাত্রা, থিয়েটরের দলে, আর মহাজনদের গদীতে। সবাইকে নিয়ে দেশের কাজ। সকলকে সচেতন করতে হবে। দেশ স্বাধীন করবার ব্রত এর ভেতর দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে। ওরা জাগুক,

ওরা বুঝুক যে, দেশ শুধু কয়েকজন ধনী ব্যক্তির নয়, দেশ চাষী, মজুর, কামার, ছুতোর, দোকানী, ব্যাপারী, মহাজন—সবাইকার। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

ওরা অনেক সময় নদীর ধারে বসে সবাই গলা মিলিয়ে গান গায়—

"আমি ভয় করবো না—
দু'বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না!
শক্ত যা তাই সাধতে হবে
মাথা তুলে রইবো ভবে—
বিপদ যদি এসে পড়ে—ঘরের কোণে সরবো না।"

জেলার লালমুখো সায়েব ম্যাজিস্ট্রেট এসে মেলার উদ্বোধন করে গেল। কী সমারোহ—কী বাজনা বাদ্যি!

ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা ম্যাজিস্ট্রেটের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে। কত নিমন্ত্রিত মোটা মোটা মানুষেরা ইংরেজীতে বক্তৃতা করলে। ব্যাণ্ড বাজাতে লাগলো।

পুলিশের দল লাঠি হাতে শান্তি রক্ষা করতে লাগল।

তারপর "গড্ সেভ্ দি কিং" গান দিয়ে সেই উদ্বোধন উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটল।

দেশের কথা,—সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা-অভাব-অভিযোগের কথা কিন্তু কেউ বললে না।

চন্দন ভাবলে, এ আবার কেমন মেলা,—যেখানে দেশের কথা কেউ বললে না।

শুধু ইংরেজীতে বক্তৃতার তুবড়ি ছোটে!

ওরা মন-মরা হয়ে ঘরে ফিরে এলো।

তিন দিনের দিন।

চন্দনের কাছে এলো কাজ।

সেই ছাপানো গোপন পত্রিকা।

সমিতি থেকে নির্দেশ এসেছে, এই গোপন-পত্র মেলার ভীড়ে মিশে সবাইকার হাতে হাতে বিলি করতে হবে।

কাজের মতো কাজ পেয়ে চন্দনের দল ভারি খুশি। যে কাজে আনন্দ

আছে, উত্তেজনা আছে আর আছে দেশের কথা—সেই দায়িত্ব পালনেই ত' জাগে উল্লাস।

ছাপানো গোপন পত্রিকা হাতে নিয়ে চন্দনের দল বেড়াতে বেড়াতে ঢুকে গেল ভীড়ের মধ্যে।

পত্র বিলির কাজ ছেলেদের দৌলতে বেশ সুন্দরভাবেই সমাধা হল।

কিন্তু উত্তেজনা জাগল—পরদিন থানার বাবুদের দিক থেকে—কারা এই আপত্তিজনক হ্যাণ্ডবিল ছড়াল মেলার মাঝখানে? চন্দনের বাবার আস্ফালনই সব চাইতে বেশী।

তাঁর অঞ্চলে এই সব রাজদ্রোহের কাজ—চন্দনের বাবা বাড়ী ফিরে মহা হম্বি-তম্বি সুরু করে দিলে। শয়তানদের ধরতে পারলে—তাদের প্রাণ বাঁচা দায় হয়ে উঠবে।

বিষাণ খুড়ো চন্দনকে চুপি চুপি ডেকে বললে, সাবধান, এই বাড়ীতে কোনো হ্যাণ্ডবিল যেন না থাকে। আর কিছুতেই মুখ খুলবি নে। জানিস ত' বোবার শত্রু নেই।

চন্দন উত্তর দিলে, তা ত' বুঝলাম। কিন্তু সবাই যে পরামর্শ দিলে, এই বাড়ীতে ছাপানো হ্যাণ্ডবিলগুলো লুকিয়ে রাখলে—ভয়ের কোনো কারণ নেই। এ বাড়ীতে ত' আর পুলিশ তল্লাসি করতে আসবে না।

চন্দনের কথা শুনে বিষাণ খুড়োর মুখে হাসি ফুটে উঠল।—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস তুই। প্রদীপের নীচেই সব চাইতে বেশী অন্ধকার। এখানে কেউ হাতড়াতে আসবে না।

একদিকে মেলা জমে উঠল, আর একদিকে পুলিশ মহলে উত্তেজনা বেড়ে উঠতে লাগলো।

লালমুখো ম্যাজিস্ট্রেট যেখানে মেলার উদ্বোধন করে গেছে—সেইখানে গোপনে গোপনে বে-আইনী কাজ চলছে! এ যে একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

এই দুষ্কর্ম যারা করেছে—সেই শয়তানদের খুঁজে বের করতেই হবে।

সাদা পোষাক পরে পুলিশবাহিনী জনসাধারণের সঙ্গে মিশে হন্যে কুকুরের মতো অপরাধীদের খুঁজে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু ছেলের দল আরো বেশী চালাক। ওরা যদি ফেরে ডালে-ডালে,—

এরা চলে পাতায় পাতায়। হ্যাণ্ডবিল বিলির কাজ সমভাবেই চলতে লাগল, কিন্তু অবাক্ কাণ্ড—কেউ ধরা পড়ল না।

তখন থানার দারোগার আদেশ পেয়ে পুলিশদল বাড়ী বাড়ী খানাতল্লাসী চালাতে লাগলো।

ইস্কুলের ছাত্রদের ওপরই আক্রোশটা বেশী। মেলার কাছাকাছি যত বাড়ী ছিল পুলিশ বাহিনী সব একেবারে তচনচ করে তুললে।

কিন্তু ওরা প্রকৃত অপরাধীদের কোনো হদিশই পেলো না।

শয়তানরা কি সত্যি কর্পূরের মতো উবে গেল!

ছয়

একেবারে আচমকা ঘটনাটা ঘটে গেল।

পুলিশের খানাতল্লাসীর ফলে একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল সখারাম গণেশ দেউস্করের লেখা—"দেশের কথা।"

বইখানা যে নিষিদ্ধ সেকথা কেউ জানে না।

থানার একজন অফিসার যেন গুপ্তধন খুঁজে পেলে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এ বই কোথা থেকে এলো? কে এ বইয়ের মালিক?

চন্দনের সহপাঠীর বাড়ী এটা।

সে এগিয়ে এসে বললে, কেন, কি হয়েছে? এ বই ত' চন্দনের। আমায় পড়তে দিয়েছে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বইয়ের মলাট খুলে দেখা গেল—ভেতরে চন্দনের নাম লেখা।



থানার লোক বললে, সে সব কথা শুনছি নে। সরকারের নিষিদ্ধ বই। যার কাছে পাওয়া গেছে—তাকেই আমি থানায় ধরে নিয়ে যাবো।

—বারে! এ কি রকম আবদায়। থানার দারোগার ছেলের বই। যদি ধরতে হয় তাকে গিয়ে গ্রেপ্তার কর। মিছিমিছি কেন আমাদের ছেলেকে টানাটানি করছ?

—সে দারোগাবাবু বুঝবে। নিষিদ্ধ বই যার কাছে পেয়েছি তাকেই ধরে নিয়ে যাবো। বিচারে সাজা হবে—কি খালাস হবে, সে কথা আমি জানি না। রাজদ্রোহের কাজ করলে থানায় যেতেই হবে।

ইতিমধ্যে চন্দনের কাছে খবর পৌঁছে গেছে।

"দেশের কথা" নিষিদ্ধ বই—একথা ওরা কেউ জানত না।

কিন্তু বে-আইনী কাজ করে আর ত ঘরে ফেরা চলে না! তার ওপর—একেবারে খোদ দারোগাবাবুর বাড়ী।

মুহূর্তের মধ্যে চন্দন তার কর্তব্য স্থির করে ফেললে।

সে সোজা মৌলভী সায়েবের বাড়ী গিয়ে হাজির হল।

সে যে এখানে লুকিয়ে থাকবে—সে কথা কেউ ভাবতেই পারবে না।

মৌলভী সায়েব বললে, ঠিক আছে। তুই এখানে লুকিয়ে থাক ত! তারপর আমি দেখছি—তোকে রাতারাতি কোথায় চালান করে দেয়া যায়। এখানকার হাওয়া বড় গরম হয়ে উঠেছে। এখন দিনকয়েক গা ঢাকা দিয়ে থাকা ভালো।

সমিতির মূলকেন্দ্র থেকে একজন বিশিষ্ট কর্মী এই অঞ্চলের সংগঠন-কাজ পরিদর্শন করতে এসেছিল। সে চন্দনের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে বললে, মৌলভী সায়েব, আমি এই চট্‌পটে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যাই। চালাক-চতুর বুদ্ধিমান ছেলের একান্ত অভাব। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে ও অনেক কাজ করতে পারবে।

চন্দনও এ কথায় রাজি।

গোপন হ্যাণ্ডবিল বিলি করার পর থেকে—ও এতটুকু সোয়াস্তি পাচ্ছে না। কাজের চাইতে অকাজ বেশী। সব সময় ভয়ে-ভয়ে পথ চলতে হয়। ও চায় সত্যিকারের কাজ, জীবনে সত্যিকারের উত্তেজনা। ও বুঝতে চায়—আমি এমন কিছু কাজ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি যাতে স্বাধীনতার সংগ্রাম—অগ্রগতির পথে চলেছে। সারা দেশ জুড়ে এখন কত কর্মী, কত বিপ্লবী, কত গোপন পথে তারা এগিয়ে চলেছে। সেই দুঃসাহসীদের চলন্ত মিছিলে সে অংশগ্রহণ করতে চায়। রবিঠাকুরের কবিতা সে আপনমনে আবৃত্তি করে—

"ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে—
নহে সন্ধ্যার দীপালোক—
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ—

… … …

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল সর্পগূঢ় ফণা।
নিন্দা দেবে জয় শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

চন্দনের সম্মতি পেয়ে কেন্দ্রের কর্মী মৃত্যুঞ্জয়দা সত্যি খুশি হলেন।—এই রকম বুদ্ধিমান আর তড়িৎগতি কিশোরই ত' আমাদের কামনা। যে কাজ বয়স্করা পারে না, কিশোরেরা সেই কাজে সাফল্য লাভ করে।

রাত গভীর হলে চন্দন মৌলভী সায়েবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়দার সঙ্গে অজানা পথে পাড়ি জমালো।

যাবার আগে মৌলভী সায়েবের পায়ের ধুলো নিয়ে চন্দন বললে, এখন বাড়ী যাওয়ায় বিপদ আছে। বিষাণ খুড়োকে আপনি সব বুঝিয়ে বলবেন। আশীর্বাদ করুন আপনার শিক্ষা যেন সার্থক হয়।

মৌলভী সায়েব হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, দোয়া ত' তোকে দিন-রাত্তিরই করছি। খোদার নাম করছি। ভয়-ডর কিছু নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরে সোজা পথে চলে যা—! মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে গিয়ে মৃত্যুকে জয় কর্—

নিশীথ রাত।

কর্মক্লান্ত সারা অঞ্চলটা যেন ঘুমিয়ে আছে।

দূরের বনে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে।

একটা নিশাচর পাখী মাথার উপর দিয়ে কর্কশকণ্ঠে ডাকতে ডাকতে চলে গেল।

চন্দন একবার আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। শুধু কালপুরুষ নীরব প্রহরীর মতো মাথার ওপর থেকে সব কিছু তাকিয়ে দেখছে।

চন্দনের শুধু মায়ের মুখখানি মনে পড়তে লাগল। তারপর নিজের মা আর ভারতমাতা একাকার হয়ে তার মনের আকাশে ধ্রুবতারার মত জ্বলতে লাগল।

ওদের দু'জনের কারো মুখে কোনো কথা নাই। শুধু মৃত্যুঞ্জয়দার হাতে চন্দনের একটি হাতের মুঠি শক্ত করে ধরা।

মেলার কোলাহল অনেকক্ষণ থেমে গেছে। সেখানেও বুঝি সবাই গাছের তলে, তাবুর ভেতর আর খালের ধারে যে যেখানে পারে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

ওরা লোকালয়ের অঞ্চল ছেড়ে নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হল।

আশে-পাশে ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকির দল হাজার প্রদীপ জ্বালাচ্ছে, আবার নিভিয়ে ফেলছে।

ওরা তুজনে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো নদীর ধারে।

সেখানে একটি নৌকায় টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছিল।

মৃত্যুঞ্জয়দা হাঁক দিলে—কে জাগে?

নৌকোর ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল—ছায়েদ আলি—

মৃত্যুঞ্জয়দা আবার হাঁক দিলেন, ভাড়া যাবে মিঞা?

—যামু গো-যামু। তবে রাতের সোয়ার, বেশী পয়সা ছাওন লাগ্‌বো। পথে চোর-ডাকাতের বড় ভয়।

মৃত্যুঞ্জয়দা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, আচ্ছা মিঞা, তাই হবে। তবে আমাদের কাছ থেকে নেবে কি? আমরা তুই প্রাণী, একেবারে খালি হাত-পা।

—আইসো গো—আইসো! ছয়েদ আলি উৎফুল্ল কণ্ঠে উত্তর দেয়।—তা এ পোলারে পাইলা কনে? চুরি কইর‍্যা আন নাই ত?

—আরে না না, চুরি করে আনবো কেন? এ বৃটিশ রাজত্ব, চুরি করলে সাজা হবে না? পুলিশ আমারে ছাড়বে নাকি?

ছায়েদ আলি ছৈয়ের নীচে দিলখোলা হাসি হাসে।

—তোমরা বুঝি পুলিশ রে বড় ডরাও? শুইনতেও মজা লাগে।

মৃত্যুঞ্জয়দার হাত ধরে চন্দন গিয়ে নৌকোর উপর ওঠে।

ওর বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, ছায়েদ আলি—ওদেরই দলের লোক। একজন সত্যিকারের বিপ্লবী। নইলে গভীর রাতে এমন করে রসিকতা করে। চন্দন আরো বুঝতে পারে—মৃত্যুঞ্জয়দার পথ চেয়েই ছায়েদ আলি পিদিম জ্বালিয়ে বসেছিল। নইলে এই নিশুতি রাতে না ঘুমিয়ে কেউ নৌকার পাটাতনের ওপর বসে প্রহর গণে?

বিপ্লবীদের জীবনযাত্রাই একেবারে আলাদা ধরনের, চন্দন মনে মনে বিপ্লবী সাথীদের প্রণাম জানায়। নিঃশব্দে নৌকা ভেসে চলে।

মৃত্যুঞ্জয়দা বললে, চন্দন, তুই কাঠের পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়তে পারবি নে?

চন্দন উত্তর দেয়, কেন পারবো না? কিন্তু তুমি কি করবে?

মৃত্যুঞ্জয়দা বললে, আমায় বসে থাকতে হবে রে। আর এক ঘাট থেকে আমাদের একজন সাথী উঠবে।

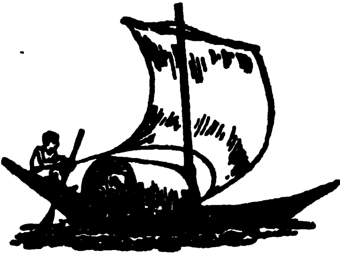
বৈঠার ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা যায়।

ছায়েদ আলি আর কোনো কথা বলে না। তখন সে নিজের কাজে লেগেছে। হাতের হুঁকোটা মৃত্যুঞ্জয়দার হাতে তুলে দিয়ে কখনো হাল ধরে, কখনো বাদাম খাটায়, আবার ছুটে গিয়ে দাঁড় টানে।

মৃত্যুঞ্জয়দা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানে।

চন্দন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নদীর দিব্যি ঠাণ্ডা বাতাস। কিন্তু চন্দনের ঘুম পায় না। ওই যে কালো আকাশের বুকে রাশি রাশি তারা ফুটে আছে—ওদের দিকেই সে তাকিয়ে থাকে।



কালপুরুষ হেলে পড়েছে। আধ-খাওয়া বাঁকা চাঁদ কোনো রকমে আকাশের পথে পাড়ি জমাচ্ছে। একদল অজানা পাখী কি বাদামটার দড়ির ওপর এসে আশ্রয় নিল? নৌকোর এক দিক্‌টা পারের অতি কাছে। ঘন ঝোপ-জঙ্গল-তাল-নারকেল-সুপুরী গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। অজস্র জোনাকি জ্বলছে। নদীর অপর পার চোখে পড়ে না। ঘন কালো আঁধার—সেখানে এতটুকু আলোর রেখা খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই।

হঠাৎ চন্দনের মায়ের কথা মনে হল। তার মায়ের চোখেও কি ঘুম নেই? মাও কি ছেলের জন্য নিদ্রাহারা? তার মা-ও কি ছেলের জন্যে রাত জেগে অনাহারে বসে আছেন?

এতক্ষণ বাদে চন্দনের দু' গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

সাত

আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে চন্দন কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ঘ—স্ করে একটা শব্দ শুনে সেই ঘুম ভেঙে গেল।

এক অন্ধকার পারে নৌকো লাগল।

লণ্ঠন হাতে একটি লোক নীরবে এসে নৌকোয় উঠল।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। নৌকো আবার নদী পথে এগিয়ে চলল।

ভোর হবার বোধ করি আর বেশী বাকি নেই। পূবের আকাশটায় খানিকটা লাল রঙের আমেজ লেগেছে। অনেকগুলি পাখী কিচ্ কিচ্ শব্দ

করতে করতে ওদের নৌকোটায় বাদামের দড়ির ওপর এসে বসল। ওরা ডাকাডাকি করে জানিয়ে দিল, প্রভাতের আর দেরি নেই।

এইবার নৌকো একটি খালের ভেতর ঢুকল।

বেশ কিছুটা লগি ঠেলে যাবার পর—একটা কাঠের দোতলা বাড়ী, একটি হিজল গাছের ডালের সঙ্গে নৌকো বাঁধা হল।

মৃত্যুঞ্জয়দা ওকে ইসারা করলে।

ছুজনে নৌকো ছেড়ে মাটিতে পা দিলে।

নিঃশব্দে সেই দোতলা কাঠের বাড়ীর পেছন দিকে এসে হাজির হল ছু'জনে। কাঠের দরজায় একটু শব্দ করতেই কপাট খুলে গেল। আধ-বয়সা এক ভদ্রলোক। ফরসা রঙ—মাথায় লম্বা লম্বা চুল। বেশ মজবুত শরীর। গায়ে একটি সাদা ফতুয়া।

মৃত্যুঞ্জয়দা বললে, পশুপতিদা, এই ছেলেটিকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। চন্দন স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান, তুমি একে সব রকমে গড়ে তোলো। আমাদের চলার পথে অনেক কাজ করতে পারবে। আর ভালো কথা, সেই থলেটা তৈরী আছে ত? আমার হাতে দাও। আমি আর অপেক্ষা করবো না। এক্ষুণি ওটা নিয়ে রওনা হতে হবে।

পশুপতিদা একটা থলে এনে মৃত্যুঞ্জয়দার হাতে দিলে। ছু'জনের মধ্যে আর কোনো কথা হল না।

মৃত্যুঞ্জয়দা নীরবে আবার নৌকোর দিকে ফিরে গেল। পশুপতিদা চন্দনের দিকে তাকিয়ে বলল, আয় চন্দন ভেতরে আয়—

চন্দন পশুপতিদার পেছন-পেছন কাঠের বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল।

ততক্ষণে বেশ ফরসা হয়ে গেছে।

দোতলার কাঠের একটি ঘরে এসে পশুপতিদা বললে, এই ঘরে তুই থাকবি চন্দন।

যেন এইখানে আসবার সমস্ত কথা আগে থেকেই ঠিক ছিল। চন্দন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলে, সূর্য ওঠবার আর বেশী বাকি নেই! একদিকে বিরাট বন। সেখানে পাখ-পাখালীর ভিড় জমেছে। যে খাল বেয়ে ওদের নৌকো এলো,—সে খালটাকেও দেখা যাচ্ছে। খালের বুকে ছোট ছোট নৌকো। পারের কাছে রাখাল ছেলেরা খালের বুকে ঝাঁপুড়ি খেলছে।

এই ভোরে গাঁয়ের বৌরা ঘোমটা টেনে মাটির কলসী নিয়ে খাল থেকে জল নিতে এসেছে।

একটা বাঁশের সাঁকো দেখা যাচ্ছে। তারই ওপর দিয়ে লোকজন খাল পেরিয়ে এধার-ওধার যাতায়াত করছে।

পশুপতিদা জিজ্ঞেস করলে, রাত্তিরে খাওয়া হয় নি বুঝি? এক কাজ কর। খালের জলে স্নান করে নে। তারপর গরম গরম দুধ খাবি। আমার গাই আছে। দুধের অভাব নেই।

আল্‌নার ওপর কয়েকটা ধুতি ছিল। আঙুল দিয়ে পশুপতিদা তাই দেখিয়ে দিলে। একটা ছোট গামছা ঝুলছে দড়িতে। পশুপতিদা চোখের ইসারায় সেটাও নিতে বললে। তারপর নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার চন্দন কাঠের ঘরটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে। ছোট ঘর। এক পাশে একটি তক্তপোশ পাতা। আলনায় কয়েকটি ধুতি আর ফতুয়া রয়েছে। এককোণে কাঠের টুলের ওপর একটি কুঁজো। কুঁজোর মুখে একটি গেলাস। আর এক পাশে একটি কাঠের র‍্যাক। তাতে অনেকগুলি বই সাজানো আছে। ঘরের দেয়ালে স্বামী বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের ছবি। একটি ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, তাতে ইংরেজী আর বাংলা তারিখ এক সঙ্গে।

ঘরটা ছিম্‌ছাম করে সাজানো, আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘরের মেঝেও কাঠের পাটাতনের তৈরী।

চন্দন ধুতি আর গামছা নিয়ে নীচে নেমে গেল। পশুপতিদা বললে, তাকের ওপর শিশিতে সরষের তেল আছে। মাথায় একটু মেখে নে।

সবদিকে পশুপতিদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

চন্দন বাড়ীটাতে আর কাউকে দেখতে পেলে না। না কোনো মহিলা, না তার বয়সী কোনো কিশোর। ভাবলে, একা একা এখানে সময় কাটবে কি করে।

বেশ ভালো করে স্নান শেষে এক গেলাস গরম দুধ খেলে চন্দন। দোতলার ঘরে ফিরে এসে দেখলে, ওখানে একটি ভারতমাতার ছবি রয়েছে। আগে ত' এ ছবিখানা এ ঘরে দেখে নি চন্দন। নিশ্চয়ই পশুপতিদা এনে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

ভারতমাতার ছবিটির দুই পাশে সুগন্ধী ধূপ জ্বলছে।

চন্দন খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ভারতমাতার ছবিখানির সামনে।

মাথার ওপরে উঁচু হিমালয়ের শৃঙ্গ, আর পায়ের তলায় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। বেশ সুন্দর করে আঁকা হয়েছে ছবিখানা।

আরো খানিকক্ষণ পরে উঠে চন্দন র‍্যাকের বইগুলো উল্‌টে পাল্‌টে দেখতে লাগলো। নানা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দের খানকয়েক বই, রবীন্দ্রনাথের একটি স্বদেশী গানের খাতা, অশ্বিনী দত্তের দুখানি গ্রন্থ। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা'—এখানেও রয়েছে। আর রয়েছে—কতকগুলি মোটা মোটা ইংরেজী গ্রন্থ। স্বদেশী কবিতার একটি সঙ্কলন বইও রয়েছে র‍্যাকে।

চন্দন মনে মনে ভাবলে' এখানে থাকলে আর নিজেকে নিঃসঙ্গ কিছুতেই মনে হবে না। বই পড়েই সময় কাটানো যাবে।

খানিক বাদে পশুপতিদা ঘরে ঢুকে বললে, নিজেকে যদি শ্রান্ত বলে মনে হয়, তাহলে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পার। নিশ্চয়ই রাতে ভালো ঘুম হয় নি।

চন্দন উত্তর দিলে, না—না, নৌকোর পাটাতনের ওপর দিব্যি ঘুমিয়েছি। তা ছাড়া নদীর ঝিরঝিরে হাওয়া বেশ সুন্দর লাগছিল।

তারপর একটু থেমে বললে, এখানে অনেক বই আছে? আমি নিয়ে পড়তে পারি?

পশুপতিদা খুশি হয়ে জবাব দিলে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। পড় না যত ইচ্ছে। দিনকয়েক আগে এখানে আর একটি ছেলে ছিল। সে ত' একেবারে বইয়ের পোকা। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিন-রাত বই পড়তো। হঠাৎ অন্য একটা কাজে দূরে চলে গেছে।

কি কাজ—পশুপতিদা-ও বললে না, চন্দনও কিছু জিজ্ঞেস করল না।

প্রায় সারা দুপুর ওর বই পড়েই কেটে গেল। ভেবেছিল খানিকটা ঘুমিয়ে নেবে। কিন্তু ঘুম আদৌ আসে নি। অনেক কথা মনের কোণে ভিড় করে আসছিল—বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে। ওকে না দেখতে পেয়ে ওর মা কি খুব কান্নাকাটি করছেন? বাবা নিশ্চয়ই রাগে ফুলছে। আর সারা বাড়ীময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা বিষাণ খুড়ো কি করছে এখন। তার কাছে আরো যে সব বই ছিল,—সেগুলো কি লুকিয়ে ফেলছে? বাবা একবার ঘরে ঢুকে হুমকি দিতে পারে! গুণধর ছেলের কাণ্ড কি একবার

দেখতে চাইবে না? ওদের ঘরটায় বাবা কখনো ঢোকে না। কিন্তু এবার বোধকরি দারোগার দৃষ্টি নিয়ে সারজমিনে তদন্ত করতে আসবে। শেষ পর্যন্ত বিষাণ খুড়োরই বিপদ!

না পারবে কিছু বলতে, আর না পারবে সবকিছু গোপন করে চুপচাপ থাকতে। এইবার তাকে সত্যিকারের পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হবে।

বেশ বেলাতে খাবার ডাক পড়ল নীচে।

এতক্ষণ পশুপতিদা কি করছিল—ও ঠিক জানে না। নীচে নেমে দেখল, আরো কয়েকটি ছেলে কাঠের পিঁড়ি পেতে খেতে বসে গেছে। পশুপতিদার ইঙ্গিতে সেও একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে ওদের সঙ্গে খেতে বসে গেল।

ওরা কি তার মতোই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে? চন্দন ঠিক বুঝতে পারলে না। ওদের মুখের দিকে বারে বারে তাকাতে লাগল। বয়স কারো বেশী নয়। যুবক আর কিশোর বলা চলে।

খাওয়ার ব্যবস্থা একেবারে বাহুল্য-বর্জিত।

নদীর টাট্‌কা মাছের ঝোল, আর পাতলা মুসুরীর ডাল। খেতে কিন্তু চমৎকার লাগছিল। চন্দনের খিদেও পেয়েছিল খুব। গরম ভাতের সঙ্গে টাট্‌কা মাছের ঝোল, আর পেঁয়াজ দেয়া মুসুরীর ডাল—একেবারে অমৃত।

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে পশুপতিদা বললে, তোমরা যে যার ঘরে খানিকটা বিশ্রাম করে নাও—তারপর কাজের কথা আছে।

কাজের কথায় সবাই পরস্পরের দিকে তাকাল।

তারপর যে যার নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম করবার জন্যে চলে গেল।

সন্ধ্যের মুখে আবার পশুপতিদার ঘরে সকলের ডাক পড়ল। আগে প্রত্যেকের হাতে হাতে এক গ্লাস করে খাঁটি দুধ দেয়া হল।

পশুপতিদা হঠাৎ সকলের মুখের ওপর দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখ দুটি বুলিয়ে নিয়ে গেল। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলে, তোদের মধ্যে রিভলভার ছুঁড়তে পারে কে?

চন্দন চম্‌কে উঠল। তারপর পশুপতিদার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

আট

পশুপতিদা একটুখানি হেসে বললে, অমন করে অবাক্ হবার কিছু নেই। আমাদের চলার পথ ত' সরল পথ নয়। সবকিছু শিখে রাখতে হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কখন কোন্ বিষয়টা কাজে লাগে—কেউ কি আগে থাকতে বলতে পারে? তোমরা হচ্ছ আমাদের তরুণ সংগ্রামী দল, আর এখন তোমাদের শিক্ষার সময়। কঠোর পরিশ্রম করে সবকিছু শিখে রাখবে। তোমাদের দীক্ষার সময় কি প্রতিজ্ঞা করেছ, আশাকরি কেউ ভুলে যাও নি!

তরুণ শিক্ষার্থীর দল নীরবে পশুপতিদার কথা শুনল। মন তাদের সব সময়ই প্রস্তুত। তবু হঠাৎ রিভলভার ছোঁড়ার কথা শুনে ওরা চমকে উঠেছিল।

পশুপতিদা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ভয় পাবার কিছু নেই। আসছে কাল দুপুরবেলা—সব যখন নিঝুম থাকবে,—সেই সময় আমরা সামনের ওই জঙ্গলের ভেতর ঢুকবো। সেখানে নিরিবিলি একটা ফাঁকা জায়গা আছে। সেইখানে বন্দুক ছুঁড়ে লক্ষ্য স্থির করার ভারি সুবিধে। এ অঞ্চলটাই এমন নিরিবিলি যে, কাক-পক্ষীতেও আমাদের গোপন উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারবে না।

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

সন্ধ্যের পর একটা নির্জন ঘরে পশুপতিদা স্বদেশী গানের আসর বসিয়ে দিল। সবাইকে স্বদেশী গান শিখতে হবে। পশুপতিদা যে এমন সুন্দর গান জানে, আর এমন ভরাট তার গলা, চন্দন আগে তা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে নি।

অনেকগুলো গান পশুপতিদা একে একে শুনিয়ে দিল—

—"মিলি সব ভারত সন্তান—একমন এক প্রাণ—"

—"বন্দেমাতরম্—"

—"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এদেশ তোদের নয়—"

—"ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়—"

—"যদি তোর ডাক শুনে না আসে, তবে একলা চল রে—"

—"বঙ্গ আমার জননী আমার—"

ছোট্ট কাঠের ঘরখানি স্বদেশী গানে গমগম্ করতে লাগল। পশুপতিদার ভরাট গলা অক্লান্ত ভাবে গান গেয়ে চলেছে।

পশুপতিদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সকলকেই গান গাইতে হল। গানের পর্ব শেষ হয়ে গেলে এলো গরম মুড়ি আর ছোলা ভাজা।

তাই চিবুতে চিবুতে নানা রকম গল্প চললো।

পশুপতিদা বললে, লাঠিটাও তোমাদের ভালো করে শিখে রাখতে হবে। যারা জানো, তারা রোজ অনুশীলন করে হাত পাকা করে ফেলবে। আর যারা জানো না, তারা চট্‌পট্ শিখে নেবে। আগেই বলেছি, এটা তোমাদের শিক্ষার সময়। কাজেই সময় নষ্ট করা চলবে না। খুব ভোরে উঠে সবাইকে মাটি মেখে কুস্তি করতে হবে। উঠোনের একটা জায়গা মাটি কুপিয়ে নরম করে রাখা আছে। সেখানে সূর্যি ওঠার আগে নিজেদের মধ্যে লড়তে হবে। কুস্তির প্যাঁচগুলো আমি সবাইকে দেখিয়ে দেবো।

রাতে আহারের ব্যবস্থা মোটা রুটি আর ঘন ছোলার ডাল। পরে দুধ।

পশুপতিদা খেতে খেতে বললে, শরীরটাকে শক্ত করা চাই। তবে ত' সব কিছু চট্‌পট্ শিখে নিতে পারবে।

পরদিন খুব ভোর থেকে শুরু হল অনুশীলন পর্ব। কুস্তি করাটা চন্দন ভালো করে জানত না। পশুপতিদার শিক্ষায় ও বিষয়টাকে আয়ত্ত করে নিতে লাগল।

দুপুর বেলাটা সেই রোমাঞ্চকর পর্ব।

চন্দন আগে কখনো কোনো আগ্নেয়াস্ত্র দেখেনি। হাতে ধরে চালানো তো দূরস্থান।

গভীর জঙ্গলের মাঝখানে গিয়ে পশুপতিদা একে একে সবাইকে কলা-কৌশল সব শিখিয়ে দিলে।

আগে যতটা ভয় করা গিয়েছিল—দেখা গেল, শক্ত কিম্বা সাংঘাতিক মোটেই কিছু নয়! মন আর চোখ স্থির করে লক্ষ্য করতে হবে। তারপর লক্ষ্যভেদ। দূরে একটা গাছকে লক্ষ্য করতে হল। গাছের গুঁড়িতে পশুপতিদা চক দিয়ে গোল করে দাগ দিয়ে দিলে। সেইখানে 'এইম্' করতে হবে।

কি ভাবে চোখের সামনে রিভলভার তুলে ধরতে হবে—পশুপতিদা হাত উঁচু করে দেখিয়ে দিলে।

—স্টেডি—গর্জে উঠল পশুপতিদা—চোখ ঠিক রাখো—

—ওয়ান—টু—থ্রি—

চন্দনের হাতের রিভলভার গর্জে উঠল।

প্রথমবার অসাবধানে হাতটা একটু কেঁপে গিয়েছিল। তাই গুলী লক্ষ্যে পৌঁছয় নি।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় চন্দন লক্ষ্যভেদ করলে।

—সাবাস!

পশুপতিদার কণ্ঠে উল্লাসের ধ্বনি,—তোর হবে রে চন্দন। মন শক্ত কর আর চোখ সোজা রাখ। মহাভারতের অর্জুনের লক্ষ্যভেদের সেই কাহিনীটি জানিস্ ত? গুরু দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছ অর্জুন?

—আমি পাখীটিকে দেখতে পাচ্ছি গুরুদেব—

—সমগ্র পাখীটাকেই কি দেখছ?

—না গুরুদেব! আমি পাখীটার মাথাটা শুধু দেখছি—

—তাহলে তীর নিক্ষেপ করো—

অব্যর্থ লক্ষ্যে পাখীর মস্তক বাণবিদ্ধ হয়ে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হল। গুরু দ্রোণ প্রশংসার হাসি হাসলেন।

আজ পশুপতিদার কণ্ঠেও সেই জয়ের উল্লাস। শিষ্য চন্দন একদিনেই লক্ষ্যভেদ করেছে।

সারাদিন ধরে ওদের অনুশীলন সমভাবেই এগিয়ে চললো।

বিকাল বেলা লাঠি খেলার চর্চা। মৌলভী সায়েব চন্দনকে ভালোভাবেই তৈরী করে দিয়েছেন। তাই অনেকের সঙ্গেই ওর লাঠি খেলা জমল ভালো।

সন্ধ্যেয় আগের দিনের মত গানের আসর।

প্রথম সঙ্কোচটা অনেকেরই কেটে গেছে। আজ সবাই পশুপতিদার সঙ্গে গলা মেলালো। পশুপতিদার ছোট্ট ঘরখানি স্বদেশী গানে গম্ গম্ করতে লাগল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে সংগীতের স্থান কতটুকু তা ওরা বুঝতে পারে না। তবু এই গানগুলি একে একে তাদের তরুণ প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করল। মন-প্রাণ স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। গান শেষ হলেও—তার রেশ শেষ হয়ে মিলিয়ে গেল না। সবাইকার কানে আর প্রাণে অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে ওরা পশুপতিদাকে ঘিরে খালের ধারে একটা নির্জন কোণে গিয়ে বসল।

পশুপতিদার কাছে অনেক কথাই জানা গেল।

সারাদেশ জুড়ে সমিতির নানা শাখা গড়ে উঠছে তরুণের দল নানা কেন্দ্রে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করছে—

ওদিকে সায়েবদের অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। নীলকর সায়েবরা দেশের কৃষকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে। তাদের ঘর-দোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। গ্রামের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে। ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়ে গাঁয়ের বৌদের নীলকুঠিতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের ধানের চাষ জোর করে বন্ধ করিয়ে সেই সব উর্বরা জমিতে নীলের চাষ করতে বাধ্য করছে।

ওদিকে জাতীয় নেতারা কাগজে কাগজে দারুণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কিন্তু লাল বাঁদরদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

আবার শোনা গেল—তরুণ দল কোথায় গোপনে বোমা তৈরী করছে।

জাতীয় নেতারা জার্মানী থেকে খুব সঙ্গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করবার চেষ্টা করছে। শীঘ্রই দেবাসুরের সমর সুরু হয়ে যাবে।

এখন দেশের তরুণ মনকে সব রকমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, আর সব সময় চোখ কান খোলা রেখে পথ চলতে হবে।

ক্রমে রাত গভীর হতে চললো।

পশুপতিদা বললেন, আব নয়। এইবার আসর ভেঙে দিতে হচ্ছে। আবার কাল খুব ভোরে উঠে কুস্তি করতে হবে।

নীরবে সবাই উঠে গিয়ে যার যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

নিশুতি রাত। জায়গাটা এমনিতেই নির্জন।

বাইরে জঙ্গলের ভেতর একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যেতে লাগলো। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকতে লাগল বনের ভেতর থেকে। নিশাচর রাতজাগা পাখীর দল মাঝে মাঝে কর্কশ শব্দ করে কারো কারো ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছিল। দূরে নদীর বুকে নৌকোতে দাঁড় বাওয়ার ছপ্ ছপ্ শব্দ।

এমন সময় বোঝা গেল নিঃশব্দে একটি ছোট্ট ডিঙি-নৌকো এসে পশুপতিদার বাড়ীর সামনে ঘস্ করে থেমে গেল। কাঠের দরজায় মৃদু করাঘাত। পশুপতিদা বোধকরি সঙ্কেত বুঝে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। চন্দন জানালা দিয়ে দেখলে, দুটি আহত মানুষকে ধরাধরি করে নীচে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসা হল।

পশুপতিদা বোধকরি ওদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। গরম জল করার নির্দেশ, শিশি বোতলের টুং টাং শব্দ।

চন্দন নীচে নেমে গেল।

নয়

আসল খবরটা জানা গেল পরদিন সকালবেলা।

প্রায় দশ ক্রোশ দূরের এক বিরাট জমিদার বাড়ীতে বিবাহের উৎসব। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী ভর্তি। আলোক-বাত্তি বাজি পোড়ানো, প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন।

নিমন্ত্রিত অতিথিরা যখন বিদায় নিয়েছে—সেই সময় বাড়ীতে পড়ল ডাকাত। এক দীর্ঘদেহী পাঞ্জাবী ডাকাত-দলকে পরিচালনা করছে। ইয়া লম্বা কালো দাড়ি। মাথায় বিরাট পাগড়ি। অনর্গল হুকুমজারি করছে—ইংরেজী আর হিন্দিতে। পাঞ্জাবীর কঠোর আদেশ মেয়েদের গায়ে হাত দেয়া চলবে না। শুধু গায়ের গয়না খুলে দিতে অনুরোধ জানানো হবে।



সবাইকার মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়েছে দুর্ধর্ষ ওই পাঞ্জাবী। একদল প্রাচীর টপ্‌কে এসেছে। একদল মশাল জেলেছে, একদল যন্ত্র দিয়ে সিন্দুক ভেঙেছে। আর একদল সমস্ত অলঙ্কার আর নগদ টাকা সংগ্রহ করে পুঁটলি বেঁধেছে। পাঞ্জাবীর আদেশ শিশু আর মহিলাদের গায়ে হাত দেয়া হবে না। বেশী বাড়াবাড়ি না করলে কারোকে হত্যা করা হবে না।

নিয়ম আর শৃঙ্খলার সঙ্গে গোটা 'অপারেশন' পরিচালনা করেছে ওই দাড়িওয়ালা পাঞ্জাবী।

কাজ সমাধা হয়ে গেলে পাঞ্জাবী সবাইকে দাঁড় করিয়ে দলের লোক গণনা করে নিয়েছে।

তারপর বাঁশী বাজিয়ে দিয়েছে।

যাদের কাছে গয়না আর নগদ টাকার পুঁটলি তারা চলে গেছে নৌকো করে নদী পথে সবার আগে।

আর একদল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে করে উল্টোপথে নৌকো নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে। আর একদল খালি নৌকো নিয়ে চাষা সেজে তামাক খেতে খেতে

নিকটবর্তী গঞ্জের দিকে চলে গেছে। দলের দুটি মানুষ আহত হয়েছিল—তাদের ডিঙি নৌকো করে নিয়ে অসো হয়েছে পশুপতিদার গোপন আশ্রয়ে।

সেইখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ভালো করে তুলতে হবে।

সেবার কাজের ভার পড়ল চন্দনদের ওপর।

রাত্রেই গরম জলে নিমপাতা ভিজিয়ে সেই জলে ক্ষতস্থান ভালো করে ধুয়ে দিয়ে মলম দিয়ে বেঁধে দেয়া হল। পশুপাতিদার কাছে বিপদ-আপদের জন্যে ফার্স্ট-এইড-বক্স রাখা আছে। বহু আহত কর্মীর এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এ ব্যাপারে পশুপতিদার বিশেষ অভিজ্ঞতা আর সুনাম আছে।

চন্দনরা চারজনে মিলে একটা ইউনিট গড়ে নিল। তারাই আহত দুই কর্মীর শুশ্রূষার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করল। ক্ষত স্থান ধুয়ে দেয়া, ওষুধ লাগানো সময়মত চারবেলা লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করা—এই সব প্রয়োজনীয় কাজ নিয়েই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অবশ্য দুপুরবেলা জঙ্গলের ভিতর রিভলবার ছোঁড়ার ক্লাশে সবাইকেই যোগদান করতে হত। ওটা আবশ্যিক পাঠ। তাড়াতাড়ি শিক্ষা করে নেবার নির্দেশ আছে কেন্দ্র থেকে।

এই স্বদেশী ডাকাতি সম্পর্কে ধীরে ধীরে আরও গোপন খবর পাওয়া গেল।

সেই যে দুর্ধর্ষ দাড়িওয়ালা পাঞ্জাবী—তার অধিনায়কতায় প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকে নানা জাতীয় অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করা হবে? এটা অবশ্য গুজব।

ডাকাতির স্থান থেকে পালিয়ে আসবার পথে দলের কিছু লোক যে ঘাসির নৌকোয় চলে যাচ্ছিল—জলপুলিশ দল তাদের চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু তারা একেবারে বোকা-সোকা, গাঁয়ের চাষী লোক। নৌকোতেও আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায়নি। মাল ত' আগেই অন্য পথে পাচার হয়ে গেছে। কাজেই সেই বোকা মানুষগুলোকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া পুলিশের আর কোনো উপায় ছিল না।

পুলিশ অবশ্য সেই দাড়িওয়ালা পাঞ্জাবীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ডাকাতির পর বাঁশী বাজিয়ে সে সবাইকে চলে যেতে আদেশ করে। তারপর আর তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি।

পুলিশের খবরে প্রকাশ, ডাকাতির একদিন পর নৌকোতে এক মাঝিকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। সে খেয়া পারাপার করছিল। তাকে থানায় ধরে

নিয়ে যাওয়া হয়। মাঝিটা একেবারে বোকা-সোকা গাঁয়ের মানুষ। নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাকে সন্দেহের অতীত বলে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মত প্রকাশ করে। মাঝিটার নাম নাকি কালীচরণ। সে জগৎ সংসারের কোনো খবরই নাকি রাখে না। থানার অফিসার তাকে 'উজবুগ' বলে ছেড়ে দিয়েছে।

চন্দন বুঝতে পারে—গভীর রাত্রে পশুপতিদার কাছে নানা জাতীয় লোক ছদ্মবেশে আসে। কাঠের দরজায় নানা রকম সঙ্কেতে আওয়াজ করে। তখন দরজা খুলে যায়। পশুপতিদা তাদের নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। খুব গোপনে কি সব আলাপ-আলোচনা চলে। তারপর আবার তারা চুপিসারে বেরিয়ে আসে। ডিঙি নৌকো নিয়ে নিঃশব্দে নদীর পথে অন্ধকারে মিশে যায়।

পশুপতিদা ওদের শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রায়ই বলে, ওরে তোরা তাড়াতাড়ি সব শিখে নে। দেশের বহু অঞ্চলে তোদের জরুরী কাজ অপেক্ষা করে আছে। আমার ট্রেনিং-এর পালা শেষ হলে তোরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বি। তখন আর তোদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। তখন আবার নতুন তরুণ কর্মীদল আসবে শিক্ষা গ্রহণ করতে। তোদের কথা একেবারে মন থেকে মুছে দেবো আমি।

চন্দন বলে, সে কি কথা বলছ পশুপতিদা—তোমাকে কি আমরা কখনো ভুলতে পারি? জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা তোমায় মনে রাখব।

পশুপতিদা শুধু মিটিমিটি হাসে। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের মতো কে কোথায় ছড়িয়ে পড়বি—কেউ কি তার কোনো হদিশ দিতে পারবে? তরুণ বিপ্লবীর দল শুনে অবাক্ হয়।

অনেক রাত্রে চন্দন স্বপ্ন দেখে—

নদীতে দারুণ ঢেউ উঠেছে। নৌকোতে ও একা। নদীর দুই তীরে গাছ-গাছালি লোকালয় কিছু দেখা যায় না। মাথার ওপর চোখ তুলে দেখে পুঞ্জ-পুঞ্জ কালো মেঘ জমেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাতে ক্ষণেকের তরে বোঝা যাচ্ছে আকাশ কত কালো, বিজলি চমক্ কত চোখ ধাঁধালো। প্রচণ্ড ঝড় এসে পড়েছে! ঝড়ের দাপটে নৌকোটা উথাল-পাথাল করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে নদীর উত্তাল ঢেউয়ে তার ছোট্ট ডিঙি নৌকোখানি একেবারে অতল তলে তলিয়ে যাবে।

শোঁ-শোঁ করে পাগলা হাওয়া বইছে·····কোনো জ্ঞান-গম্যি নেই সেই প্রচণ্ড প্রভঞ্জনের। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই নৌকোর ওপর।

মনে হল চন্দনকে ঝুঁটি ধরে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল একটা নির্জন চরের ওপর। রাশি রাশি রূপোলী বালি উড়ছে সেই শূন্য চরে।

চন্দন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আর ওঠবার শক্তি তার নেই। জীবন এইখানেই বুঝি শেষ হয়ে যায়।

হঠাৎ সেই দারুণ ঝড়ের মধ্যে একটা গান ভেসে এলো—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—
তুই একলা চল রে।"

মনে হল একটা ছোটো নৌকো এসে সেই চরে ভিড়ল। এগিয়ে এলো একটা মানুষ। অবলীলাক্রমে তাকে বুকে তুলে নিল।

বিজলির চমকে এক লহমার জন্যে চন্দনের মনে হল তার উদ্ধারকর্তার মুখটা অনেকটা পশুপতিদার মত। চন্দন অজ্ঞান হয়ে তার বুকে লুটিয়ে পড়ল।

মাঝে মাঝেই এই রকম অদ্ভুত-অদ্ভুত বিপদের স্বপ্ন দেখে চন্দন।

ঘুম যখন ভেঙে যায়, স্বপ্ন টুটে যায়—চন্দন বুঝতে পারে তার সারা গা ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

নাক দিয়ে ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

প্রথমটা মুখ দিয়ে কোনো আর্তনাদও বেরুতে চায় না। মনে হয় কাউকে চীৎকার করে ডাকে সাহায্যের জন্যে। কিন্তু কণ্ঠ তার একেবারে রুদ্ধ।

সে কি কথা বলবার শক্তি হারিয়ে ফেলল।

মনে হয় অনেক দূর থেকে একটা গান ভেসে আসছে। প্রথমটা কথা বোঝা যায় না, শুধু সুরটা ভেসে আসে···তারপর ধীরে ধীরে গানের কথাগুলো বোঝা যায়—

"আমি ভয় করবো না—আমি ভয় করবো না—
দু'বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না।"

ক্রমে চন্দনের উত্তাল হৃদয় শান্ত হয়ে আসে।

সেদিন গভীর রাতে কার হাতের পরশ পেয়ে চন্দনের ঘুম ভেঙে গেল।

—একি পশুপতিদা, তুমি?

—হ্যাঁরে আমি। তোর ডাক এসেছে। এখনি যে উঠতে হবে ভাই—

প্রস্তুত সৈনিকের মতো চন্দন তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে।

—কোথায় যেতে হবে পশুপতিদা—?

—শোন্, কোথায় যেতে হবে জানি না। তবে নতুন কাজের দায়িত্ব নেবার জন্যে তোর জরুরী ডাক এসেছে।

একটু নীরব থেকে পশুপতিদা বললে, নীচে নৌকো নিয়ে বিশ্বাসী কর্মী অপেক্ষা করছে। তোকে এক্ষুণি তার সঙ্গে রওনা হতে হবে। তারপর ওর মাথায় হাত রেখে বললে, জয়যুক্ত হও ভাই!

দশ

পশুপতিদার সঙ্গে চন্দন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো। ডাক যখন এসেছে,—তখন সে ডাকে তাকে সাড়া দিতেই হবে।

সদর দরজা খুলে পশুপতিদা ওকে নৌকো পর্যন্ত পৌঁছে দিল। কোথায় যেতে হবে, কার সঙ্গে যেতে হবে, কেন এই অসময়ে যেতে হবে—কোনো কথাই পশুপতিদা চন্দনকে বললে না। শুধু মৃদু কণ্ঠে বললে, আমার সাধ্যমত যে শিক্ষা তোকে দিয়েছি, তা যেন কোনো মতেই ব্যর্থ না হয়।

যাত্রী চলাচলের জন্যে যে নৌকো—তাকে পূর্ববঙ্গে সাধারণতঃ গহণার নৌকো বলে। সেই জাতীয় একখানি নৌকো ঘাটে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। নৌকোর ভেতর ঝুলিয়ে রাখা একটি চার চৌকো লণ্ঠন মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, প্রদীপটি বুঝি নিভে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার,—বাইরের হাওয়াতেও প্রদীপটি নিভে যাচ্ছে না। মাঝির বেশে একজন কর্মী নৌকোর ভেতর হাল ধরে বসে আছে। খুব বিশ্বাসী আর দায়িত্বপূর্ণ কর্মী না হলে এই সব গোপন কাজে পাঠানো হয় না।

চন্দন তাকিয়ে দেখলে, মাঝির বেশে যে কর্মীটি চুপচাপ বসে আছে, তাকে বেশ বয়স্কই বলা চলে। কর্মীটি চন্দনকে দেখে শুধু বললে, এসো, এসো চন্দন, নৌকোর ভেতরে এসে বোসো। আমি তোমায় নিতে এসেছি।

চন্দন নৌকোয় উঠতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললে, আগে পশুপতিদাকে প্রণাম করে এসো। আবার কবে পশুপতিদার সঙ্গে তোমার দেখা হবে—তা কেউ বলতে পারে না। ওর কাছ থেকে অনেক শিক্ষা তুমি লাভ করেছ। সে হিসেবে উনি তোমার একজন গুরু।

চন্দন নিজের ভুল বুঝতে পারল। একটু লজ্জিতও হল। আবার পেছন ফিরে পশুপতিদার পায়ের ধূলো নিয়ে নৌকোর ভেতরে এসে বসল।

আগন্তুক কর্মীটিকেও চন্দন প্রণাম করল।

নৌকোর মাঝি চুপি চুপি বলল, আমার নাম শম্ভু। তুমি আমাকে শম্ভুদা বলে ডেকো—

চন্দন তার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

পাড়ের ওপর থেকে পশুপতিদা হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালে। শম্ভুদা নৌকো ছেড়ে দিলে।

নিশীথ রাতের হাওয়া চন্দনের বেশ ভালই লাগছিল। শম্ভুদা বললে, অনেকটা পথ যেতে হবে, তুমি ইচ্ছে করলে নৌকোর পাটাতনের ওপর ঘুমিয়ে থাকতে পারো। সময়মত আমি তোমায় ডেকে দেবো।

চন্দন উত্তর দিলে, এখন আর আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। রাত্তিরের মিঠে হাওয়াটা বেশ ভালই লাগছে। আমি এখন নৌকোর ওপর চুপচাপ বসেই থাকি।

শম্ভুদা বললে, সেই ভালো, তোমার সঙ্গে ততক্ষণ গল্প করা যাক।

ততক্ষণে খালের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নৌকো নদীতে গিয়ে পড়েছে। নদীর জল ছলাৎ-ছলাৎ করে নৌকোর গায়ে এসে আঘাত করছে। অনেকটা যেন আদর করে পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে।

শম্ভুদা চারদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিলে। বললে, আমাদের সব সময়ে সাবধান হয়ে পথ চলতে হয়। বিপ্লবীদের পথ ত' কুসুমে ঢাকা থাকে না! বিপদ যে কোন্ দিক থেকে সাপের মত এসে ফণা তুলবে—সে কথা কেউ জানে না। গুপ্তচরেরা চারদিকে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। কাজেই আমাদের সব সময় চারদিকে চোখ রাখতে হয়। একটু অসাবধান হলেই বিপদ।

চন্দন মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানালে।

শম্ভুদা বললে, তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি একটি চালাকির কাজ করতে। এক পুলিশ অফিসারের বাড়ী তোমায় ছোকরা চাকর হয়ে থাকতে হবে।

চন্দন চট্‌পট্ উত্তর দিলে, সে থাকতে রাজি আছে। কিন্তু সেই পুলিশ অফিসার যে আমায় বিশ্বাস করে রাখবে-তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

শম্ভুদা কৌতুকের সুরে বললে, তা আছে বৈকি! পুলিশের যেমন গুপ্তচর আছে, আমাদেরও তেমনি বিশ্বাসী সব কর্মী দেশময় ছড়িয়ে আছে।

তাদের কাজই হচ্ছে পুলিশের ভেতরকার সব গোপন খবর সংগ্রহ করা। আমরা খবর পেয়েছি, সেই পুলিশ অফিসার ওপরওয়ালার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে, কয়েকজন বিপ্লবীকে ধরে জেলে পাঠাবে। আমাদের কর্মীরা খবরটা ঠিকই পেয়েছে। এখন আমাদের কাজ হবে—সেই গোপন নির্দেশটা সংগ্রহ করা। যে পুলিশ অফিসারের বাড়ী তোমায় ছোক্‌রা চাকর সেজে থাকতে হবে—সেই বাড়ীর গিন্নী খুব মোটা আর দজ্জাল। সম্প্রতি তাদের ঝি-চাকর সব পালিয়ে গেছে। অবশ্য ব্যাপারটা ঘটেছে আবার আমাদেরই চালাকিতে। আমাদের আর এক বিশ্বাসী কর্মী ওই অঞ্চলে থেকেই সমিতির সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবারের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। সেই দজ্জাল গিন্নী আমাদের সেই কর্মীকেই অনুরোধ করেছে একটি ছোকরা চাকরের জন্যে। কাজেই পথ আমাদের আগে থেকেই পরিষ্কার হয়ে আছে। ওই অফিসারের কাছে যে গোপন নির্দেশ এসেছে সেই চিঠিখানি আমাদের বিশেষ দরকার। কাজেই বুঝতে পারছ চন্দন, ওই পুলিশ অফিসারের ফাইল থেকে কৌশলে চিঠিখানি সরাতে হবে। পশুপতিদা আমাদের জানিয়েছেন, একাজ তুমি কৌশলে সমাধা করতে পারবে। কি, পারবে না চন্দন?

—নিশ্চয় পারবো—শম্ভুদা—বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে চন্দন উত্তর দিলে।

শম্ভুদা বললে, হ্যাঁ, তুমি যেমন চালাক-চতুর ছেলে, নিশ্চয়ই তুমি একাজ হাসিল করতে পারবে। যে সব বিপ্লবীর নাম সেই চিঠিখানিতে থাকবে,—আমরা আগে থেকেই তাদের সরিয়ে দেবো। তখন আর কোথায় তাদের খুঁজে পাবে পুলিশের লোক?

চন্দন খুব খুশী হয়ে মাথা দোলাতে লাগল।

—এ কাজের মধ্যে ভারী মজা আছে। এ ব্যাপারটা আমি কৌশলে ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবো।

শম্ভুদা ওর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল।—হুঁ! এই চালাকির খেলায় যদি জয়লাভ করতে পারে, তাহলে তোমায় আরো বড় বড় ধাঁধার জট ছাড়াতে দেয়া হবে।

চন্দন বললে, ধাঁধার উত্তর বের করতে আমি খুব ওস্তাদ!

শম্ভুদা বললে, তাই নাকি? হ্যাঁ, তবে একটি কথা মনে রেখো একটু গেঁয়ো-গেঁয়ো ভাব দেখাবে চলনে বলনে। যদি বরিশালের ভাষায় কথা বলতে পারো—তাহলে ওরা আর তোমায় সন্দেহ করবে না।

চন্দন উৎসাহে সারা দেহটা দোলাতে লাগল। বললে,—তাই নাকি? আমার এক মামাবাড়ী বরিশালে। ওখানকার কথা আমি বেশ জানি। কথার আগে পিছে 'ইসে' লাগাতে হবে—

ওর কথা বলার ধরণ দেখে শম্ভুদা হাল ঠিক করতে করতে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। চারদিকে পাখ্-পাখালি ডেকে উঠেছে। নদীর পাড়ে গাঁয়ের মানুষরা চান করতে আসছে। বৌ-ঝিরা মাটির কলসী ভরে জল নিয়ে যাচ্ছে। ছেলের দল 'খৈয়া' জাল ফেলে ছোট ছোট মাছ ধরছে। কয়েকটি ধানের নৌকোকেও যেতে দেখা গেল। কাছেই একটা গঞ্জ। শম্ভুদা সেই গঞ্জে গিয়ে নৌকো ভেড়ালে। ওরা দুজনে নদীর জলে মুখ ধুয়ে চিড়ে আর গুড় কিনে নিলে। শম্ভুদা বললে, তুই চুপটি করে বোস্। ওপরে পাকা কলা বিক্রি হচ্ছে,—আমি নিয়ে আসি। চিঁড়ের সঙ্গে পাকা কলা দিব্যি জমবে।

তাড়াতাড়ি সওদা সেরে শম্ভুদা আবার নৌকো ছেড়ে দিলে। বেশীক্ষণ কোথাও আটকে থাকতে রাজী নয়। কি জানি, কখন কোন্ গুপ্তচর দেখে ফেলবে। ভাটির টানে নৌকো ছেড়ে দিয়ে শম্ভুদা গান ধরলে, মন-মাঝি, তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।

সারাদিন ধরে নৌকো চললো।

কোথাও কোথাও মাঝির দল গুণ টেনে বড় বড় নৌকো নিয়ে যাচ্ছে। কোথাও বা জেলেরা মাছ ধরছে। কোথাও পাট বোঝাই নৌকো সারে সারে চলেছে।

শম্ভুদা বললে, চন্দন, তুই একটু পাটাতনে গড়িয়ে নে। গিয়েই কিন্তু নতুন মনিব-বাড়ী কাজে লাগতে হবে।

চন্দন উত্তর দিলে, সে ঠিক আছে।

নৌকোর ভেতরেই একটা পুঁটলি ছিল শম্ভুদার পরামর্শমত চন্দন এক ফাঁকে ছোকরা চাকরের বেশ করে নিলে। কানের পিঠে একটা আধ-খাওয়া বিড়ি গুঁজে দিতেও ভুলল না।

বিকেলের দিকে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে শম্ভুদা নৌকো লাগালো। আগের ব্যবস্থা মত সেই কর্মী-ভাই একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। ওদের নৌকো ভেড়াতে দেখে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলে, ওকে সব বুঝিয়ে দিয়েছিস ত?

শম্ভুদা বললে, চন্দন খুব চালাক-চতুর ছেলে, ও সব বুঝে নিয়েছে। তুমি এখন ওকে সঙ্গে নিয়ে নতুন মনিব-বাড়ী চলে যাও।

আগন্তুক কর্মী-ভাই খুশী হয়ে বললে, চল্ তবে আমার সঙ্গে। তোর নাম হল গোবিন্দ। আমি তোকে সেই নামেই পরিচয় করিয়ে দেবো। আর শোন, আজ বাড়ীর গিন্নী সত্যনারায়ণের সিন্নির ব্যবস্থা করেছে। সকলে যখন সেই পুজোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন তুই পুলিশ অফিসারের নিজের ঘরে ঢুকে—সেই ওপরওয়ালার 'নির্দেশ' নিয়ে পালিয়ে আসবি—কি রে, ইংরেজী পড়তে জানিস ত? একাজ ত তোর একেবারে জল ভাত।

চন্দন উত্তর দিলে, হঁ্যা, আমি ঠিক কাজ হাসিল করতে পারবো। এখন নতুন মনিব বাড়ীর দিকে রওনা দেয়া যাক।

শম্ভুদা ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল। বললে, আমি নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করবো।

এগারো

শম্ভুদা মিছে কথা বলে নি।

বাড়ীর গিন্নীর কাছে হাজির করতেই চন্দন তাকিয়ে দেখলে, তিনি যেমন মোটা, তেমনি কালো। পটল-চেরা চোখ ত নয়, আলু-চেরা চোখ ঘুরিয়ে বাড়ীর গিন্নী বললে, ওরে ছোঁড়া, মন দিয়ে কাজ করবি ত? আবার কিছু চুরিটুরি করে পালাসনি যেন! হঁ্যারে, কি নাম তোর?

মুখ কাচুমাচু করে গরু চোরের মত চন্দন উত্তর দিলে, আজ্ঞে আমার নাম গোবিন্দ।

ঠাকরুণ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, হঁ্যা, ঠাকুর দেবতার নাম থাকা ভালো। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যি জমা হয়ে রইল। তা দেখ গোবিন্দ, আজ এ বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি হবে। তুই চান করে কাজে লেগে যা। যা। রাস্তার নোংরা জামা-কাপড়ে বাপু পুজোর কাজ চলবে না।

গিন্নী নিজেই ধুতি আর গেঞ্জি বের করে দিলে।

চন্দনের যেন আর তর্ সইছিল না। চান করে জামা-কাপড় মেলে দেবার সময় একবার উঁকি মেরে কর্তার ঘরটা দেখে নিলে। তারপর পুজোর কাজে লেগে গেল।

পুরোহিত ঠাকুর যখন সবাইকে সত্যনারায়ণের পাঁচালি পড়ে শোনাচ্ছিলেন,

সেই সময় চন্দন সবাইকে লুকিয়ে ফস্ করে একবার বেরিয়ে গেল। টেবিলের ওপর কয়েকটি ফাইল থাক করে সাজানো ছিল। দু-একটি ফাইল ওল্টাবার পর 'URGENT' স্লিপ দেয়া একটি ফাইল দেখে সে উৎসাহিত হয়ে উঠল। একটু খোঁজবার পরই আসল 'অর্ডার'টা তার হাতে পড়ে গেল। চোখ বুলিয়ে দেখলে এই চিঠিতেই 'টেরোরিস্টি'দের গ্রেপ্তার করবার নির্দেশ রয়েছে। চট্ করে সে ফাইল থেকে চিঠিখানা খুলে বের করে নিল। তারপর সেটা ভাঁজ করে কোমরে লুকিয়ে রাখলে।

ততক্ষণে পুজোর জায়গা থেকে গিন্নীর হেঁড়ে গলার চীৎকার শোনা গেল,—ওরে গোবিন্দ, কোথায় গিয়ে মরে রইলি? এখানে যে ছিষ্টির কাজ জমে আছে। শীগ্‌গির আয়—

গোবিন্দ ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হল, শুধাল, কি বলছ মাঠান?

গিন্নি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিলে, কোথায় গিয়ে থাকিস? বাড়ীর পেছন দিকে অনেক কলাগাছ আছে, কলাপাতা কেটে নিয়ে আয়—সবাইকে সিন্নি দিতে হবে না?

চন্দন ত' এই রকম একটা সুযোগই চায়।

তাড়াতাড়ি বাড়ীর পেছন দিকে চলে গেল। সেখান থেকে এক ছুটে একেবারে খালের ধারে নৌকোর কাছে।

সেখানে দুই কর্মীভাই আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

একজন জিজ্ঞেস করল, কি রে সিন্নি দেয়া হয়ে গেল?

চন্দন হাসতে হাসতে জবাব দিলে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও সিন্নি চড়ানো হয়ে গেল। এই নাও সেই চিঠি।

দুজনে নৌকোর মৃদু আলোতে চিঠি পড়ে ত' অবাক্।

—অ্যাঁ! করেছিস্ কি চন্দন, এরই মধ্যে কাজ হাসিল করে ফেলেছিস্?

চন্দন হাসতে হাসতে বললে, এখনও আমি গোবিন্দ। বলো তোমরা, চাকরীতে বহাল থাকবো না ছেড়ে দেবো?

দু'জন কর্মীভাই একই সঙ্গে উল্লাসধ্বনি করে বললে, আবার চাকরী? শীগ্‌গির নায়ে উঠে পড়। এখান থেকে পালাতে হবে।

চন্দনের জন্যে একটি নতুন আশ্রয় আগে থেকে ঠিক করা ছিল, একটি গ্রামে এক নিরিবিলি খালের ধারে একটি কৃষকের গৃহে। বাড়ীতে কৃষক, তার

বৌ, আর তাদের এক কিশোর ছেলে। চন্দন ওই বাড়ীতে কৃষকের ভাগ্নে হয়ে যেন বেড়াতে এলো। উঠোনে ধান শুকোতে দেয়, ধান ঝাড়ে আর ছোট ছোট গোলায় ভরে রাখে সেই ধান।

বাড়ীর সবাইকার সঙ্গে লাল মোটা চালের ভাত আর কলায়ের ডাল খায়। মাঝে মাঝে এক একদিন মছি মাছের (মৌরলা) চচ্চড়ি জোটে। সোনামুখ করে চন্দন তাই খায়। ওর তাতে কোনো আপত্তি নেই। বরং চাষীর বাড়ীর স্নেহ-প্রীতিতে মাখা অন্ন ওর বেশ ভালই লাগে, খুশী মনে গুন্-গুন্ করে গান গায়।

একদিন চন্দন চাষীর কাছে আবদার করলে, আমি তোমাদের গরু নিয়ে মাঠে যাবো, লাঙল চালাবো।

চাষী-ভাই হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, তুমি কি গরু নিয়ে যেতে পারো? আর লাঙল চালাতে জানা চাই। অমনি চালাতে গেলে ধরা পড়ে যাবে। আশে-পাশের চাষীরা তখন তোমায় দেখে হাসাহাসি করবে।

চন্দন মাথা চুলকে বললে, সে কথা ঠিক। দু'-একদিন শিখে নিলে আর আমার কোনো ভুল হবে না।

চাষী সেজে চাষীর বাড়ীতে চন্দনের দিব্যি চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন গভীর রাতে শম্ভুদা এসে হাজির। বললে, শোন চন্দন, তোর একটা নতুন কাজের জন্যে ডাক এসেছে। কেন্দ্র-সমিতি তোর যোগ্যতা আর কর্মকুশলতা দেখে ভারি খুশী। এইবার আর একটু দায়িত্বপূর্ণ কাজ—

চন্দন উত্তর দিলে, শম্ভুদা, আমি ত এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। সমিতি থেকে নির্দেশ এলেই কুইক মার্চ স্থরু করে দেবো—

শম্ভুদা খুশী হয়ে ওর পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বললে, মন দিয়ে ব্যাপারটা শোন। দিন কয়েক বাদে এই গঞ্জে 'ত্যাশের রাজা' বক্তৃতা দিতে আসবে। মস্তবড় মিছিল বেরুবে।

চন্দন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ত্যাশের রাজা' আবার কে?

শম্ভুদার মুখে-চোখে কৌতুক। বললে, "ত্যাশের রাজা" জানিস নে বুঝি? স্থরেন ব্যানার্জির নাম শুনেছিস? তাকে দেশের লোকে বলে 'ত্যাশের রাজা!' মানে Uncrowned King of Bengal" সেই ত্যাশের রাজা আসবে এই গঞ্জে। স্বদেশী মেলা বসবে, কত বক্তৃতা হবে। আর দারুণ মিছিল বেরু হবে। যাকে বলে একেবারে লোকে-লোকারণ্য। সেই মানুষের ভীড়ের

মধ্যে তোকে একটা জিনিস কৌশলে পাচার করতে হবে। চাষার ছেলে সেজেই যাবি। তোর মাথায় থাকবে একটি বস্তা, তা সেটা চালের বস্তাও হতে পারে, আর মুড়ির বস্তাও হতে পারে।

চন্দন জিজ্ঞেস করে, আমায় কি করতে হবে সেই বস্তা নিয়ে?

—শোন, ব্যস্ত হোস নে। সব বুঝিয়ে বলছি তোকে।

সেই মিছিলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে সুরু করবি। ঠিক জায়গায় আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব। কিছুদূর চলবার পরই—একটা নিমগাছের তলায় দেখবি দাঁড়িয়ে রয়েছে—এক মুসলমান ভদ্রলোক। তার মাথায় একটি লাল ফেজ। চোগা-চাপকান তার পরণে, একেবারে ফিটফাট বাবু। বুকে একটি লাল গোলাপ গোঁজা আছে দেখবি। বেশ ভালো করে লক্ষ্য করবি। ভয় পাবি নে। সোজা তার কাছে যাবি। আস্তে আস্তে বলবি, মোয়া চাই মিঞা, গরম গরম মুড়ির মোয়া? সেই মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকবে একজন চাকর। ভদ্রলোক বলবে, রাখো বস্তা। তখন সেই চাকরটি এসে তোর হাতের বস্তা মাথায় তুলে নেবে? মুসলমান ভদ্রলোক তোকে দুটো টাকা দেবে। তুই আর কোনো কথা না বলে—তাকে সেলাম করে চলে আসবি—

চন্দন অবাক্ হয়ে শম্ভুদাকে জিজ্ঞেস করলে, ওরা দু'জনেই আমাদের সমিতির কর্মী?

মৃদু হেসে শম্ভুদা উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ওরা সবাই বিপ্লবী। ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে ত? নইলে যে—আমাদের সব পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে যাবে! পারবি ত' কাজটা হাসিল করতে?

চন্দন ত এই রকম বিপ্লবীর গোপন কাজেই আত্মনিয়োগ করতে চায়। যে কাজে উত্তেজনা আছে, ভয় আছে, আর সাহসেরও দরকার। বললে, নিশ্চয়ই পারবো। সময় মত আমায় এখান থেকে ডেকে নিয়ে যেও শম্ভুদা,—আমি প্রস্তুত হয়েই থাকবো—

শম্ভুদা বললো, পরশুদিন—বিকেল বেলা। খালের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবি, আমি নৌকো নিয়ে হাজির হবো। বস্তা আমার নৌকাতেই থাকবে,—কোনো ভয় নেই।

অবশেষে সেই পরশু দিন এসে উপস্থিত হল। বিকেল যেন আর আসতে চায় না। চন্দন কেবলি ঘর-বার করতে থাকে। চাষা-বৌ জিজ্ঞেস করে,

ভাগ্নে, বুঝি দারুণ খিদে লেগেছে? তা পান্তা ভাত আর ডাল শুক্নো আছে, বিচিকলা আছে ঘরে, গপাগপ্ খেয়ে নিতে পারো।

চন্দন বললে, তাই দাও মামী, আমাকে আবার একটু গঞ্জে যেতে হবে।

পান্তা ভাত খেয়ে চন্দন খালের ধারে গিয়ে হাজির হল। শম্ভুদার নৌকো তৈরী। গঞ্জের বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছুতে দেরী হল না। ইতিমধ্যে পথের দু'পাশে বহু লোক জমে গেছে। 'স্থাশের রাজাকে' দেখবে। ফেরিওয়ালার দল সেই ভিড় ঠেলে পথ করে নিচ্ছে—

—পাতার ভেঁপু চাই—পাতার ভেঁপু—

—জিলিপি—গরমা গরম জিলিপি—

—বেলুন নেবে কে—রঙ্ বেরঙের বেলুন—

—ফুটকলাই আর ফেনী বাতাসা—চলতে চলতে খাবে—

ওই জনতার ভেতর দিয়ে চন্দন মাথায় বস্তা—চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলে—

হ্যাঁ, ওই ত' নিমগাছ। চন্দন যেন নিশানা পায়। আরো দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে।

ঠিক। ওই মুসলমান ভদ্রলোক। মাথায় লাল ফেজ, আর বুকে লাল গোলাপ।

চন্দন গিয়ে বললে, মোয়া চাই মিঞা? গরম গরম মুড়ির মোয়া?

মুসলমান ভদ্রলোক ওর মুখের পানে একবার তাকালো, তারপর বললে, রাখো।

চাকর এসে বস্তা তুলে নিলে। ভদ্রলোক ওকে দুটো টাকা দিলে।

হঠাৎ চন্দন তাকিয়ে দেখে, দূরে একটা লোক, অবাক্ হয়ে কটমট করে চেয়ে আছে—ওর দিকে।

পুলিশের গুপ্তচর নয় ত?

চন্দন চোখের নিমেষে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

বারো

সেই যে থলে—যাকে 'মুড়ির মোয়া' বলে চন্দন মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে দিয়ে এসেছিল—তার ভেতরে ছিল কয়েকটা রিভলভার। পরে নাকি সেই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ঢাকা শহরে দু'জন অত্যাচারী লালমুখোকে শায়েস্তা করা হয়েছিল।

এই দুটি লালমুখো নাকি বিপ্লবীদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কয়েকজন বিপ্লবীকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল তাদের ওপর।

ওপর থেকে তখন নির্দেশ এলো, লালমুখোদের মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে। যে করেই হোক—ওদের খতম করতে হবে।

মেদিনীপুর আর বরিশালের দুই তরুণ এই দায়িত্ব পালনের ভার নিয়েছিল। একটি ফুটবল ম্যাচ্ দেখতে উপস্থিত ছিল এই দুটি দুর্দান্ত লালমুখো। সেইখানেই ওদের অনুসরণ করে দু'জনকেই গুলীবিদ্ধ করে দুই তরুণ। তারপর সন্ধ্যার আঁধারে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায় বিপ্লবীরা। কেউ ওদের ধরতে পারে নি।

এ সব কাহিনী চন্দন অনেক পরে শোনে শম্ভুদার কাছে।

নানা জাতীয় খবর বাতাসে ভেসে আসে।

পি. মিত্র দলের সর্বময় কর্তা। বিপ্লবীদের নিয়ে স্বাধীনতা-যজ্ঞে তাঁর নানা পরিকল্পনা। কেউ নাকি তাকে চোখে দেখে না। আড়ালে থেকে এই ব্যারিষ্টার চুপচাপ হাল ধরে বসে আছেন। বরোদা থেকে এসে অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে আসীন। সুবোধ মল্লিক এই কাজে এক লক্ষ টাকা দান করে জনসাধারণের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি পেয়েছেন। অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন ঘোষ কোথায় গোপনে বিপ্লবীদের নিয়ে বোমা তৈরী করছে। ঢাকায় পুলিন দাস হাজার হাজার বাঙালী ছেলেকে লাঠি খেলায় দীক্ষা দিয়েছে। ওদিকে 'মহারাজ' নামটাই বিপ্লবীরা শুনেছে। সে যে কোথায় লুকিয়ে থেকে স্বদেশী ডাকাতিতে রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করছে—সেটা রূপকথায় দাঁড়িয়ে গেছে।

চন্দন চাষার বাড়ীতে বসে নানা রকম গুজব শুনে ছট্‌ফট্ করে। বিপ্লবীরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য কোন্ গোপন পথে অগ্রসর হচ্ছে—সে তা কিছুই বুঝতে পারে না। অনেক সময় লুকিয়ে গঞ্জে গিয়ে শম্ভুদার কাছে 'বন্দেমাতরম্' কাগজ পড়ে। অরবিন্দ ঘোষের গরম গরম সব রচনা ছাপা হয়। সব কথা সে বুঝতে পারে না।

ভবানী মন্দির কি গহন বনে স্থাপিত হয়েছে? সে কথাও সে ভালো করে জানে না।

চাষীভাইদের সঙ্গে মিশে এর মধ্যে চন্দন লাঙল চালানোটা দিব্যি শিখে

নিয়েছে। ওদের সঙ্গে মিশে উঠোনে ধান শুকুতে দেয়। তারপর ধানের গোলায় ভরে রাখে।

একবার চন্দনের খেয়াল হল—এই চাষীদের গ্রামে একটি পাঠশালা খুলতে হবে। ওদের ধীরে ধীরে লেখাপড়া শেখাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সে কিছু ছেলেও জোগাড় করে ফেললে। কিন্তু মাতব্বরেরা তাতে খুব খুশী নয়। ছেলেরা যদি পড়াশোনা নিয়ে মেতে ওঠে—তাহলে ক্ষেতের কাজ কে করবে? ফসল ফলানোর কাজে ক্ষতি হবে।

গভীর রাতে চন্দন আপন মনে আকাশ পাতাল ভাবে। দেশের স্বাধীনতা কবে আসবে—ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

হিংসের পথেই যদি স্বাধীনতা আসবে—তাহলে বিপ্লবীদল কেন এক সঙ্গে মরণ-পণ করে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

কেউ কেউ আবার বলে, স্বাধীনতার জন্যে স্বদেশী ডাকাতি করা অন্যায়। আর একদল মত প্রকাশ করে, দেশ স্বাধীন হলে আমরা সবাইকার সব টাকা শোধ করে দেবো।

কলকাতায় সব বড় বড় নেতারা থাকে। তাদের কার কি মত চন্দনের জানতে ভারি ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আরো অনেক বই পড়ে তার জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করে। কিন্তু এই চাষীগ্রামে এসে বই-পত্তরের কোনো সন্ধান পায় না। মনে হয় পশুপতিদার কেন্দ্রটাই ছিল ভাল। ওখানে নানা রকমের বই পড়ার কোনো অসুবিধা ছিল না।

একদিন গভীর রাত্রে চন্দন স্বপ্ন দেখে, সে যেন একটা রিভলভার নিয়ে লালমুখোদের তাড়া করেছে। কিন্তু শত চেষ্টা করে কিছুতেই গুলী ছুঁড়তে পারছে না।

লালমুখোগুলো দাঁত বের করে হাসছে—দুয়ো—দুয়ো এ তোদের ভেতো বাঙালীর কাজ নয়! রিভলভার ছুঁড়তে হলে শরীরে তাগত থাকা চাই। হা-হা-হা! হতাশা ও ব্যর্থতায় ও যেন একেবারে নুয়ে পড়ে।

আচম্‌কা ঘুম ভেঙ্গে যায়—আকাশের তারাগুলো যেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ করে।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ শম্ভুদা এসে হাজির হল।

—তোর ডাক পড়েছে চন্দন।

চন্দন উৎসাহে উঠে বসে—এবার আমাকে কোথায় যেতে হবে শম্ভুদা ?

—এবার তোকে যেতে হবে ঢাকা শহরে। একটা জরুরী চিঠি নিয়ে পুলিন দাসের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

চন্দনের মনে-প্রাণে একটা শিহরণ জাগে।

—সেই পুলিন দাস ? হাজার হাজার ছেলের লাঠি শিক্ষার গুরু ? সেই বিপ্লবী-প্রধান পুলিন দাসের লাঠি খেলা দেখলে সে ধন্য হয়ে যাবে। তার সঙ্গে কি কথা বলতে পারবে চন্দন।

আপনা থেকেই চন্দনের দেহ রোমাঞ্চিত হয়।

শম্ভুদা বললে, নৌকো করেই যেতে হবে রে চন্দন। আমিই তোকে পৌছে দিয়ে আসবো। একটা থলে নিতে হবে, আর একটা জরুরী চিঠি। একেবারে পুলিন দাসের আখড়ায় গিয়ে তার হাতে পৌছে দিতে হবে।

চন্দন এক কথাতেই রাজি। এই চাষী পল্লীতে সে দীর্ঘকাল আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। সে চায় উত্তেজনা—সে চায় কর্ম-চাঞ্চল্য-জগৎ। রণক্ষেত্র থেকে সে দূরে থাকতে চায় না ! রণাঙ্গনে রণ-দুন্দুভি বাজছে—সেই মৃত্যু-অঙ্গনে সে নিজের স্থান করে নিতে চায়।

শম্ভুদার সঙ্গে সেই নৌকো করেই রওনা হল চন্দন।

মৃদু-মন্দ সমীরণে নৌকো ভেসে চললো বড় নদীর দিকে। বড় গাঙে পড়ে শম্ভুদা নৌকোয় বাদাম খাটিয়ে দিলে। খোলা হাওয়ায় নৌকো যেন নদীর বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চললো।

আকাশের বুকে কখনো সোনালী রোদ, কখনো কালো মেঘ, আবার তার পরমুহূর্তেই ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি। প্রকৃতির এই খেয়াল-খুশির দৌরাত্ম্যে ওরা এগিয়ে চললো।

একদিন নদীর পার থেকে কয়েকটা কাউটা জোগাড় করে নিল শম্ভুদা। নদীর খোলের ভেতর রেখে দিলে কাউটাগুলি

চন্দন অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, নৌকোর ভেতর কাউটা তুলে নিলে কেন ? আমরা ত' দই চিঁড়ে গুড় খেয়েই দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছি।

শম্ভুদা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

তারপর কৌতুক করে বললে, পথের দেবতাকে তুষ্ট করতে হবে না ?

চন্দন শুধোয়, সে আবার কে ?

—সময়মত সব কিছু দেখতে পাবি।

নৌকো আবার ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চলে। বিকেলবেলা একটা জল পুলিশের লঞ্চ থেকে আচম্‌কা হুমকী এলো—, এই এদিকে এসো, নৌকো ভেড়াও—

মাঝি-বেশী শম্ভুদা বললে—আজ্ঞে কর্তা, আপনার কাছেই ত' একটু একটু করে এগুচ্ছি—

পুলিশ অফিসারের চোখে মুখে সন্দেহ। শুধোলে, তার মানে? আমার সঙ্গে রসিকতা করছিস?

—আজ্ঞে না কর্তা—শম্ভুদার তড়িঘড়ি জবাব—পথে কয়েকটা তর্‌তাজা কাউটা পেলাম, তাই হুজুরের পায়ে দিতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আপনি হাঁক দিয়ে ডাকলেন কর্তা—

বিগলিত বদন শম্ভুদা কাউটাগুলি নৌকোর খোল থেকে বের করে পুলিশ অফিসারের পায়ের কাছে রাখলে।

পুলিশ অফিসারের চোখ-মুখ লোভ ও লালসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শম্ভুদার পিঠ চাপড়ে বললে, সাবাস ছোক্‌রা। তোর ত দেখছি পছন্দ আছে।

শম্ভুদা যেন ওর সাবাস ধ্বনিতে একেবারে গলে গেল। তাই মাথা নীচু করে শুধু বললে, আরে কর্তা—

এর পর নৌকো খানা-তল্লাসী করার প্রশ্ন ওঠে না। হাজার হোক—পুলিশেরও একটা চক্ষুলজ্জা আছে।

অতি সহজেই নৌকো খালাস পেল।

জল-পুলিশের লঞ্চ থেকে একটু তফাতে এসে শম্ভুদা চোখ নাচিয়ে বললে, দেখলি হতভাগা, কেমন করে পথের 'দ্যাবতাকে' তুষ্ট করলাম।

দুজনেই পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলো।

নৌকো আবার নদীর বুকে এগিয়ে চললো।

ততক্ষণে মেঘ বাদল কাটিয়ে আকাশের বুকে ত্রয়োদশীর চাঁদ ভেসে উঠেছে। শম্ভুদা মনের আনন্দে ভাটিয়ালী গান ধরল—

বন্ধুরে—! তোমার ঘাটে গেলে পরে দিও পানের খিলি—
এতদিনের মনের কথা—কইব নিরিবিলি।

শম্ভুদা গান থামিয়ে বললে, আমরা বুড়ীগঙ্গা নদীতে এসে পড়েছি। ঢাকা শহরের আর বেশী দেরী নেই।

সত্যি ভাই, চন্দন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখলে—দূরে ঢাকা শহরের দালান-কোঠা দেখা যাচ্ছে। সেই সব বাড়ীঘরের আলো নদীর বুকে পড়ে ঝলমল করছে।

ওদিক থেকে নানা জাতের সৌখীন বজরা ভেসে আসছে।

সৌখীন বাবুর দল বুঝি সন্ধ্যেবেলায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। একটা বজরার ভেতর থেকে গান-বাজনার শব্দও শোনা যাচ্ছে।

চন্দন অবাক্ হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

তেরো

অবশেষে বুড়ীগঙ্গার ঘাটে গিয়ে নৌকো লাগল।

শম্ভুদা বললে, এই রাত্তিরেই বিপ্লবী পুলিন দাসের আখড়ায় গিয়ে জিনিস দুটো পৌঁছে দিতে পারলে বড় ভাল হত। কারণ, কাজটা খুব জরুরী।

চন্দন বললে, আমি কিন্তু ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট কিছু চিনি নে। তবে জিজ্ঞেস করে করে এগুতে পারি।

শম্ভুদা ঠাট্টা করে বললে, একি তোর গাঁ-গঞ্জ পেয়েছিস? বিরাট ঢাকা শহর। মুসলমান আমলে রাজধানী ছিল। এখনও পূর্ববঙ্গের রমরমা গমগমা শহর,—কত রাস্তা, কত অলিগলি।

তারপর হঠাৎ কি মনে হতে বললে, তবে একটা কাজ করলে হয়। ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ানরা সব খবর রাখে। ওদের একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করলে ঠিক তোকে পৌঁছে দেবে।

চন্দন রাস্তায় নেমে সেই মতই ব্যবস্থা করলে।

কুট্টি গাড়োয়ান সব শুনে জিজ্ঞেস করলে, লাঠিয়াল পুলিন দাস ত? তারে আথরা আর চিনিনে! পুছেন না, আমার ঘোড়াতেও কইয়া দিবো—

শম্ভুদা বললে, আমার ওপর ফিরে যাওয়ার নির্দেশ আছে। তুই সোজা চলে যা বিপ্লবী পুলিন দাসের আখড়ায়। তারপর তিনি যা বলেন, সেইরকম কাজ করবি।

চন্দন শম্ভুদার পায়ের ধূলো নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বসল। রাস্তার দুধারে কত রকমারী দোকান। ফিটন চেপে সায়েব-মেম হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। ফেরিওয়ালারা নানারকম খাবার আর সৌখীন জিনিস ফিরি

করে পথ চলছে। কোনো কোনো বাড়ী থেকে গান-বাজনার মিঠে আওয়াজ ভেসে আসছে।

অবশেষে চন্দন গিয়ে পৌছুলো বিপ্লবী পুলিন দাসের আখড়ায়। অত রাত্তিরেও তিনি একটা ঘরে বসে বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। চিঠি আর থলি পেয়ে বললেন, আমি তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম। তোমার নামই ত' চন্দন?

চন্দন নত হয়ে পুলিন দাসের পায়ের ধূলো নিলে। দীর্ঘদেহী শ্যামবর্ণ মানুষ। দুই চোখে যেন চাপা আগুন জ্বলছে।

পুলিন দাস বললেন, তুমি আমার এখানেই থাকবে। মৌলভীর কাছে লাঠিখেলার শিক্ষা নিয়েছ? আচ্ছা, কাল তোমার বিদ্যে যাচাই করবো। এখন খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়।

পরদিন ভোর হবার আগেই চন্দনকে ডেকে পুলিন দাস বললেন, আজ তোমার লাঠিখেলার পরীক্ষা নিতে পারব না। যে জরুরী চিঠিখানা তুমি নিয়ে এসেছ, সেই কাজেই আজ সারাদিন কেটে যাবে, রাত্তিরেও তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা সন্দেহ।

তারপর হাসতে হাসতে বললেন, হবে, হবে, তোমার সঙ্গে ভালো করে মোলাকাৎ হবে আমার। তোমাকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ।

বিপ্লবী পুলিন দাসের মুখের কথা শুনে চন্দন ভারি অবাক্ হয়ে গেল। এত বড় নামকরা বিপ্লবী, হাজার হাজার তরুণকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, সে সামান্য একটা গাঁয়ের ছেলে, তাকে দিয়ে ওঁর এমন কি কাজ হবে? তবু শুনেও ওর মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

পুলিন দাসকে সেদিন খুব ব্যস্ত দেখা গেল। অনেক বিপ্লবী কর্মীদের নিয়ে গোপন বৈঠক করলেন। রাত্রে কোনো নতুন 'অপারেশনে' বেরিয়ে গেলেন কিনা—কে জানে!

চন্দনের মনে নানা প্রশ্নের উথাল-পাথাল।

দেশ জুড়ে কত বিপ্লবী ছড়িয়ে আছে। স্বাধীনতা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে তারা কে কোন্ পথে সাধনা করছে—চন্দন কিছুই জানে না। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা একদিন কেন্দ্রীভূত হবে কিনা তাও চন্দন ভালো করে বলতে পারে না। তবু আশায় বুক বেঁধে সে এই বন্ধুর পথে এগিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত সমিধ্ জ্বালিয়ে রাখবে। বঙ্গ-জননীকে শৃঙ্খলমুক্ত করতেই হবে।

গভীর রাত্রে দলবল নিয়ে পুলিন দাস ফিরে এসেছেন। চন্দন শব্দ শুনে টের পেয়েছে। হয়ত কাছাকাছি কোন নৈশ-অভিযান ছিল। এই ঘটনার পর আবার পুলিশের আনাগোনা সুরু হবে কিনা তাই বা কে জানে! চন্দন শুনেছে,—এই ঢাকা শহরে গুপ্তচরদের অবাধ গতিবিধি। কে সাধারণ মানুষ, আর কে গুপ্তচর কিছু বোঝবার জো নেই!

পরদিন সকালবেলা চন্দনকে তিনি ডেকে নিলেন—এসো, এক হাত আমার সঙ্গে লড়ে যাও—বিপ্লবী পুলিন দাস নিজের হাতে লাঠি তুলে নিলেন।

আশে-পাশে কয়েকজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে প্রবীণ আর তরুণের লাঠিখেলা দেখতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুইজনের খেলা বেশ জমে উঠল। প্রবীণ বিপ্লবী অনেক চেষ্টা করেও চন্দনের হাতের লাঠি মাটিতে ফেলে দিতে পারলেন না।

তিনি হঠাৎ সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন, সা-বা-স্! তারপর খেলা থামিয়ে চন্দনের পিঠ চাপড়ে বললেন, নাঃ, দেখছি আমাদের মৌলভী তোমাকে ভাল করেই শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছে। এখানে আমার কাছে ক'দিন থাকো। আমি তোমায় গড়ে-পিটে ইস্পাত করে তুলবো।

চন্দন প্রবীণ বিপ্লবীর পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিলে।

পুলিন দাস হাসিমুখে বললেন, এইবার ঘুরে-ফিরে ঢাকা শহরটা চিনে নাও। তুমি ত' এর আগে কখনো ঢাকায় আস নি। অলি-গলি অনেক কিছুই তোমায় জেনে নিতে হবে। রাস্তাগুলোকে একেবারে মুখস্ত করে মগজের মধ্যে পুরে রাখবে।

সত্যি, ঢাকা শহরের কোন খবরই চন্দন রাখে না। শহর চেনার সব চাইতে ভাল পথ হল—হারা উদ্দেশে ঘুরে বেড়ানো। কোথায় কোন্ রাস্তা, কোন্ অঞ্চলের নাম কি—কোন্ পথে কি জাতীয় বাসিন্দা বাস করে সবকিছু জেনে নিতে হবে।

এখন চন্দনের কাজ হল—ছদ্মবেশ ধরে ঢাকার নানা পথে-বিপথে, নানা অঞ্চলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো।

বিচিত্র শহর এই ঢাকা।

খুব বড় লোকেরাও এখানে বাস করে। বিরাট বিরাট তাদের দালান-কোঠা। কত সব ব্যবসায়ীরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁদে বসেছে। ঢাকার শাঁখারী আর সাহা সম্প্রদায় নানা ভাবে বিকিকিনি চালিয়ে নিজেরা এই শহরের

বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ঢাকার এই কুড়ি গাড়োয়ানের দল, ওদের অজানা কিছুই নেই। ওদের হাতে রাখতে জানলে, বহু অসাধ্য সাধন করা যায়।

ইতিমধ্যে নানা রকম খবর আর গুজব এসে পৌঁছুতে লাগল ঢাকা শহরে।

লর্ড কার্জন নাকি বাঙালী বিপ্লবীদের ওপর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে। ওই সব দামাল ছেলেদের নাকি কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাকি এই সব বেপরোয়া বিপ্লবীদল নাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বিদেশী বড়লাট ঠিক করেছে—বাঙলা-মায়ের বুকে ছুরি চালিয়ে বাংলাদেশকে দু'টুকরো করে ফেলতে হবে। বাঙালীকে আর এক সঙ্গে বসবাস করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে দেয়া হবে না।

এই খবর রাষ্ট্র হবার পর দেশের নেতার দল প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন।

খবরের কাগজে সম্পাদকেরা অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় ছেপে সারা দেশে যেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে তুললেন। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে তীব্র স্বদেশী প্রচার সুরু হয়ে গেল।

স্বদেশী কাপড় পরতে হবে—

স্বদেশী জিনিস কিনতে হবে—

স্বদেশী ভাষা বলতে হবে—

স্বদেশী গান গাইতে হবে—

দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরা এই কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগল। বাঙালী যেন দেখতে দেখতে আরো একতাবদ্ধ হয়ে উঠল। নদীতে বাঁধ দিলে যেমন সেই নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠে—চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে যায়—স্বদেশী আন্দোলনে তাই হল। দুর্বার বাঙালী তরুণ নতুন করে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষা নিল। এতদিন যারা দেশের কথা ভাবত না, আলস্যে আর উদাসীনতায় দিনগত পাপক্ষয় করত—তারাও সচেতন হল। এক সঙ্গে হাতের মুষ্টি বদ্ধ করে হুঙ্কার দিলে—বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে হবে।

সারা দেশে বিদেশী বর্জন চললো, আর বিদেশী কাপড় পোড়ানো সুরু হয়ে গেল। বিলাতি নুন খাওয়া চলবে না, বিলাতি কাঁচের চুড়ি হাতে পরা চলবে না।

মুকুন্দ দাস গান বাঁধলেন—

"বেত মেরে তুই মা ভুলাবি—আমি কি মার সেই ছেলে ?"

আবার গাইলেন—

"ভেঙে ফেল কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী—

গানে গানে জেগে উঠল বাংলার মাঠ-ঘাট প্রান্তর নদী-নালা।

রবিঠাকুর গান রচনা করলেন—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে—
তততই বাঁধন টুটবে মোদের,—ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের আঁখি যত রক্ত হবে—
ততই আঁখি ফুটবে মোদের,—ততই আঁখি ফুটবে।"

স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত ছাত্রদল গাইতে লাগল—সমবেত কণ্ঠে—

"একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক—
হিমাদ্রী পাষাণ কেঁদে গলে যাক
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।"

জন্মাষ্টমীর মিছিল বেরিয়েছে ঢাকা শহরে—

চন্দন তার দলবল নিয়ে জনতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। হাতে তাদের মুদ্রিত বিপ্লবের বাণী।

তাই জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতে করতে ওরা নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছে। অবাঞ্ছিত লোকের সম্মুখীন হলে ওরা অস্ত্রমুখে তার মোকাবেলা করবে। সেইভাবে প্রস্তুত হয়েই ওরা পথে বেরিয়েছে।

ওদের মনে-মনে মন্ত্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে—

"—এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ—
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—চিত্ত ভাবনাহীন।"

চৌদ্দ

অবশেষে একদিন বিপ্লবী পুলিন দাস তাঁর গোপন কক্ষে ডেকে পাঠালেন চন্দনকে।

প্রথমে হাল্‌কা সুরে জিজ্ঞেস করলেন, ঢাকা শহর চেনা হল তোর ? 'তুমি'

থেকে একেবারে 'তুই'। যেন প্রবীণ বিপ্লবী তাকে অতি আপনজন করে কাছে টেনে নিলেন।

একথা সে-কথার পর প্রবীণ বিপ্লবী অনেকক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীর গলায় শুধোলেন, আমার সঙ্গে 'অপারেশনে' যেতে পারবি আজ রাতে? ভয় পাবি না ত?

একেবারে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে যদি বলা যেত তাহলেই বুঝি চন্দনের মনের কথাটা কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হত। কিন্তু সে তার কিছুই করতে পারলে না। শুধু মাথা নেড়ে নীরবে সম্মতি জানালে।

গভীর রাত্রে ওরা কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে রওনা হল। এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ী ডাকাতি করতে হবে। প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে। তাই দিয়ে বিদেশ থেকে বন্দুক আমদানী করতে হবে। বন্দুক না হলে লাল-মুখোদের এদেশ থেকে তাড়ানো যাবে না।

খাল পেরিয়ে নৌকো এক অন্ধকার পল্লীর ভেতর ঢুকে পড়ল। চন্দনের ওপর ভার পড়েছিল দেয়াল টপকে অথবা গাছ বেয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়া, তারপর সদর দরজা খুলে দেয়া।

বাদবাকি কাজ প্রবীণ বিপ্লবীর নির্দেশে তরুণ বিপ্লবীদল সমাধা করবে।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি সুরু হয়েছিল। প্রাচীরের এ পাশে অনেক বড় বড় গাছ। কিন্তু উঠতে গিয়ে চন্দন বুঝলে গাছের গা পিছল হয়ে গেছে। কিন্তু একটা দায়িত্ব নিয়ে এখন আর পিছু হটবার উপায় নেই। যে করেই হোক কাজ হাসিল করতেই হবে। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে—গাছে চড়া বিলক্ষণ জানে। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে পা পিছলে যাচ্ছে। অতি সাবধানে আরো উপরের ডালে চড়তে হচ্ছে। হঠাৎ কোটরে কি যেন ফোঁস করে উঠল।

কি সর্বনাশ, সাপ নাকি! একটু থমকে দাঁড়ালো চন্দন। ইতিমধ্যে সাপটা বেরিয়ে এসে ফণা তুলেছে। চন্দন তাকিয়ে দেখলে, ওর পায়ের কাছ থেকে সাপটা খুব বেশী দূরে নয়। যদি একবার ছোবল দিতে পারে—তাহলেই নিশ্চয় মরণ।

কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিকে হারায় নি চন্দন। ওর কোমরে ছিল গোঁজা একটি ছুরি—আত্মরক্ষার জন্য। মুহূর্ত মধ্যে সেই ছুরি একেবারে সাপের ফণাতে গেঁথে দিলে। সাপটা ঝপ করে নীচে পড়ে গেল। তখন চন্দন ধীরে ধীরে গাছের

ডাল ছেড়ে উঁচু প্রাচীরের ওপর উঠল। সেই প্রাচীর বেয়ে বেয়ে একেবারে ভেতরের ফটকের কাছে গিয়ে হাজির হল। সেই ফটকের গায় অনেকগুলি কাঠের খিলের মতো ছিল। তার ওপর পা রেখে অতি সাবধানে চন্দন নীচে লাফিয়ে পড়ল।

তখন দরজা খুলে দেয়া ওর পক্ষে আর অসুবিধে হল না। সদর দরজা খুলেই সে একেবারে বাঁশী বাজিয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি মশাল জ্বলে উঠল।

বাড়ীর দরোয়ানগুলো যে প্রাণের ভয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ল—আর তাদের কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

তরুণ বিপ্লবীদলকে নিয়ে প্রবীণ বিপ্লবী দোতলায় হাজির হয়ে গৃহকর্তাকে বললেন, কোনো গোলমাল করবেন না। আমরা কারো ওপর কোনো অত্যাচার করবো না। মেয়েরা আর শিশুরা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তাদের দিকে আমরা ফিরেও তাকাবো না। আপনি শুধু সিন্দুকটা দেখিয়ে দিন। আমাদের অর্থের বড় প্রয়োজন। গৃহস্বামী যে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছেন, সেটা বুঝতে পারলেন। ঘরের ভেতর গিয়ে ইঙ্গিতে শুধু সিন্দুকটা দেখিয়ে দিলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে তালা ভাঙার যন্ত্র ছিল। তারা অতি সহজেই সিন্দুক খুলে রাশি রাশি নগদ টাকা আর পুরোণো দিনের অলঙ্কার নিয়ে নিঃশব্দে চলে এলো। বিনা রক্তপাতে কাজ সমাধা হল। প্রধান বিপ্লবী বললেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের কাছ থেকে দুঃসময়ে চাঁদা নিলাম। আশা করি পুলিশে খবর দেবেন না।

এই স্বদেশী ডাকাতির খবর ফলাও করে ইংরেজী ও বাংলা কাগজে ছাপা হল। কিন্তু পুলিশ কোনো সন্ধান করতে পারলে না।

স্বদেশী আন্দোলন ওদিকে উত্তাল হয়ে ওঠে।

মদের দোকানে পিকেটিং—বিলাতি নুনের গোলা ধ্বংস—বিদেশী বস্ত্র নিয়ে বহ্ন্যুৎসব আর স্বদেশী গানের উত্তাল তরঙ্গ ক্রমাগত বেড়ে চলল।

ওদিকে সরকার থেকে ঘোষণা করা হল—বঙ্গভঙ্গ কিছুতেই রদ করা হবে না। Settled fact will not be unsettled!

দেশের নেতারা ঘোষণা করলেন, বুকের রক্ত দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হবে। বিদেশী শাসককে বাংলা-মায়ের বুকে ছুরি চালাতে দেয়া হবে না।

এখানে ওখানে বিপ্লবী দল লালমুখোদের প্রাণ সংহার করতে থাকলো।

লালমুখোদের মধ্যেও আতঙ্ক দেখা গেল। অনেকে প্রাণের ভয়ে দেশে চলে যেতে লাগল।

বাংলার বিপ্লবীদল তখন একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা প্রাণপণ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ঢাকা শহর স্বদেশী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

এমনি সময় একদিন গভীর রাত্রে প্রবীণ বিপ্লবী পুলিন দাস চন্দনকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমাকে একটা খুব গোপনীয় কাজে কলকাতা পাঠাতে চাই।

কলকাতা!

উত্তেজনা আনন্দ ও বিস্ময়ে চন্দন প্রবীণ বিপ্লবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কলকাতা সে, জীবনে দেখেনি। কিন্তু ওইখানেই ত' বাঙলার—বাঙালীর প্রাণ-স্পন্দন। দেশের নেতারা সব ওখানে—অরবিন্দ, পি, মিত্র, বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ—আর বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ত' ওখানেই! সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থানে কি সে পৌছুতে পারবে?

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চন্দন। প্রবীণ বিপ্লবীর প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারল না।

প্রবীণ বিপ্লবী আবার ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, পি, মিত্রের নাম শুনেছ কখনো?

চন্দনের ধমনীতে যেন বিদ্যুৎ-চমক!

বিপ্লবের সেই মহানায়ক—যিনি সর্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বিপ্লব-বহ্নি জ্বালিয়ে রেখেছেন?

চন্দন শুধু মাথা নাড়লে।

প্রবীণ বিপ্লবী বললেন, সেই পি, মিত্রের কাছে একটি গোপন চিঠি নিয়ে যেতে হবে। আমি চাই একটি অচেনা লোক গিয়ে তাঁর হাতে চিঠিখানি পৌছে দিক। অবশ্য তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, প্রশান্তকে তোমার সঙ্গে পাঠাবো। সে কলকাতা বহুবার গেছে, রাস্তাঘাট সব চেনে। সেই তোমার পথের সাথী হবে।

প্রবীণ বিপ্লবীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চন্দন আর প্রশান্ত একদিন ঢাকা থেকে নৌকো ভাসিয়ে দিলে—রাজধানী কলকাতার উদ্দেশে—

পথে যেতে যেতে বাংলাদেশকে দু'চোখ ভরে দেখলে চন্দন। এই সুজলা-

সুফলা-শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ তাদের মাতৃভূমি। কিন্তু বাংলা-মায়ের বুকের ওপর বিদেশী শাসক তার শক্ত বুটের জুতো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আবার বাংলা-মায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে তাকে দু'ভাগে ভাগ করে দেবে—বিদেশী শয়তান!

এই অপমৃত্যুর হাত থেকে বাংলা-মাকে বাঁচাতেই হবে।

মনে মনে চন্দন সঙ্কল্প করল।

পথে যেতে যেতে ওরা দেখলে,—একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের বহ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে—অপর দিকে পুলিশের নির্মম অত্যাচার বাংলার নিরীহ মানুষদের টুঁটি টিপে ধরেছে। নিজ বাসভূমে তারা পরবাসী হয়ে যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্ব মুহূর্তে অন্তিম আর্তনাদ করছে। অবশেষে ভাগীরথীর বুকে গিয়ে তারা উপস্থিত হল। কিন্তু গঙ্গার তীরে তীরে আজ কিসের কোলাহল? সারা কলকাতা শহরের মানুষ কি আজ গঙ্গা-তীরে এসে সমবেত হয়েছে?

প্রশান্ত বললে, হঁ্যা, মনে পড়েছে, আজ ৩০শে আশ্বিন।

—৩০শে আশ্বিন?

—আজ বঙ্গভঙ্গের দিন। দেখতে পাচ্ছিস নে চন্দন, হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী মানুষ আজ নিশান উড়িয়ে অনশনে থেকে গঙ্গাস্নানে এসেছে? আজ যে দেশের কবি অরন্ধন ঘোষণা করেছেন। চল, আমরা তীরে নেমে পড়ি—

প্রশান্ত বললে, চল এগিয়ে যাই—

—দেখতে পাচ্ছিসনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দলবল নিয়ে গান গাইতে গাইতে এই দিকেই এগিয়ে আসছেন।

ওদের কণ্ঠে গান ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

"বাংলার মাটি বাংলার জল—
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।"

কবি যাকে হাতের কাছে পাচ্ছেন নিজের হাতে রাখী পরিয়ে দিচ্ছেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চন্দন এগিয়ে গেল কবির সামনে। কবি বললেন, এসো কিশোর ভাই, আমি তোমার হাতে রাখী পরিয়ে দিই—

কবির হাতের রাখী-বন্ধনের পরশ পেয়ে চন্দনের মনে হল, বাংলা মায়ের বুকের ক্ষত শীতল চন্দন প্রলেপে একেবারে নিরাময় হয়ে গেছে, শান্তির বারি সিঞ্চন করছে কে প্রাণে প্রাণে !

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলে, সেখানে প্রভাতের রবির কিরণ ঢেউয়ের ওপর চিক্‌মিক্ করে জ্বলে উঠেছে।

চন্দন দু' হাত জোড় করে জীবন-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালো।

এই-তো চাই—

শ্রীহাসিরাশি দেবী

তাক্-ডুমা-ডুম—তাক
সোঁদরবনের বাঘ,
এবার খেয়ে মিষ্টি জল—ঐ
পেটটা ভরে রাখ।
মাথায় রেখে লম্বা টিকি
জপের মালা হাতে,
বনের মাটি চাষ ক'রে খাও
দিনে এবং রাতে।
ফসল আরও ফলবে ভাল
যদি লাঙল ধর—
দোহাই দাদা, এই কথাটা
একটু চিন্তা কর।

আপনজনা ভেবে,
তোমায় বড় আসন দিলাম
আর,—কে-ই-বা বল দেবে !
সোঁদরবনের নরম মাটি
গাছে মধুর চাক,
কিন্তু তবু পরাণ কাঁপে
শুনলে তোমার ডাক
ভাবতে পার তোমায় মনে ক'রে,-
এত দরের মিষ্টি,
তবু তোমাকে দেই ধরে !

তাক্-ডুমাডুম্ তাক্
সোঁদরবনের বাঘ,—
কুছ-পরোয়া নেইক,—যে যায়
বন থেকে সে যাক্,—
একাই তুমি থাকো,—
দেখবে,—মানুষ মন্ত্র নিতে
আসবে লাখো লাখো।
চাইবে তোমার পায়ের ধূলো,—
চাইবে আশীর্বাদ,—
মানবে তখন রক্ত ছেড়ে
মিষ্টি জলের স্বাদ।

গান ধরেছেন মামা

শ্রীশৈলেন দত্ত

মামা আমার মামা—
ভোর না হ'তে গান ধরেছেন
সা-সা-সা-রে গা-মা।
গান শুনে তার উঠি জেগে
ঘুম ভাঙাতে মরি রেগে।

দাদু হাঁকেন : ওরে রামু
দোহাই রে গান থামা ;
ভোর না হতে গান ধরেছেন
মামা আমার মামা।

মামার তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই
চলছে গলা সাধা
শুনবে না সে কোন ওজর
মানবে না সে বাধা।
কানটি চেপে মাথা নেড়ে
গাইছে মামা সা-সা-সা-রে
ধা ধা-ধা-নি, নি-সা-সা-নি
পা-পা-পা-নি পা-ধা ;

তানপুরাটা বাগিয়ে হাতে
চলছে গলা সাধা।

গানের তোড়ে দালান কাঁপে
কাঁপছে কোঠাবাড়ি
যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়
মস্ত ঘোড়ার গাড়ি।
বেরোয় আওয়াজ গলা ফুঁড়ে
চলছে যেন হৃদয় খুঁড়ে
গানটি শুনে চোখ কপালে
তোলেন বুড়ী ঠা'মা ;
খুশ মেজাজে খেয়াল শোনান
আমার গায়ক মামা।

ছড়া

শ্রীগীতা চন্দ্র

মানুষ ছিল লম্বা চওড়া
যত কাজের নিত মহড়া
বিদায় নিলেন সব।

মানুষ এলো রোগা-পটকা
কাজ করতে বাধে খট্‌কা
করবো করবো রব।

বাঁধায় গণ্ডগোল—
কার কি হবে 'রোল' ?
কাজের হলো শেষ—
নতুন পরিবেশ।



এক মুচি ও দুই দূত

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

ভিন্‌দেশী এক সদাশয় মুচির কথা শোনো। লোকটি ছিল যেমন ভালো, তেমনি ছিল সে গরীব। কোন রকমে সে দিন কাটাতো। বেশী জুতো বানাবে—এমন সঙ্গতি তার ছিল না। তবু কখনো জীবনে সে কোন রকম দোষ করে নি, নীতির বাইরের কোন কাজ করার দিকে তার মন যায় নি, লোককে ঠকানোর কথা সে কখনো ভাবতেই পারতো না।

জুতো তৈরী করার মতো খানিকটা চামড়া তার ছিল, তাই দিয়ে সে শুধু এক জোড়া জুতোই তৈরী করতে পারবে। সারাদিন ধরে চামড়াটুকু কেটে-কুটে রেখে সে গোধুলিবেলায় ভগবানের নাম নিয়ে শুয়ে পড়লো। কাল জুতো জোড়াটি সেলাই করে বাজারে নিয়ে যাবে, তা বেচে আবার সে চামড়া কিনবে, যেটুকু তার লাভ হবে—তাই দিয়ে সংসারের খরচ চলবে।

সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে জুতো জোড়া তৈরী করার জন্যে টেবিলের কাছে গিয়ে সে অবাক্ হয়ে গেল। কাল বিকেলে সে যে চামড়াটুকু কেটে-কুটে রেখেছিল, এখন দেখলে সেই কাটা চামড়া দিয়ে খুব ভালো এক জোড়া জুতো বানিয়ে তার টেবিলের ওপর কে রেখে গেছে।

কে রেখে যেতে পারে?

জুতো জোড়াটা সে ভালো করে নেড়ে-চেড়ে, ভাল করে পরখ করে দেখলে—এমন নিখুঁত সেলাই কোন নিপুণ কারিগরও করতে পারবে না, ওই কাটা চামড়া সেলাই করে যে এমন ভালো আর মজবুত জুতো হতে পারে—তা ধারণার বাইরে ছিল। সে বারবার ওই জুতোজোড়া তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করতে লাগল— কি ভালো যে হয়েছে দেখতে—

কে এই কারিগর, রাতে এসে তার ঘরে বসে এই কাজ করে গেল?

কেনবার লোক পেতে তার আর দেরী হলো না, বরং কিছু বেশী দাম-ই পাওয়া গেল; যে কিনলো, সে খুশী হয়েই বাড়তি দাম দিয়ে ঐ জুতো জোড়া নিয়ে গেল।

সে তাই দু'জোড়া জুতো বানাবার মতো চামড়া কিনতে পারলো। বাড়ী ফিরে দু'জোড়া জুতোর চামড়া কেটে রাখলো, কাল সকালে সেলাই করে বাজারে নিয়ে যাবে।

সকালে উঠে তাকে আর কাজে বসতে হলো না। টেবিলের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো যে দু'জোড়া জুতো খুব ভালোভাবে সেলাই করে কে রেখে গেছে। সেলাইয়ের একটা স্থতোও এলোমেলো অগোছালো নয়। নিপুণ কারিগরও বোধহয় এমন ধরে ধরে সেলাই করতে পারে না! ভারি মজার ঘটনা ত'!

বেশী দাম দিয়ে ওই জুতো কেনার লোকের অভাব হলো না, খুশি হয়েই লোকে নিয়ে গেল—এবং বেশী দামেই নিয়ে গেল। স্থতরাং চার জোড়া জুতো তৈরী হতে পারে সেদিন সে এমন পরিমাণ চামড়া কিনে আনলো। বিকেলে চামড়া কেটে রাখাও হলো—

পরদিন সকালে চারজোড়া জুতো টেবিলে তৈরী, পরিপাটি সেলাই, শোভন গড়ন।

এইভাবে চার জোড়া থেকে আট জোড়া, পরদিন তার ডবল, পরের দিন তার ডবল—এইভাবে সেই গরীব মুচি ধীরে ধীরে ধনী হয়ে গেল।

শীতের বহু আগে সে তার বউকে বললে—এই যে চামড়াগুলো এখন কেটে দিলাম—আজ রাতে লুকিয়ে থেকে দেখবো—কে এসে আমাদের কাজ এমন ভাবে করে দেয়। যদি তা জানতে চাও—তুমিও রাত জাগতে পারো আমার সঙ্গে।

তার বউ এক কথাতেই রাজী, কৌতূহল তারও বড় কম নয়। তারা ঘরের দরজার পাশে কোণের দিকে ঝোলানো জামা-কাপড়ের পেছনে লুকিয়ে থাকলো।

মাঝরাতে দু'টি উলঙ্গ লোক এসে সেই ঘরে ঢুকলো, কাটা চামড়া টেবিলে তুলে নিয়ে সেলাই শুরু করে দিলে, ছোট ছোট আঙুলে কি নিপুণভাবে যে সেলাই করে গেল, ছোট হাতুড়ি ঠুকে, কাঁটা পেরেক বসিয়ে—কেমন সহজে জুতো নিমেষের মধ্যে শেষ করে ফেললো—তা দেখে ত' মুচি আর মুচির বউয়ের চোখ ছানাবড়া। তারা শেষ অবধি আর দেখলো না, ঐটুকু দেখেই সেই কোণের ভেজানো দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

পরদিন সকালে মুচির বউ বললে—ঐ দু'জন আমাদের ধনী করে দিয়েছে,

অথচ বেচারীদের পরণে একটাও জামা বা কাপড় নেই। আহা! আমরা যদি ওদের কোন উপকার না করি—তবে বেইমানি করা হবে।

তার কথাটা মুচির মনে ধরলো, পরদিন সেই উলঙ্গ দু'জন কারিগরের জামা-কাপড় জুতো মোজা—সব জড়ো করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে মুচি আর মুচিবউ ঘরের কোণে ফের লুকিয়ে থাকলো দেখতে—ওই দু'জন লোক কি করে।

মাঝরাতে ওই দু'জন উলঙ্গ লোক ঘরে ঢুকলো, কাজ শুরু করার আগেই টেবিলের ওপর দেখতে পেল যে তাদের জন্তে কিছু উপহার রয়েছে। তারা গোড়ায় রীতিমত ভড়কে গেলেও পরে সেগুলো পরে খুব খুশী হলো, তারা আবার মানুষের মতো মানুষ হয়ে গেল। তাদের তখন মনে হোল—তা পোষাক পরে মানুষই যখন হয়ে ওঠা গেল—তখন আর পরের জন্য এইসব জুতো তৈরী করা কেন?

নাচতে নাচতে তারা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পর থেকে তারা আর সেই মুচির ঘরে কোনদিন আসে নি। মুচিকেও আর কখনো অভাবে পড়তে হয় নি। যতদিন সে বেঁচেছিল, বেশ সুখেই সংসার চালিয়ে দিন গুজরান করেছে।

* বিদেশী গল্পের কাঠামো।

আড়ি-ভাবের ছড়া

শ্রীসুচেতা মিত্র

আড়ি আড়ি আড়ি
ভাব নিবি না গাড়ি?
গাড়ি নিয়ে আড়ি করে
মুখখানা তোর হাঁড়ি।

চলতে গিয়ে মাঝ-পথে তোর
উল্টে যাবে গাড়ি
পায়ে হেঁটে বোকার মতো
ফিরে আসিস বাড়ি।

ভাব ভাব ভাব
নেয়াপাতি ভাব
গরমকালে পাখার হাওয়ায়
বাদশাহী হাবভাব।

গ্রীষ্ম ও বর্ষা

শ্রীসুশীল রায়

যখন-তখন দুঃখ করা সাধ্য আমার নয়
হঠাৎ যদি কষ্ট আসে কিসের তবে ভয় ?
দিনের বেলা, রাত্রিবেলা
এটা চিরদিনের খেলা,
আঁধার নেমে এলো তবে কেন রে সংশয় ?

আজ এসেছে নতুন বছর, এসেছে বৈশাখ,
হাওয়ায় আগুন উড়ছে বলে হব না অবাক্‌ ।
দুর্দিন যে বলবে এ'কে
থাকব দূরে তাদের থেকে
মৌমাছিদের হুল আছে তাই ছাড়ব কি মৌচাক ?

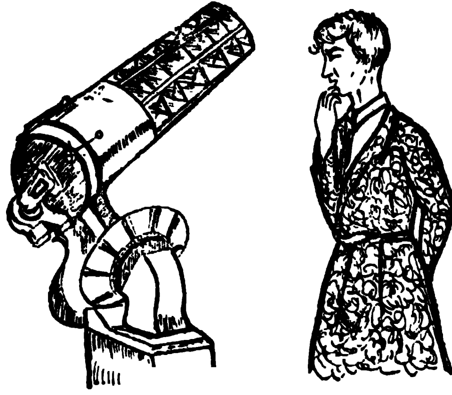
খালবিলেরা শুকিয়ে গিয়ে হয়েছে চৌচির,
সব ফুরাল বলেই হতে হবে কি অস্থির ?
এই ক'টা দিন গত হলে
নতুন জলে স্বচ্ছ জলে
পূর্ণ হয়ে উঠবে সবই, সব হবে গভীর ।

আগুন দিয়েই পুড়িয়ে সোনা করতে যে হয় খাঁটি,
সোনার ভুবন করতে হবে তেমনি পরিপাটি ।
তাই আগুনের মতন গরম
লাগুক সহ্যাতীত রকম
আমরা খাঁটি হব, খাঁটি হবে দেশের মাটি ।

কেবল হিমের হাওয়া হলে [illegible]-যে সে একঘেয়ে
নানারকম ঋতু অনেক ভালো যে তার চেয়ে ।
বৈশাখের এ প্রচণ্ড রোদ
সুদ-আসলে দেবেই সে শোধ,
নতুন মেঘের উদয় দেখে বলব—'কে এ, কে এ !'

নানারকম যে জঞ্জালে ভরেছে [illegible] বিশ্ব
তার জন্যে আমরা ভাবি হলেম বুঝি নিঃস্ব ।
সেসব জীর্ণ আবর্জনা
পুড়িয়ে চাই নিখাদ সোনা,
প্রবল প্রতাপ সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাই গ্রীষ্ম ।

সব বেদনা অবসানের আছেই আছে ভরসা
অঝোর স্নেহধারা নিয়ে আসবে বিপুল বর্ষা ।



ফুটোস্কোপ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সকালবেলা কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা খবরের দিকে চোখ পড়ায় চমকে উঠলাম। খবরটা এই রকম :

নতুন ভূমিকায় চট্টখণ্ডী

(নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট)

এককালের বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডক্টর স্বভ্রাট চট্টখণ্ডী, যিনি নাকি কিছুদিন আগে মানসিক স্থিরতা হারিয়ে ফেলেছেন বলে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁকে সম্প্রতি এক নতুন ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। জন কয়েক সমাজ-বিরোধী গুণ্ডাশ্রেণীর যুবকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই যুবকদের যখন তখন তাঁর তথাকথিত 'চেম্বারে' হাজির হতে দেখা যায় এবং তিনি নাকি তাদের প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করে থাকেন। এই অসম আঁতাতে কোন্ পক্ষের ভূমিকা বেশি তা যদিও জানা যায় নি কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় এটিকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখবেন। আমরা মহামান্য সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্বভ্রাট আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। সেই নিচের ক্লাস থেকে সুরু করে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে পড়েছি, অসম্ভব বুদ্ধিমান আর তুখোড় ছেলে। তেমনি অসম্ভব খামখেয়ালীও বলা চলে; সেই ছেলেবেলা থেকেই

ওর ছোট্ট মাথায় যে কত রকম উদ্ভট চিন্তা গিজগিজ করত তা নিয়ে আমরা কত হাসাগাসিই না করেছি!

আই. এস্‌সি. পাস করে ও ডাক্তারী পড়ার জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হ'ল, আমি আই. এ. পাস করে চলে গেলাম লখ্‌নৌ। সেখানে আমার মামা ইতিহাসের অধ্যাপক। ঐতিহাসিক হবার সাধ আমারও।

দেখাসাক্ষাৎ কমে এল। ডাক্তারী পাস করে ও চলে গেল বিলেত, আমি ইতিহাসের একটা অধ্যাপকের কাজ জুটিয়ে নিয়ে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত মহিমা খুঁজে বার করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। ভাঙা মূর্তি আর শিলালিপির খোঁজে চষে বেড়াতে লাগলাম এখানে সেখানে।

দেখা হ'ল বহু বছর পরে। তখন আমরা দু'জনেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে কিছুটা নাম করেছি। সুভ্রাট তখন শহরের একজন প্রথম শ্রেণীর অস্ত্র-চিকিৎসক। লোকে বলত, ও ছুরি ধরলে যমদূতরাও পালাতে পথ পায় না। কিন্তু হলে কি হবে, ওর সেই ছেলেবেলার খামখেয়ালিপনা মোটেই যায় নি, অস্ত্র-চিকিৎসার নাম করে সে মাঝে মাঝে এমন সব বিপজ্জনক কাজ করে বসত যে, শেষে ওর নামে নানা অভিযোগ শোনা যেতে লাগল—ওর নাকি একটু একটু মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এরকম লোককে, আর যাই হোক, চিকিৎসার মতো জীবন-মরণ সমস্যার কাজে রাখা নিরাপদ নয়। কর্তৃপক্ষ তাই ওকে সরকারী কাজ থেকে ইস্তফা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করলেন এবং শেষে ও-ই একদিন 'ধুস্‌' বলে পদত্যাগ পত্র পেশ করে দিল।

বালীগঞ্জে সুভ্রাটের বিরাট বাড়ী। সামনের ঘরেই কাউণ্টারের ভেতর নার্সের পোষাক পরা একটি মেয়ে বসে আছে। যেতেই সে একটা স্লিপ এগিয়ে দিল নামটা লিখে দেবার জন্য।

মিনিট খানেক পরেই সে ফিরে এল। সাহেব ডাকছেন।

সুভ্রাটের ঘরে তখন দু'-তিনটি তথাকথিত তরুণ বসেছিল। তিনটি ছেলেই চেহারায়, পোষাক-আশাকে যাদের আমরা পাড়ার মস্তান বলে থাকি—ঠিক তাই। তাদের সামনে খাবারের প্লেট সাজানো, পাশে চা-ভর্তি পেয়ালা।

ঢুকতেই আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সুভ্রাট ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল, তারপর মস্তানদের সঙ্গে ফের তার কথাবার্তা চলতে লাগল।

আমার ধৈর্য যখন প্রায় শেষ সীমায় তখন ছোকরা তিনটি উঠে পড়ল। সুভ্রাট উঠে দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এল।

এইবার সে আমার সঙ্গে কথা বলার ফুরসৎ পেল।

"তারপর? হঠাৎ কি মনে করে?"

"এলাম তোদের হালচাল দেখতে। কাগজে লিখেছে কিনা!"

"কাগজ!"—সুভ্রাট অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়ে তুলল।—"নো ওয়ার্ক, ক্রাই খই: নেই কাজ, খই ভাজ। খই-এর ইংরেজি কি রে?

"খই ভেজে যে অন্যায় করে নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তোকে এই সব মস্তানদের সাকরেদ বলে ভাবা যায় না।"

সুভ্রাট সে কথার জবাব দিল না। মিটিমিটি হাসতে হাসতে শুধু বলল, "চা খাবি?"

"না।"

"চা খাবি না? তবে কফিই আনতে বলি।"

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই সে চাকরকে ডেকে দু' কাপ কফি পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে বলল, "চল্, আমার চেম্বারে গিয়ে বসি।"

চেম্বার দেখে মনে হ'ল ওটাকে চেম্বার না বলে কোন আধুনিক বিজ্ঞানীর সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী বললেই ঠিক বলা হয়। চারদিকে নানা রকম যন্ত্রপাতি সাজানো। দেয়ালে নানা রকম চার্ট, নক্সা ইত্যাদি ঝুলছে। একপাশে কতকগুলো শিশিবোতল, ইন্‌জেক্‌শনের সরঞ্জাম, আরও নানারকম সার্জারির অস্ত্রশস্ত্র। একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রও দেখলাম। অনেকটা মাইক্রোস্কোপ আর টেলিস্কোপের মাঝামাঝি দেখতে। ভারি কৌতূহল হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা আবার কি?"

সুভ্রাট মুচকি হেসে বলল, "ফুটোস্কোপ।"

"তার মানে?"

"কেন, পড়িস নি সুকুমার রায়ের কবিতা?

আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে,
কবিতা দেখি কত ভেজালের মেকি, আছে তোর মগজের ঘিয়ে।"

সত্যিই এটা ফুটোস্কোপ। এর সাহায্যে আমি মানুষের মাথার খুলির ভেতরটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাই। কোথায় আছে মোটর এরিয়া, বাংলায় যার নাম দেওয়া হয়েছে গুরুমস্তিষ্ক, কোথায় আছে সেন্‌সরী এরিয়া যা নাকি

আছে ওর পেছন দিকে। তুই তো জানিস, আমাদের সব নার্ভ অর্থাৎ স্নায়ুর আসল কেন্দ্র হচ্ছে এই মস্তিষ্ক বা মগজ। আমাদের শরীরের কোথায় কি কাজ হবে, কি কাজ হচ্ছে এবং কি কাজ করতে হবে সবই ঠিক করে দিচ্ছে এই মগজ।"

বাধা দিয়ে বললাম, "না রে বাবা, ও-সবের কোন খবর-টবর আমি রাখি নে।"

"তা রাখবি কেন? যত সব অকাজ নিয়ে পড়ে আছিস! আজকের দিনের শেষ কথা হচ্ছে বিজ্ঞান। কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে! কোথায় তা নিয়ে মাথা ঘামাবি, তা না যত্ত সব…"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, সুভ্রাট থামিয়ে দিয়ে বলল, নে, কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আগে খেয়ে নে। মগজটা তাজা-তাজা লাগবে।"

কফি খেয়ে সত্যি মগজ না হলেও মেজাজটা একটু তাজা-তাজা লাগল। বললাম, "এ অদ্ভুত যন্ত্র কোথায় পেলি?"

"পেয়েছি কি আর? মাথা খাটিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছি। দশ বছর লেগেছে এটি বার করতে।" বলেই সুভ্রাট আবার সুর করে আওড়াতে লাগল: "কোন্ দিকে বুদ্ধিটা খেলে, কোন্ দিকে থেকে যায় চাপা,
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠক্‌ঠকে ফাঁপা!"

নাঃ, আমার আবার মনে হ'ল কাগজওয়ালারা বাজে কথা লেখবার লোক নয়, এত বড় ডাক্তারটা সত্যি পাগল হয়ে গেছে।

অগত্যা অন্য কথা পাড়লাম। মামুলি গল্প সেরে খানিকক্ষণ বাদে উঠে এলাম।

কয়েকদিন পরে কাগজে আবার দেখি একটা জোর খবর। না, সুভ্রাট সম্বন্ধে নয়। খবরটা জো ডিম্বো সম্বন্ধে। জো ডিম্বো একজন নিগ্রো কুস্তিগীর। ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ন না হলেও তারই সমগোত্রীয়। সে নাকি এবার কলকাতায় আসছে। এদেশের বাঘা বাঘা কুস্তিগীরদের সঙ্গে লড়বে সে। লম্বায় সাত ফুট, ওজনে প্রায় পাঁচ মণ। ছেলেবেলায় গামা, গুংগা, ইমাম বক্স, গোবর বাবু—এঁদের কুস্তি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল; কিন্তু ইদানীং সে ধরণের বড় কোনও কুস্তিগীরের লড়াই দেখার সৌভাগ্য হয় নি। জো ডিম্বো আসছে শুনে তাই ঠিক করলাম, যে ভাবেই হোক ওর লড়াই দেখতেই হবে।

তবে শুনেছি লোকটা নাকি ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। কুস্তিটাকে খেলা হিসাবে ও দেখে না, অর্থাৎ লড়াই-এর ফলে যদি বিপক্ষের প্রাণহানি ঘটে যায় তা হলেও কোনও পরোয়া করে না। একবার সত্যি তাই হয়েছিল। যার সঙ্গে ওর কুস্তি হ'ল লড়াই-এর আধ ঘণ্টা পরেই সে মারা গেল। এ নিয়ে জো ভিম্বো একটু মুশ্‌কিলেই পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত মৃত লোকটির হার্ট খারাপ ছিল এই রকম একটা, 'বেনিফিট্ অব্ ডাউট্'-এর অজুহাতে ও ছাড়া পায়। আর একবার কুস্তি লড়তে গিয়ে ও প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল বলেও শুনেছি।

হু-হু করে টিকিট বিক্রি হতে লাগল। পাঁচ টাকা দশ টাকার টিকিট লাইন দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আমি বহু কষ্টে পঁচিশ টাকা দিয়ে একটা দশ টাকার টিকিট যোগাড় করলাম—তাও খেলার এক সপ্তাহ আগে।

কিন্তু খেলার তিনদিন আগে আবার এক বিস্ময়কর খবর বেরোল, জো ভিম্বোকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতায় একটা নামী হোটেলে ও উঠেছিল এবং নিত্যকার অভ্যাসমত রাতে একটু বেশি মদটদ খেয়ে শুয়েছিল। হয়তো সেদিনকার মদের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে থাকবে। ভোর রাত্রে উঠে দেখা গেল ওর ঘর খোলা। পালোয়ান বাবাজীর নো পাত্তা। কোথায় গেল? খোঁজ খোঁজ খোঁজ।

একদিকে খেলার টিকিট সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। পুলিশ চারদিক চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু না, কোন খোঁজ নেই জো ভিম্বোর!

অবশেষে খেলার নির্দিষ্ট দিন ভোরবেলা ওকে আবিষ্কার করা গেল। গঙ্গার ধারে একটা গাছের নিচে বসে আপন মনে চুরুট ফুঁকছিলেন বাবু!

হাজার হাজার দর্শকের সঙ্গে আমিও বসে আছি। যথা সময়ে জো ভিম্বো মঞ্চে এসে ঢুকল। ওর সঙ্গে প্রথম লড়বে বেনারসের বিখ্যাত পালোয়ান শিউশরণ তেওয়ারী। মস্ত বড় নামী কুস্তিগীর। সমস্ত মাথা কামানো, শুধু মাঝখানে, ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপর একটিপ নস্যির মত ছোট্ট একটুকু চুলের আভাস। সেটি ওর টিকি, যা ওকে অবশ্যই রাখতে হবে।

কিন্তু জো ভিম্বোর চেহারা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। এতদিন শুনে এসেছি এই লোকটি শুধু চেহারায়ই কুৎসিত নয়,—স্বভাবেও অতি বদমেজাজী

এবং তার চেয়েও বেশি হিংস্র। কিন্তু এখন দেখি একেবারে উল্টো। না, চেহারা কুৎসিতই, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মেজাজটা ভীষণ আমুদে। কথায় কথায় হেসে উঠছে, শিউশরণকে মঞ্চে উঠতে দেখেই ও পরম আনন্দে এগিয়ে গিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ড শেক্ করবার জন্য।

যথা সময়ে ঘণ্টা বাজল, হুইস্‌ল পড়ল, শুরু হ'ল কুস্তি। কিন্তু এ কি! কুস্তি লড়বে কে? জো ডিম্বো হেসেই কূল পায় না ফুর্তিতে এতই ডগোমগো! শিউশরণ যত তেড়ে আসে ও ততই পিছিয়ে যায় আর হাত নেড়ে এমন ভাব দেখায় যাকে বলা যায়—"না ভাই, আমাকে লড়তে ব'লো না।"

হাজার হাজার দর্শক দেখে সবাই থ।

এ অবস্থায় যা হবার তাই হ'ল। শিউশরণ লড়বেই। জিতলে সে একটা খুব মোটা টাকা পাবে। তাই মিনিট খানেকের মধ্যেই সে জো ডিম্বোকে তুলে চিৎ করে দিল। অত বড় ভারী দেহটা তুলতে যতটা সময় লাগে ততটুকুই সময় লাগল তার। আর মজা, চিৎ হয়েও জো ডিম্বোর লজ্জা নেই। তখনও সে বোকার মত ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করে হাসছে।

হঠাৎ একটু দূরে আর একটা অট্টহাসি শুনে চমকে ফিরে দেখি আমাদের অদূরে বসে আছে সুভ্রাট। হেসে গড়িয়ে পড়ছে সেও। আর তার পাশে সেই তিন মস্তান। তারাও সমানে হাসছে।

যাই হোক, মল্লযুদ্ধের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা কখনও শোনা যায় নি। আমার না হয় পঁচিশটা টাকা জলে গেল, কিন্তু জো ডিম্বোকে যারা এনেছিল বহু টাকা খরচ করে তারা তো রাম খাপ্পা' হবেই। সেই রাত্রেই তাকে দম্‌দম্ এয়ার পোর্টে নিয়ে গিয়ে প্লেনে রওনা করিয়ে দিয়ে আসা হ'ল। প্লেনে উঠেও নাকি জো ডিম্বোর মনে কোন রকম অনুশোচনা দেখা যায়নি, সে নাকি তেমনি ফুর্তির সঙ্গেই শিস দিতে দিতে গিয়ে বসেছিল তার সিটে।

এই ঘটনার পর মাসখানেক কেটে গেছে, লোকে আস্তে আস্তে সব ভুলে গেছে, এমন সময় আবার কাগজে দেখা গেল এক রগরগে বিজ্ঞাপন। কি, না কলম্বাস্ কলকাতায় আসছে। কে কলম্বাস? ইতিহাসের বিখ্যাত আবিষ্কারক ক্রিস্টোফর্ কলম্বাস তো কয়েক শ' বছর আগের লোক! ক্রিস্টোফর নয়, গঞ্জালেস কলম্বাস—যে নাকি এখন স্পেনের সবচেয়ে নামকরা বুল্ ফাইটার।

বুল্ ফাইট্—ক্ষেপা ষাঁড়ের সামনে মানুষের একা দাঁড়িয়ে হাতাহাতি লড়াই স্পেনের জাতীয় খেলা—বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং এখনও চলে।

বুল ফাইটের গল্প অনেক পড়েছি বইয়ে, কিন্তু এদেশে ও জিনিস কখনও চাক্ষুষ দেখি নি। কলম্বাস সেই খেলা দেখাবে কলকাতার স্টেডিয়ামে। আবার সেই টিকিটের জন্যে লাইন। অনেক ধরাধরি করে শেষে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে একটা কম দামী টিকিট যোগাড় হ'ল। তাই সই।

আশ্চর্য খেলা! কল্পনাই করা যায় না। স্টেডিয়ামের একদিকে একটা বিরাট ষাঁড় দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে মাটিতে শিং ঘষছে আর নাক দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ করছে। ষাঁড়টার অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে কলম্বাস। তার কোমরের কাছে একটা টুকটুকে লাল তোয়ালে জড়ানো। একহাতে একটা চটের বস্তা, অন্য হাতে একটা বড় ছোরা।

শুনেছি লাল রং দেখলে গরু-মোষরা দারুণ ক্ষেপে যায়। এক্ষেত্রেও তাই দেখলাম। হঠাৎ ষাঁড়টা তীরবেগে ছুটে এসে আক্রমণ করল কলম্বাসকে। কলম্বাস চটের বস্তাটা ষাঁড়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে চকিতে পাশে ঘুরে গেল। ষাঁড়টা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল মাটিতে। কিন্তু না, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়েছে সে। কলম্বাস কিন্তু এই ফাঁকে আবার অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর ষাঁড়টার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বস্তাটা বাগিয়ে ধরে। ষাঁড় আবার তেড়ে এল, আবার সেই রকম পাশ কাটিয়ে ওকে এড়িয়ে গেল কলম্বাস, আবার হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল ষাঁড়।

এই রকম চলল খানিকক্ষণ। মনে হ'ল ষাঁড়টা এবারে বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবু শেষ বারের মত সে আর একবার তেড়ে এল, কিন্তু এবার তার গতিতে ক্ষিপ্রতা যেন কম। কলম্বাস সে সুযোগ নিতে দেরি করল না। ষাঁড়টা চটের থলির উপর এসে পড়তেই সে ঘ্যাচ করে ছোরাটা তার পিঠে আমূল বসিয়ে দিল। ষাঁড়টা টলতে টলতে বসে পড়ল।

একটা পা শায়িত ষাঁড়ের গায়ে বাড়িয়ে দিয়ে কলম্বাস কোমরের লাল তোয়ালেটা খুলে নিশানের মত দোলাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চটাপট্ হাততালি আর বিপুল হর্ষধ্বনিতে সমস্ত স্টেডিয়াম যেন ফেটে পড়ল।

চেঁচামেচি, হৈ-চৈ থামলে সবাই অবাক্ হয়ে দেখে দর্শকের মধ্যে থেকে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলছে। তাকিয়ে দেখি আর কেউ নয়, স্বয়ং ডাক্তার সুভ্রাট চট্টখণ্ডী।

তারপর যা ঘটল তা অভাবনীয়। সমস্ত জনতাকে চমকিত করে সুভ্রাট বলল, এ রকম বুল ফাইট সেও দেখাতে পারে। যে-কোনো পাগলা ষাঁড়ের

সঙ্গে সেও লড়তে প্রস্তুত এবং আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে এ খেলা সেও দেখাবে। এই স্টেডিয়ামেই!

যারা ওকে চিনত তারা হেসে উড়িয়ে দিল—পাগলা ডাক্তারের এ আর এক পাগলামি। কিন্তু কলম্বাস গম্ভীরভাবে বলল, "বেশ, আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। যদি পারেন, আমার সমস্ত পারিশ্রমিকের টাকা ফেরত দিয়ে দেব।"

"বেশ, কোন্ ষাঁড়টার সঙ্গে লড়তে হবে আপনিই না হয় ঠিক করে দিন।"

একটা খোঁয়াড়ে অনেকগুলি অতিকায় জোয়ান ষাঁড় আটকানো ছিল। কলম্বাস এগিয়ে গিয়ে সবচেয়ে বদরাগী যেটা সেটাকে দেখিয়ে বলল, "এইটির সঙ্গে আপনি লড়বেন।"

এক সপ্তাহ পরের কথা। স্টেডিয়াম সেদিন লোকে লোকারণ্য। আগের দিনের চেয়েও ভিড় বেশি। এবার আর আমি টিকিট সংগ্রহ করতে পারি নি। কিন্তু সুভ্রাটই একটা কমপ্লিমেণ্টারি টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে।

সন্ধ্যার দিকে সুভ্রাট সেজেগুজে স্টেডিয়ামে ঢুকল। ইচ্ছে করেই সে আজ একটা কোঁচানো ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে এসেছে। তবে কোমরে কলম্বাসের মতই একটা লাল তোয়ালে জড়িয়েছে—হয়তো ষাঁড়টাকে উত্তেজিত করার জন্য। তবে হাতে তার ছোরাটোরা কিছু নেই—আছে শুধু একটা ছোট চটের বস্তা। বাজার-করা থলির মতই ছোট সেটা। কলম্বাসের বস্তার চাইতে অনেক ছোট তো বটেই!

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছি। সবচেয়ে বদমেজাজী ষাঁড়টি রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে সুভ্রাটের মুখোমুখি।

কিন্তু কই, সুভ্রাটকে আক্রমণের জন্য তো তেড়ে আসছে না ষাঁড়টা! বরঞ্চ সুভ্রাটই পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে।

একটু পরে আরও আশ্চর্য কাণ্ড! সুভ্রাট বাঁ-হাতে চটের থলিটা পাশে ঝুলিয়ে রেখে ষাঁড়টার ঘাড়ে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে সুরু করল। আর ষাঁড়টা, গোঁয়ার্তুমি করা দূরে থাক, পোষা কুকুরের মত মাথা নিচু করে যেন ওর আদর কাড়তে লাগল।

সুভ্রাট চেঁচিয়ে বলল, "এই, লড়বি না? আয়! আয়!"

কিন্তু ষাঁড় নির্বিকার। কোথায় গেছে তার বদমেজাজ! একেবারে লজ্জানত নতুন বৌয়ের মতো মাথা নিচু করে সেই যে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই!

"দেখুন, ষাঁড় বলছে ও লড়াই করবে না। তার মানে ও স্বেচ্ছায় হার স্বীকার করে নিচ্ছে, তাই না? তা আমি আর কি করব?"—ষাঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাসতে হাসতে ঘোষণা করল সুভ্রাট।—"একটা বরঞ্চ ফটো তুলে নিন আপনারা। আর মিস্টার কলম্বাস্, লড়াই যখন হ'লই না তখন আপনার পারিশ্রমিকের টাকা আর ফেরত দেবার প্রশ্নই উঠছে না। ও টাকা আপনারই প্রাপ্য, ও আপনি নিয়ে যান।"

স্টেডিয়াম শুদ্ধ লোক দেখেশুনে থ'।

পরদিন ভোর না হতেই ছুটলাম সুভ্রাটের কাছে। এ অদ্ভুত রহস্যের সমাধান চাই-ই।

সুভ্রাট আজও সেই মস্তানদের নিয়ে বসে বসে কফি খাচ্ছিল, হ্যাঁ, চেম্বারেই। আমায় দেখে আর এক পেয়ালার হুকুম দিয়ে বলল, "বোস্।"

ছোকরা তিনটি হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল।—"আজ আসি তবে স্যার!"

"হ্যাঁ, এস।"

ওরা চলে গেলে বললাম, "জানিস নিশ্চয়ই কেন এসেছি। বাজে কথা না বলে ভালো কার বুঝিয়ে দে তো রহস্যটা।"

সুভ্রাট সেই যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বলল, "সব রহস্যের মূলে রয়েছে এই যন্ত্রটি—যার নাম আমি আদর করে দিয়েছি ফুটোস্কোপ। সব যন্ত্রপাতিরই ইংরেজি নাম হবে কেন, দু'একটার দিশী নামও থাক। বিশেষ করে অত বড় গুণী লোকের দেওয়া নাম!"

"ও সব হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বল্!"

"বলব বইকি! তবে সংক্ষেপে বলব কিন্তু।"

তারপর সুভ্রাট সংক্ষেপেই সমস্ত ব্যাপারটা এইভাবে বুঝিয়ে দিল:

"তুই হয় তো শুনে থাকবি, বহুদিন থেকে এই মগজ নিয়ে আমি রিসার্চ করছি। আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে মগজ বা মস্তিষ্ক। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র বলা যায় এটিকে। আমাদের দেহের কোথায় কি কাজ হবে, কি কাজ হচ্ছে এবং কি কাজ করতে হবে সবই ঠিক করে এই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে দুটি ভাগ,—একটিকে বলা হয় সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক, আর একটিকে বলে সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্কের পেছন দিকে এমন এক-একটা জায়গা আছে যা আমাদের এক-

একটা ইন্দ্রিয়ের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, কোনটা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের দৃষ্টি, কোনটা শ্রবণশক্তি, কোনটা ঘ্রাণশক্তি, কোনটা বাক্‌শক্তি—এই রকম আর কি !

"মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করতে করতে আমার মনে হয়েছিল যদি ঐ জায়গা-গুলোকে ঠিক ঠিক খুঁজে বের করতে পারি তা হলে ইন্‌জেকশন্ দিয়ে এক-একটা জায়গাকে ইচ্ছেমত নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারলে তার কাজগুলোকেও সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে আমাদের ইচ্ছামত। এখানে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে এই যন্ত্রটি যার নাম আমি আদর করে রেখেছি 'ফুটোস্কোপ।' এই যন্ত্রের সাহায্যে মগজের ভিতরকার নানা অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতই খুব বড় করে দেখা যায়। যাই হোক, এই ফুটোস্কোপ যন্ত্রটির সাহায্যে এবং ক্রমাগত পরীক্ষা করে করে আমি মস্তিষ্কের ঐ সব বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো মোটামুটি সনাক্ত করে ফেলেছি এবং কি ভাবে ইন্‌জেকশন্ দিয়ে ও সব জায়গাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় তাও বার করেছি।

"প্রথমে হাসপাতালে রোগীদের ওপর এই পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু খুলে প্রকাশ না করায় কেউ আমার উদ্দেশ্য ধরতে পারে নি। ফলে 'পাগলা ডাক্তার' এই খেতাব নিয়ে আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হল।

"কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়েও আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি নি। বাড়ীতেই একটা ল্যাবরেটরী গোছের বানিয়ে আমি আমার গবেষণার কাজ আরও ভালো করে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সমস্যা হ'ল পরীক্ষা করব কাদের ওপর ? পরীক্ষা চালাবার জন্য লোক আমার চাই-ই। কিন্তু এ কাজ তো আমি নিজে করতে পারব না, তাই সাহায্য নিয়েছি পাড়ায় যত উঠতি গুণ্ডা গোছের ছোকরাদের—যাদের তোরা বলিস মস্তান। ওদের সঙ্গে ভাব করে, ওদের খাইয়ে-দাইয়ে, দরকার মত হাত খরচের পয়সাকড়ি যুগিয়ে, ওদের আমি আপনার করে নিয়েছি। তারপর ওদেরই সাহায্যে শিকার ধরে ধরে নিজের পরীক্ষা চালাচ্ছি।"

সুব্রাট একটু থামল, তারপর বলল, "দেখ সোমনাথ, এই সুযোগে ওদেরকেও আমি বেশ ঘেঁটে দেখেছি। ওদের আমরা সমাজ-বিরোধী, উঠতি-গুণ্ডা, মস্তান, অনেক-কিছু বলি কিন্তু ওদের মধ্যেও প্রাণ আছে সে পরিচয় আমি পেয়েছি। ওদের ভালোবাসলে, ওদের অভাব দূর করলে, সহানুভূতির সঙ্গে ওদের সঙ্গে মিশলে দেখবি, ওদের তোরা যতটা খারাপ মনে

করিস্ তা ওরা নয়। বিপদে আপদে ওরাই এগিয়ে আসতে পারে—যা তথাকথিত ভালো ছেলেরা কখনই পারে না। আমার এ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হলে আমি ওদের নিয়ে কাজ শুরু করব—ওদের ঠিকমত মানুষ করার কাজ।

"যাই হোক, জো ডিম্বোকে মত্ত অবস্থায় কিডন্যাপ করে এনেছিল আমারই ছোকরারা এবং আমার ল্যাবরেটরিতে বসে আমিই ওর মগজের ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করার জায়গাগুলি নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে আনন্দ আর ফূর্তির জায়গাগুলো যাতে বেশি কাজ করে সে ব্যবস্থা করেছিলাম। কাজেই জো ডিম্বো কুস্তি করবে কি, ফূর্তির চোটে শিউশরণের সঙ্গে গলাগলি করার জন্যই ও তখন ক্ষেপে উঠেছে।

"এই পরীক্ষায় সফল হবার ফলেই আমি নিজে বুল-ফাইটের মত অতবড় একটা বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধা করিনি। যদিও জানতাম কোথাও সামান্য একটু হিসেবের ভুল হয়ে গেলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। এখানে আরও একটু অসুবিধা ছিল। মানুষকে যত সহজে কিডন্যাপ করা যায় অত বড় একটা ষাঁড়কে তো তা করা যায় না। এজন্য আমাকে নিজেকেই যেতে হয়েছিল ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে গ্যাস-মুখোস পরে রাতের অন্ধকারে। অবশ্য সেখানেও ঐ মস্তান ছোকরাগুলিই ছিল আমার প্রধান সহায়। সেখানে দরোয়ান, পাহারাদার এবং ষাঁড়গুলোকে ঘুমপাড়ানী গ্যাস ছড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে অচৈতন্য করে তারপর ঐ বিশেষ ষাঁড়টির মগজের ক্রোধ আর হিংসার জায়গাগুলো নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলাম ইনজেক্শনের সাহায্যে। যদিও এখানে জায়গাগুলো খুঁজে বার করতে বেশ মেহনত করতে হয়েছিল আর ওষুধের ডোজও দরকার হয়েছিল অনেক বেশি। কিন্তু আমার যে ভুল হয় নি তা তো স্বচক্ষেই দেখেছিস্! ঐ দুর্দান্ত ক্ষ্যাপা বদমেজাজী ষাঁড়টাও যেন মন্ত্রবলে শকুন্তলা নাটকের সেই আশ্রম মৃগের মত হয়ে পড়েছিল! তাই না?"

শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। ঘোর ভাঙল সুভ্রাটের অট্টহাসিতে।—"কি রে, তুইও যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলি! কফি যে পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল! নাঃ, তোর মগজেও এবার একটা ইন্জেক্শন্ দিয়ে দিতে হবে দেখছি অন্যমনস্ক ভাবটাকে তাজা করতে। দিবি নাকি মুণ্ডুটা ফুটোস্কোপের তলায়?"

আবার অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে তুলল সুভ্রাট।

সোনার কাঠি

শ্রী দিলীপ দাশগুপ্ত

'সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাও' বলে না কেউ বলে না তো!
রাজকুমারীর নিদমহলে হীরার বাতি জ্বলে না তো!
রাক্ষসীদের প্রাণ-ভ্রমরা স্ফটিক জলে কৌটোভরা—
থাকে না আর; চম্পাবতী কেশবতী স্বপ্নে মোটেই দেয় না ধরা।
পান্নাচুনির রাজপ্রাসাদে থাকে না কেউ বন্দীশালায়—
'হাঁউ মাঁউ খাঁউ'—দৈত্যদানব হাঁকে না আর পেটের জ্বালায়।
সবই বুঝি আজব কথা? রূপকথা কি ফুরিয়ে গেল?
অরূপকথার বাস্তবতার ঝড় এসেছে এলোমেলো!
আমি কিন্তু তেমনি আজও শিশুমনের অধিকারী,
হাত বাড়িয়ে থাকি যদি সোনার কাঠি ছুঁতে পারি।



গ্রাম

শ্রী মায়া ঘোষ দস্তিদার

হাঁসপুকুরে টলটলে জল মেয়ে বৌরা নাইছে
সজনে গাছে কোকিল দুটো প্রাণ খুলে গান গাইছে।
হাওয়ায় হাওয়ায় সোনালী ধান সারা বেলা দুলছে
আঁচল পেতে শিবের মেয়ে মটরশুঁটি তুলছে।
কুমোর পাড়ায় নেপুর বাবা দুগ্‌গাঠাকুর গড়ছে।
শামু দামু ছেলে দুটো পাঠশালাতে পড়ছে।
চণ্ডীখুড়োর অশথতলায় থামলো এসে ডুলি
পুজোয় এলো বাপের বাড়ী চাঁপার মেয়ে দুলি॥
সারা গাঁয় ঘুরে ঘুরে মানিক, যুগল, হাঁদা
দু'চার আনা দু'চার আনা করছে আদায় চাঁদা।



হি-হি-হাই-জ্যাকিং

শ্রী শামুক

দাদু বললেন, জরুরী একটা ওকালতির কাজে দু'দিনের জন্য ডেকেছে সিংগাপুর থেকে। ঐ কোম্পানীর বহু মামলা করেছি। লিখেছে, বৃদ্ধ বয়সে একলা আসার অসুবিধা হয় তো কারুকে নিশ্চয় সঙ্গে এনো। তুই চ' বিদেশ-ভ্রমণ হয়ে যাবে।

পেশা ছেড়ে অবসর নিয়ে দাদু বেশ কিছুকাল ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত। পূজা-অর্চনা বা পুরু কাচের চশমা লাগিয়ে শাস্ত্র-পাঠ। খবরের কাগজের উত্তেজনা-পূর্ণ শিরোনামায় আঙুল চেপে কেউ নিয়ে এলে,—না বাপু, আমার কাজ নেই। যত সর্বনাশের বৃত্তান্ত। দুনিয়ার হৈ-চৈ-তে আর স্পৃহা নেই।

দমদম থেকে মহাশূন্যে বঙ্গ-উপসাগর পেরিয়ে গেলাম চট্‌পট্। হনুমান-জীর শ্রীলঙ্কা লম্ফন। দেখে আশ মিটল না। ছবির মত সিংগাপুর বড্ড ভালো লাগে। কত দেশের কত চেহারার মানুষ! পোষাক-পরিচ্ছদে ভূত-কাল ও ভবিষ্যতের অদ্ভুত মেশামেশি। দ্বীপটিতে আনন্দমেলা সারাক্ষণ। আপশোস লাগে, মুগ্ধ মনের বিভোর ভাব ম্যাজিকের মত বেশী টিঁকল না। স্বপ্নের ঘোর কাটবার আগেই ফেরা-পর্ব।

মাঝ-রাতে বিমান বন্দরে চমকে উঠি। আহা, ইন্দ্রপুরী! আবার ভাবি আলিবাবার চিচিং-ফাঁক গুহা। দেশ-দেশান্তরের নানা রঙের নানা গড়নের বিমান আলোর রোশনাইতে ডুব দিয়ে নামছে—আকাশে মুখ তুলে ডানা মেলে অদৃশ্য হচ্ছে। সহকারীরা আঁটসাঁট সাদা পোষাকে নিঃশব্দে ব্যস্ত, কলের পুতুলের মতন কে যেন ওদের ঘোরাচ্ছে। যাত্রীদের জোট পাকিয়ে গুলজার।

শরীর কাঁপিয়ে হাসি করছে ; তার মধ্যেই প্রকাণ্ড হাঁ খুলে হিপোপোটামাসী হাই—বাধা মানে না।

ডাক পড়তে মাঝারি সাইজের বিদেশী বিমানে চড়ি। লাইন-বন্দী সিনেমা হলের নিয়মে বসে শূন্যে উঠতেই, এমনি মজা, যে, সামনের পর্দায় ছবি হোল শুরু। মারামারি দৌড়ঝাপের গল্প। একটু একটু দেখি আর কাচের ভেতর থেকে আকাশের ঝিকিমিকি তারার দিকে চেয়ে থাকি। সমুদ্র তখন হারিয়ে গেছে অন্ধকারের পাতালে।

দাদু আড়াল-দেওয়া আলোয় বই পড়ছিলেন, হঠাৎ তাঁর চমকে-ওঠা স্বর—ও কি করছে ? একজন পুরুষ পথের ট্রাফিক-পুলিশের ভঙ্গিতে ওপরে নীচে দু'হাত ছড়িয়ে, বিমান-চালকদের কেবিনের দরজায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে। দু'হাতে দুটি বড় সাইজের পিস্তল। একটি আমাদের নাকের সোজা, অন্যটির হাতল ঠুকছে দরজায়। চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিই সকলের দৃষ্টি ঐ একই জায়গায়। মাথার ভেতরের পর্দায় ঝিলিক মেরে জানায় কি হতে চলেছে।

বাঃ, কাগজে বর্ণনার একই লাইনে থ্রিলারটি এগুচ্ছে যে ! পাতলা এক মেয়ে সিট ছেড়ে হুইস্ সুইস্ করে সরু পথে এগিয়ে আধ-বাঁকা ঘুরে কর্কশ গলায় ধমকের লেকচার—সর্বনাশা বচনটি শোনোয় বার বার—চেঁচামেচি করলে বা সিট ছেড়ে উঠলে এই হাতবোমায় বিমান উড়িয়ে দেব—হাত উঁচিয়ে কব্জি ঘুরিয়ে দেখায়,—পৌরাণিক একাঘ্নী অস্ত্র। বলের আকারের বোমা এমন ভাবে ধরেছে যেন ক্রিকেটের বাম্পার ঝাড়বে—এক মারেই সবাই আউট !

ওদের কাছাকাছি একজন মহিলা তীক্ষ্ণ চীৎকারে কেঁদে উঠতে, স্বামী তাকে জড়িয়ে মুখে হাত চাপা দিয়েও গোঙানো বন্ধ করতে পারে না। আমার বাঁ-পাশের লোকটি হি-হি শব্দ করতে আড়চোখে দেখি পাম্প পাইপ যেন—থর থর কাঁপছে। মনে পড়ে মামীমার সঙ্গে সাত-সকালে হরিদ্বারে কুম্ভ-স্নানে ডুব দিয়ে আমারও ঐ দশা হয়েছিল। পেছনে কোন বাচ্চা ছেলে খিল্ খিল্ হাসির ঢেউ তুলে চুপ মেরে গেল। এতক্ষণ পুরুষটা কেবিনের দরজা জোরে জোরে ঠুকছে।

একটি ছোট্ট ফোকর খুলে গেল। ভেতরে মাত্র পাইলট-কাপ্তেনের মুখ। কথা শোনা যায় না, তবে পুরুষটা যে চোখ রাঙিয়ে হুকুম করছে বুঝতে পারি। ফোকরের ঢাকা বন্ধ হতে লাউড-স্পিকারে শুনি,—আপনারা সকলে

নিজের জায়গায় শান্তভবে বসে থাকুন। ওঠাওঠি একেবারেই করবেন না। এঁরা আমাকে বিমান, ভারতের বাইরে, অন্যস্থানে নিয়ে যেতে বলেছেন। না মেনে উপায় নেই। তার আগে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি কোন্ পথে ঐ দিকে তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব এবং তার জন্যে জ্বালানি তেল যথেষ্ট হবে কিনা।

দাদু লাফিয়ে উঠে পুরুষটাকে কাছে আসতে ইশারা করেন। এল না। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে। দাদু ধমকে শুরু করেন,—এ সমস্ত কি করছ? যা খুশি করে যাবে? নিরীহ মানুষদের ভয় পাইয়ে মজা করতে চাও—লজ্জা লাগে না? আমরা সকলে পয়সা দিয়ে টিকিট নিয়েছি, নিজের নিজের গন্তব্যস্থানে পৌছাতে চাই। কত বড় অন্যায়, বে-আইনী কাজ করছ খবর আছে—?

বিমান-ডাকু ঝাঁকি মেরে পিস্তল তাগ করে ইঙ্গিতে জানায়—বসে পড়, নয়তো—

দাদুকে জোর করে বসিয়ে হাতের ওপরে আস্তে আস্তে হাত বুলাই। চোখের সামনে ভেসে আসে কতবার-পড়া নিষ্ঠুর নির্মম দৃশ্য-কাহিনী। অজানা দেশে বিমান নামতে বাধ্য করাবে। বেহায়ার মত অহেতুক দাবী জানাবে, —প্রচুর টাকা দাও, তোমাদের বিমান দাও—জামিন-স্বরূপ কোন কর্তাব্যক্তিকে সঙ্গে দাও, তবে এই বিমান ছেড়ে নড়ব। আমরা যেখানে বলব সেই নিরাপদ স্থানে সোজা পৌছান ছাড়া অন্য ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্র আভাস মিললে আকাশেই তোমাদের বিমান, বিমান-কর্মচারী, জামিনকর্তা সকলকে এক-সঙ্গে পুড়িয়ে মারব। নিজেদের জানের জন্যে এতটুকু পরোয়া করি না।

এইসব হ্যাংলা জুলুম তড়িৎ-ঘড়িৎ মেটাতে হবে, আলাপ-আলোচনা, আপোশের বেশী অবসর দেবে না। অনবরত হাতের অস্ত্র আস্ফালনে ভীমরতি সৃষ্টি করবে—এই দিলাম দড়াম—সব উড়িয়ে।

একদিকে এতোগুলি নিরীহ নির্বিবাদী প্রাণ, এদের রক্ষা করতে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সকলেরই মন চাইছে, অপর দিকে ঝুঁকিওয়ালা সর্ত, অনেক টাকা, নতুন কয়েকটি জীবনের জিম্মাদারী। তার ওপর ঐ দুষ্টমন-ওয়ালাদের খামখেয়ালীতে ভরসার বাঁধ কোথায়? বিশ্বাস কি? ব্যবস্থা করতে সময় লাগে। আলাদিনের সব-পাওয়াবার পিদিমের সাহায্য ছাড়া সময় লাগবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনও দিন ও রাত করাত দিয়ে চিরে

চিরে তবে যেন ক্ষয় হয়। তত সময় বিমান-খাঁচায় আধমরা মানুষদের উইটিবির মত সেঁটে থাকা নিজের জায়গায়—মরুভূমির খিদেতেষ্টা এবং শরীর-মনের সব অস্বস্তি নিয়ে। বদখেয়ালে বিনা দোষে কোন জীবকে হঠাৎ ভয় পাইয়ে যমের দুয়ারে চেপে ধরা—এতে বাহাদুরি কোথায়? লোভের লাভে তৃপ্তি আসে কি করে?

আবার লাউড-স্পীকার,—এরা যেখানে যেতে চান যাচ্ছি সেখানেই। সমানে উড়ে আন্দাজ তিন ঘণ্টা লাগবে। তারপর আমাদের মুক্তি দেবেন বলেছেন। সকলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করুন। এঁদের দু'জনকে কোন রকম বিরক্ত করবেন না।।

এবার ভয় আসে মনে। ফাঁসির হুকুম এল যে! বিমান-সেবিকারা কার কি চাই জিজ্ঞেস করে, চটপট্ দিয়ে, পিছনের রান্না-ভাঁড়ারের ছোট কামরায় চলে গেল। দুশ্চিন্তা ছাড়া করবার নেই কিছু। ঝিমুনি আসে। খেয়াল হয় দাদু পা লম্বা করে, ঠেসানে মাথা হেলিয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। অন্যরাও দুঃখের ভারে 'সম্পূর্ণ-বিশ্রামের' নানা ভঙ্গি প্রয়োগের চেষ্টায় ব্যস্ত। দস্যু দু'জনার পা-ব্যথা লাগল নাকি? মধ্যেকার খালি দু'টি সিটের হাতলে মুখোমুখি উঁচুতে বসে পড়ে, যাতে সকলকে একসঙ্গে নজরবন্দী রাখা যায়। নানা দারুণ সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতে আমারও চোখে আঁধারের কালো ছায়ার চাঁদোয়া ঘনিয়ে এল।

* * *

মানুষের মৃদু ঝাঁকুনিতে চোখ মেলে দেখি দিনের আলো। কানে শুনি,—চা না কফি কি চাই? বেশ নাড়া দিতে দাদু জেগে বলেন,—উফ্ কি গাঢ় ঘুম রে! কোথায় যাচ্ছি? সকলের মগজেই কুহেলিকা—জানতে পারে না নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। চা-এর পাটের সঙ্গে লাউড-স্পীকার: এবার আমরা নামছি। সকলে বেল্ট লাগিয়ে নিন। কেউ ধূমপান করবেন না।

গরুড়-যান মাটিতে গড়িয়ে কেঁপে—স্থির। আমাদের 'ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার' বদলে আসন্ন উদ্বেগের আশংকা অভিভূত করে। অফিসারের পিছনে কয়েকটি মিলিটারী স্টেন-গান নিয়ে ওপরে এসে ঢুকল। হানাদার দু'জনে শিশুর মত কুঁকড়ে তখনও নাক ডাকাচ্ছে। ওদের চা খেতে ডাকে নি কেউ। ঘুম চটিয়ে, ধরে দাঁড় করিয়ে, ইঙ্গিতে জানাতেই টলতে টলতে সৈন্যদের সঙ্গে চলে গেল। যেন সবকিছু মুখস্থ ছিল।

মাইক মারফত ছুটি পাবামাত্র যাত্রীর দল টুকিটাকি টুপটাপ, তুলে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যাবার ধাক্কায় লেগে গেল। দাদু আমার কাঁধে হাত রেখে কাপ্তেনের সামনে পৌঁছলেন। বললেন,—বুড়ো মানুষ কোন জিনিস স্পষ্ট না বুঝলে বড় অস্বস্তি বোধ করি। আমরা সবাই একসঙ্গে কি করে ঘুমিয়ে পড়লাম যদি আন্দাজ দেন খুব বাধিত হব।

ঢেঁই-লম্বা পাইলট-কাপ্তেন মাথা নীচে নামিয়ে উত্তর দেয়,—হাই-জ্যাকিং-এর জন্য আমরা তৈরী আছি। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করতেই হবে। কেবিনের দুয়ার সব সময়ে বন্ধ। কোন জরুরী প্রয়োজনে এয়ার-হোস্টেসদের কাছে ফোন করে সমস্ত খবর নিয়ে তবে খোলা। যেই বুঝলাম কি হতে চলেছে, ঐ ওপরের ফুটো দিয়ে ঘুমপাড়ানী গ্যাস ছাড়তে সুরু। কতটা কতটা সময় ঘুমোলে আমরা নিশ্চিন্তভাবে নিজেদের ঠিকানায় পৌঁছতে পারব সেই হিসেবে গ্যাস কম-বেশী করি। হোস্টেসরা ও আমরা দরজা লাগিয়ে কামরার ভেতর ঢুকে পড়ি, তাই আমাদের নেশায় ঘুম এল না। এঁরা অচৈতন্য হতেই একজন সহকর্মী মুখোশ পরে এঁদের হাতিয়ার হাতছাড়া করে নিয়েছে।

দাদু ঘন ঘন মাথা নাড়েন—ওপরে নীচে এপাশে ওপাশে। নিজেকে রুখতে পারি না। ঝট্ করে জিজ্ঞেস করি—এখন আমরা নামলাম কোথায়?

বিদেশী কাপ্তেন লাল মুখে গাল ফুলিয়ে খুশীতে উচ্চারণ করে,—ডামডাম।

আমার আক্কেল সড়াৎ পিছলে স্রেফ আলুর দম।

এমন মানুষ চাই

শ্রী অনিল মিত্র

ছোট যখন কতোই সুখে
কাটিয়ে মায়ের কোলে;
বড় হলেই, সেই মা-কে যে
যায় নাকো আর ভুলে,
যে মাটিতে হামা দিয়ে
হাঁটতে শেখে ভাই,
সেই মা, মাটি মনে রাখে
এমন মানুষ চাই।

এই ভূমিকে করবে না যে
ভুলেও কভু হেলা,
মিথ্যা-মোহেই খেলবে না যে
অর্বাচীনের খেলা,
জন্ম আমার এই ভূমিতে,
তুলনা যার নাই—
এইটুকু যে রাখবে মনে
এমন মানুষ চাই।

খোকনসোনার ছড়া

শ্রী রণজিৎ ভট্টাচার্য

১

খোকনসোনা খোকনসোনা ঘুমিয়ে পড় না,
দু'হাত দিয়ে দুধের বোতল জাপটে ধর না।
দেখছে চেয়ে মিটমিটিয়ে চাঁদামামাটি।
খোকনমণি দেয় নি গায়ে রাঙা জামাটি।
ও মামা শোন না
মাকড়সার জাল বোন না,
সিঙি মাগুর আটকে যাবে জালের ফোঁকরে,
খোকনসোনা রাখবে ধরে গাছের কোটরে।

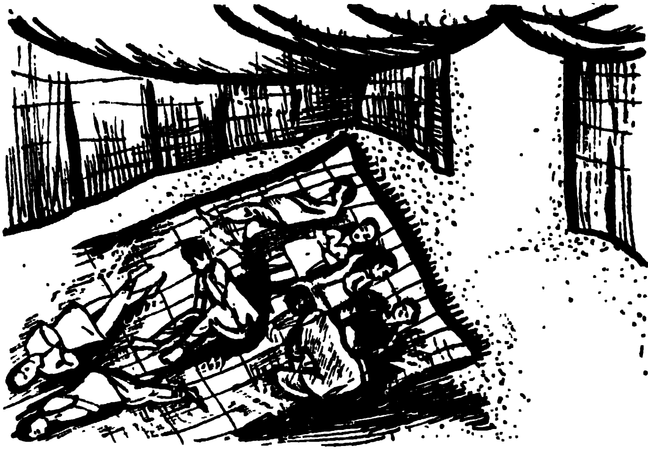
২

বাংলাদেশের মাছ
খোকনসোনা খোকনসোনা খাও না বারো মাস।
ঝালে খাবে ঝোলে খাবে, খাবে অম্বলে,
রাত্তিরেতে আরাম করে শোবে কম্বলে।
সেই কম্বল কিনেছিল করিম চাচার বাপ—
ঝকমকে গা রুই কাতলা লাফায় দুপদাপ।

পাড়ি

শ্রী লীনা দত্তগুপ্তা

খেয়ে নাকি দুই কে'জি তেঁতুলের অম্বল,
জরে কাবু—ও পাড়ার ডানপিটে ভোম্বল।
বেহুঁস—জরের ঘোরে—
আশেপাশে লাথি ছোঁড়ে—
ছুঁড়ে ফেলে গায়ে থেকে কাঁথা-লেপ-কম্বল।
বদ্যি কহেন—তবে
চেন্নেতে যেতে হবে।
নিয়ে সাথে চার জোড়া জুতো—শেষ সম্বল।
ভোম্বল পাড়ি দিল সেই দূর চম্বল।



কাল

শ্রী লীলা মজুমদার

সেবার পূজোয় কোথাও যাওয়া হবে না, এই রকম ঠিক ছিল। মহালয়ার দিন সন্ধ্যাবেলায় বলা নেই কওয়া নেই পলুদের বাড়ীতে আমার ছোট মামা উদয় হলেন, ছোটমামা তখনো বর্ধমানের সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করেন; অদৃশ্য কর্মী বলে খাতায় অবিশ্যি নাম ছিল না, তবে মাইনে একটু বেড়েছিল, তাই মাঝে মাঝে সহৃদয় সহযোগী বলে পালুকে আমাকে এটা ওটা খাওয়াতেন।

বিশেষতঃ যখন ঠেকায় পড়তেন।

বড় মাস্টারমশাই তিমি শিকারের লোমহর্ষণ এক গল্প বলছিলেন। ছোট-মামা পালুর হাতে এক ঠোঙা গরম পেঁয়াজি গুঁজে দিয়ে, ধপ করে ওর খাটে বসে পড়ে নিজের মাথার চুল এক মুঠো ছিঁড়ে ফেললেন। তাই দেখে বড় মাস্টার গল্প বন্ধ করে ওর দিকে ফিরে বললেন, 'সামন্তর কাছে চাকরি পাবার মাদুলী, কি শনি ঘুচোবার মাদুলী পাবে হয়তো। ছুটিতে নাকি?'

ছোটমামা কাষ্ঠ হাসলেন, বড় মাস্টার বললেন, 'আর যদি গোপন তদন্ত হয় তো আমার নতুন মটর-সাইকেলে যাওয়া যায়। নতুন মানে খুবই পুরনো, নইলে চারজনকে ধরবে কেন?'

আমরা দু'জনে কান খাড়া করে উঠে বসলাম।

ছোটমামা বড় মাস্টারের জুতোর আগায় কপাল ঠেকিয়ে, আমাকে বললেন, 'আহা-হা! তাই বলে সবগুলো খেয়ে ফেলিস্ না। ব্যাপার যথেষ্ট ঘোরাল, সমাদ্দারের মাথায় জলপটি দেওয়া হচ্ছে, থেকে থেকে হেঁচকি উঠছে।'

পালু মাথা নেড়ে বলল, 'তা হলে বোধ হয় আর বেশিদিন নেই। সুবিধা পেলেই একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিলে পার, বিমু তালুকদার সেটুকু আশা করবে।'

এখানে বলে রাখা উচিত যে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে একনাগাড়ে দু'বছর কাজ করে সার্টিফিকেট পেলে তবে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বিমু তালুকদার ছোটমামাকে চান্স দেবে।

বড় মাস্টার বললেন, 'হেঁচকি কেন?' ছোটমামা একটু শিউরে উঠে বললেন, 'ভূত দেখেছেন—হেঁচকি উঠবে না? আমাকে তদন্তে যেতে হবে।' বড় মাস্টার ওঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আমাকে না, আমাদের। আমাদের চারজনকে যেতে হবে। গুপি, পালু, দু'দিনের খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করিস্। শুকনো জিনিস, লুচি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা মাংসের বড়া, কড়াপাকের সন্দেশ, জিবে গজা—আচ্ছা, ব্যাপারটা কি তা তো বললে না? চাঁদু যথেষ্ট কোকাকোলা নিস্ রে।'

একটু সুস্থ হয়ে, ছোটমামা যা বললেন তার সারমর্ম হল এই। অপিসে কাজকর্ম এ সময়ে কমই থাকে। এ বছর আরো খারাপ, তিনদিন কোন মক্কেল আসে নি। সেন আর চৌধুরী ছুটিতে। ঘাঁটি আগলাচ্ছেন সমাদ্দার সাহেব আর ছোটমামা, কেউ না থাকলে দ্বিতীয় টিকটিকির নিজেকে প্রকাশ করতে দোষ নেই, হঠাৎ যদি মক্কেল এসেও পড়ে, ওঁকে স্বচ্ছন্দে আরেকজন মক্কেল বলে চালানো যায়। তার চেয়ে আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়, যদি সন্দেহজনক আইনভঙ্গকারী বলা হয়। ঐ মিনমিনে ভালো মানুষের মতো চেহারার সঙ্গে ঐ চকচকে যে কোন সত্যিকার গুপ্ত গোয়েন্দার থাকতে পারে, এমন কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করবে না।

সে যাই হোক, দু'দিন ধরে দোতলার জানালা দিয়ে দেখা গেল একটা ষণ্ডা কালো লোক, মাথায় অস্বাভাবিক ঝাঁকড়া চুল, পরচুলাও হতে পারে—চোখে কালো চশমা পরে বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে আর আড়চোখে সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের জানালার দিকে তাকাচ্ছে, তারপর একদিন টিফিন খেয়ে ফেরার সময় সমাদ্দার তাকে হাতে-নাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। কাটা চাবির ফুটো দিয়ে ভেতরে দেখবার চেষ্টা করছিল।

ছোটমামা টেবিল থেকে ঠ্যাং নামিয়ে, ফুচকার ঠোঙা লুকিয়ে ফেললেন। লোকটা বলল, 'ইয়ে কিছু মনে করবেন না, স্যার, সামনে আসবার ঠিক সাহস

পাচ্ছিলাম না। পাড়াগাঁ থেকে আসছি কি না! নাম নেপেন হোড়, গ্রাম পদমপুর, জেলা বর্ধমান। একটু সঙ্গে না গেলে, গ্রামে ঘুঘু-চরবে এখনি, দলে দলে লোক পালাতে শুরু করেছে।'

স্যার বললেন, 'কেন পালাচ্ছে?'

'ইয়ে, আমাদের দেড়শো বছরের বড় ইঁদারাটাতে আগুন লেগে গেছে কি না, সে কিছুতেই নেবানো যাচ্ছে না। পুকুর থেকে জল তুলে ঢেলে ঢেলে কাছা বেরিয়ে গেল, স্যার, তবু আগুন সমানে জ্বলছে, লোকে বলছে অপদেবতা ভর করেছে। গাঁ উজোড় হয়ে গেল স্যার, এক রকম বলতে গেলে আমাদেরি গ্রাম, আমার পূর্বপুরুষরাই ওখানকার জমিদার ছিলেন কিনা, প্রাণ থাকতে'—এই অবধি বলে হাউমাউ করে কেঁদে লোকটা স্যারের পা জড়িয়ে ধরল।

স্যার বললেন, 'কিসে করে নিয়ে যাবেন?' 'কেন স্যার ঠাকুরদার বন্ধুর পুরনো মটরের কারখানা থেকে একটা গাড়ি ধার করে আনব, স্যার। আমি চালাব।'

স্যার বললেন, 'যান, নিয়ে আসুন। আমি তৈরী হচ্ছি।'

লোকটা চলে গেলে ছোট মামা বললেন, 'সত্যি যাবেন, স্যার?' সমাদ্দার সাহেব হাসলেন, 'হাতের লক্ষ্মী কখনো পায়ে ঠেলো না হে। ঐ ইঁদারার নিচে নিশ্চয় পেট্রলের খনি আছে। তাই থেকে তেল চুঁয়ে জলে মিশেছে। তাতে কেউ বিড়ি ফেলেছে, ব্যস্ অগ্নিকাণ্ড। যে নতুন তেলের খনির সন্ধান দিতে পারবে, সরকার তাকে যথেষ্ট টাকাকড়ি দিয়ে থাকেন। চটপট্ প্রস্তুত হও, দু'জনে যাই, হাজার হোক অচেনা জায়গা। পকেটে একটা শিশি নিতে ভুলো না।'

তারপর ছোটমামা বাকি পেঁয়াজিগুলো সব খেয়ে ফেলে বললেন, 'রামকানাই আজকাল কিছু বানায়-টানায় না?' রামকানাই এক থালা আলুর বড়া নামিয়ে, রেখে বলল, 'বানাতেই হয়।'

ছোটমামা বলতে লাগলেন, 'যেমন লোক, তেমনি গাড়ি, রং-চটা, লড়ঝড়ে এখানে ওখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা।' বলল, 'ওখানেই জলযোগটা হবে, কি বলেন স্যার? স্থানীয় বাঁক-তুলসী চালের চিঁড়ে দিয়ে, কপি মটরশুটির পোলাও আর মাছের বড়া আর এক বোগনে-মোষের দুধের পায়েস—তার জন্যেই কত লোকে পদমপুরে গিয়ে পড়ে থাকত।' এই বলে এমনি জোরে একটা নিঃশ্বাস

ফেলল যে নিজের দাড়ি গোঁপ উড়তে লাগল। বলেছিলাম কি, লোকটার এক মুখ দাড়ি গোঁপ তা সে সত্যি হোক কি নকল হোক?

জলখাবার দেবে যখন তখন আর আমাদের কি আপত্তি থাকতে পারে? স্যার বললেন, 'সঙ্গেই যাচ্ছ যখন, ঘড়ি জামিন রাখতে হবে না। পরে বিল করব।'

গাড়িও তেমনি গুবরে পোকার মতো হামাগুড়ি দিয়ে চলল। এক সময়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে বাঁ হাতের সড়ক ধরল। স্যারের সঙ্গে নেপেন দেখলাম খুব জমিয়ে নিয়েছে। বলল, 'এ-সব খুব পুরনো পথ, স্যার, শের শা'র আমলের। কেমন সব আম-কাঁঠালের বাগান দেখেছেন, আড়াই শো বছরের তিন শো বছরের পুরনো। শের শা এর ফল খেয়েছে। কেউ অত বড় পুকুর কাটে আজকাল? জল প্রায় নেই, কিন্তু নীরেট পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট লক্ষ্য করলেন? মাছ কিলবিল করছে। শের শার মাছের বংশধর। এইসব পথ দিয়েই নবাব প্রতি বছর একবার হাতি চেপে দিল্লী যেতেন, বাদশাকে নজরানা দেবার জন্য। সঙ্গে থাকত সাত-আটশো লোক, পাইক, সেপাই, বরকন্দাজ, ফরাশ, হুঁকো বরদার, নিৎমদ্‌গার, রসুইকার, বাজনদার উজির-নাজির লোক-লস্কর। রাতে যখন তাঁবু পড়ত মনে হত নতুন একটা শহর পত্তন হল। ততক্ষণে আরেক দল অনুচর আরো কুড়ি মাইল এগিয়ে পরের রাতের তাঁবুর বন্দোবস্ত করতে লেগেছে। সব জায়গা-জমি ঠিক করা থাকত, প্রতি বছর একই জায়গায় তাঁবু হত।'

এদিকে গাড়িটা খুব ভালো চলছিল না। ভেতর থেকে কেমন একটা ছক্‌ছক্‌ শব্দ হচ্ছিল। বেলাও পড়ে আসছিল, সূর্য ডুবতে খুব বেশি দেরি ছিল না, স্যার একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওহে, আর কত দূর? দিন যে শেষ হল।' নেপেন হেসে বলল, 'তাতে কি স্যার? হাতে কোনো কাজকম্ম নেই, সে খবর কি আর নিই নি—রাত কাটাবার খানা বন্দোবস্ত আছে। আর খুব বেশি দূরও নয়। এ জায়গাটার নাম বড় খারাপ বুঝলেন। দেখলেন না পথে একটা লোক নেই। সন্ধ্যের পর কেউ আসে না এদিকে। ঐ যাঃ, গাড়ি যে থেমেই গেল।'

শুনে আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা! নেপেন বনেট খুলে দেশলাই জেলে কি ঠুকঠাক করতে লাগল। তারপর বনেট বন্ধ করে, চট্‌ করে একবার হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে, দেশলাই নিবিয়ে বলল, 'তাই তো, কি করা যায়?' বললাম,

'পেট্রল আছে তো?' নেপেন কোত্থেকে একটা লম্বা কাঠি বের করে পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিল।

'এই রে! যা বলেছেন ঠিক তাই! পেট্রল তো নেই! এখন কি করি!' কি করার জন্য আর অপেক্ষা করতে হল না, হঠাৎ আম বাগানের পেছনটা মশালের আলোয় আলো হয়ে গেল। রে-রে-রে করে একদল দস্যু আমাদের তিনজনকে পাছ-মোড়া করে বেঁধে নিয়ে চলল—কি, হাসছিস যে বড়?'

পানু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না—মানে ইয়ে—তারপর কি হল?'

ছোটমামা বললেন, 'বোধহয় মুচ্ছো গেলাম। জ্ঞান হল শের শা'র তাঁবুতে।' 'এ্যা! বল কি!' বড় মাস্টার সুদ্ধ লাফিয়ে উঠলেন। ছোটমামা বললেন, 'যেমন যেমন ঘটেছিল বলে যাচ্ছি। হাতির ডাক, ঘোড়ার খুরের শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনানি, নাচের বাজনা, সব কানে আসছিল। নেপেন ঠিকই বলেছিল, শের শাহের দিল্লী যাত্রী ছিল এক এলাহি ব্যাপার।'

চোখ চেয়ে দেখি স্যার আর আমি বাঁধা অবস্থায় শের শার পায়ের কাছে গালচের ওপর শুয়ে আছি। আর শের শা অনুচরদের ধমকাচ্ছে, 'এত রোগা দিয়ে কি করে চলবে? আর পেলে না নাকি। এখন কি করে কি হয় বল্ দিকি?' প্রধান অনুচর বলল, 'খাইয়ে দাইয়ে একটু চাঙ্গা করে নিলে হয় না?' শেরশা হতাশার স্বরে বলল, 'তা ছাড়া তো উপায় দেখি না। দেখ, চেষ্টা করে তবে সময় খুব কম, জানই তো ভোরের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হতে হবে।'

এই অবধি শুনে বোধ হয় আবার মুচ্ছো গেছিলাম। বাকিটা কেমন আবছা মনে পড়ে, টানা হ্যাঁচড়া মারামারি, হাতি ঘোড়া, শেকল, কয়েদ। জ্ঞান হল গভীর রাতে, স্যার এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরে, অন্য হাতে আমাকে ঝাঁকাচ্ছেন। দেখি চারদিকের আলো নেবানো, যার যেখানে গালচের ওপর ঘুমোচ্ছে। স্যার নিঃশব্দে আমাকে টেনে তাঁবুর বাইরে আনলেন। তারপর টেনে দৌড়।

ছুটতে ছুটতে যখন আর দম পাচ্ছি না, তখন দেখি আবার গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডে এসে পড়েছি। সামনেই ট্রাক ড্রাইভারদের লঙ্গরখানায় মিটমিট আলো জ্বলছে। টলতে টলতে কোনো মতে সেখানে গিয়ে উঠলাম। স্যারের পকেটের মানিব্যাগ কেউ ছোঁয় নি—অশরীরীরা মানিব্যাগ নিয়ে করবেই বা কি—দু'জনে বড় বড় মগে করে গরম চা আর মোটা মোটা হাতরুটির সঙ্গে ডিমের অমলেট খেয়ে, বর্ধমানগামী একটা ট্রাকে করে ফিরে এলাম।'

একটু চুপ করে থেকে ছোটমামা বললেন, 'সেই ইস্তক স্যার খাটে শুয়ে হেঁচকি তুলছেন। আমাকে রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। সামন্তর কাছে ভূতের মাদুলি আছে বললি না?'

বড় মাস্টার বললেন, 'সারা জীবন এই রকম একটা কিছুর জন্যই অপেক্ষা করে আছি। আর সব তো করেছি, সমুদ্রের ওপরে বা তলায়, ডাঙায় বা শূন্যে কি না দেখেছি! সব করেছি, বাদে অশরীরী অনুসন্ধান। ওঠ হে, তৈরি হও। কাল সকালেই যাওয়া। চাঁদু, জায়গাটা চিনিয়ে দিতে হবে।'

শুনে ছোটমামা বেশ ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। তবু স্যারকে তো আর হেঁচকি তুলে অক্কা পেতে দেওয়া যায় না। গেলাম চারজনে পরদিন সকালে। বাড়িতে বলা হল পিকনিকে যাচ্ছি। পরদিন ফিরব। যথেষ্ট খাবার-দাবার নেওয়া হল। দেড় ডজন কোকাকোলা। বড় মাস্টার এক ঠোঙা চানাচুর আনলেন। ছোটমামা এক প্যাকেট লজেন্স।

ট্রাক ড্রাইভারদের কারখানা ছোটমামা চিনতে পারলেন। সেখান থেকে ডানদিকে সরু পথ বেরিয়ে গেছে। কারখানার লোকরা কুয়োতে আগুন ধরার কথা শোনে নি, তবে বড় বড় অতি প্রাচীন আম-কাঁঠালের বাগানের কথা জানে। 'কোন বাগান খুঁজছেন?'

বড় মাস্টার বললেন, 'কোনো একটা ল্যাণ্ড মার্ক মনে করতে পার না, চাঁদু?' হঠাৎ ছোটমামা খুসি হয়ে বললে, 'দুটো প্রকাণ্ড পুকুরের মাঝখানে ভাঙা মন্দির।' তারা বলল, 'ও হো! ঐ ডান হাতের পথ দিয়ে মাইল চারেক এগিয়ে যান, পেয়ে যাবেন।'

গোরু খোঁজা করলাম জায়গাটাকে। দুপুর হয়ে গেল, খাবার জন্য একটা ভালো জায়গাও পাওয়া গেল। দুটো পুকুরের মাঝখানে ভাঙা মন্দির। ছোটমামা চ্যাচাতে লাগলেন, 'এই তো, এই তো সেই জায়গা, এইখানে গাড়ি বন্ধ হয়েছিল, আর ঐ—ঐ যে সেই আমবাগান! চল, চল।' ছোটমামার দিনের বেলায় বেজায় সাহস।

বড় মাস্টার বললেন, 'না খেয়ে কোথাও যাব না।'

দিব্যি লুচিটুচি খাওয়া গেল।

তারপর কোকাকোলা দিয়ে কুলকুচি করে, বড় মাস্টার পথের মাটি পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। হয়তো বর্মার শিক্ষা, যদিও সে-সব সত্যি

নয়, হঠাৎ ছোটমামা আবার চ্যাঁচাতে লাগলেন, ‘পেয়েছি, পেয়েছি, ইউরেকা !’ মাটিতে অনেকটা তেলের দাগ। বড় মাস্টার বললেন—

‘ব্যাটা ইচ্ছা করে কোনো উপায়ে তেল বের করে দিয়েছিল। কোন্ দিক্ দিয়ে নিয়ে গেছিল ?’ ছোটমামা আমবাগানে ঢুকলেন। আমবাগান পেরিয়েই খোলা মাঠ। সেখানে সার্কাসের তাঁবু গুটিয়ে ট্রাকে বোঝাই করা হয়েছে। সারি সারি জন্তু-জানোয়ার, ভ্যান্ করা লোকজন। নাকি ‘দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস।’ পনেরো দিন খেলা দেখিয়ে বর্ধমান যাচ্ছে।

আমরা চারদিক ঘুরেফিরে বুঝলাম পদমপুর বলে কোনো গ্রাম-ই নেই ও-অঞ্চলে। বর্ধমানে ছোটমামার ছোট ফ্ল্যাটে রাতটা কাটালাম। বড় মাস্টারের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই সমাদ্দার সাহেবের হেঁচকি সেরে গেল। রাতে ক্যালকাটা ক্যান্টিনে গিয়ে পোলাও কালিয়া খাওয়া হল। পরদিন ফেরা। ছোটমামা চিনু তালুকদারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

আসলে তখনো ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝি নি। কালীপুজোর কয়েকদিন পরে ছোটমামা এসে বললেন, ‘ফিল্ম দেখবি নাকি ? চিনু তালুকদার পাস দিয়েছে। অ্যামেচার কোম্পানি প্রাইভেট শো, নাকি খুব ইণ্টারেস্টিং। কি একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে, এক মাসের মধ্যে কত কম খরচে কত ভালো ছবি তোলা যায়। এরা ফাস্ট প্রাইজ পেয়েছে !’

সে আর বলতে ! বাবা মা পর্যন্ত দেখতে গেলেন। খাসা ফিল্ম। তার নাম ‘কাল’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা, বিনি পয়সায় দিয়েছেন। মোঘল শিবিরে কি করে যেন সময় কালের গণ্ডগোল হওয়াতে, কেমন করে ভুলক্রমে দু’জন আধুনিক গোয়েন্দা বন্দী হয়েছিল ও স্রেফ বুদ্ধিবলে শেষ অবধি পালিয়েছিল, এই কাহিনী। নাকি সামান্য খরচে সার্কাসের তাবুতে তোলা, তাদের খেলা আরম্ভ হবার আগের দিন। অভিনেতারা জেনে, কিম্বা না জেনে, মিনি-মাগনা অভিনয় করেছেন। মোট খরচ সাতশো টাকা পঁচাত্তর পয়সা। ডায়ালগ অ্যামেচাররা পরে জুড়েছেন।

দেখলাম গাঁট্টা-গোট্টা ঝাঁকড়া চুল, ইয়া দাড়ি গোঁপ শের শা মসনদে আছেন, ঝাড়লণ্ঠন, সেজবাতি, তলোয়ার ঝোলানো লোক-লস্কর। এমন সময় কতকগুলো বিকট চেহারার পাষণ্ড প্যাটার্নের লোক সমাদ্দারকে আর ছোটমামাকে বেঁধেছেঁদে চ্যাংদোলা করে, তাঁর সামনে এনে ফেলল।

ছোটমামা মহা উত্তেজিত, 'তাই খটকা লাগছিল! শের শার হাতে এইচ-এম-টির সোনার ঘড়ি কেন! ঐ ব্যাটাই নেপেন!' আমরা তো হাঁ!

দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন ছোটমামা। 'এবার সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ নেপেন হতভাগার কাজ। নিজে সেজেছে শের শা, এখন দুটো সস্তায় টিকটিকি চাই, তা ধরে আন দুটো জলজ্যান্ত বিনি পয়সার টিকটিকি! বাঃ, বেড়ে ব্যবস্থা তো! ধরি না একবার লক্ষ্মীছাড়াকে—'

হলও সে সুযোগ। সবার শেষে বিজয়ী চিত্রকে স্বর্ণ পদক ও নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হল। সে কি হাততালি! হঠাৎ দেখি ঝড়ের মতো মুখ করে ছোটমামা স্টেজের দিকে চলেছেন। দুই হাতে ঘুঁষি পাকানো। আমাব তো চক্ষুস্থির! এক্ষুণি ছোটমামাকে ছিঁড়ে ফেলে দেবে! পানুকে ইসারা কবে সবে এগুতে যাব, এমন সময় ছোটমামার ওপর নেপেনের চোখ পড়ল। অমনি পুরস্কার হাতে ছুটে এসে ছোটমামার সামনে হাঁটু গেড়ে ব্যাটা বসে পড়ল। আর ছোটমামা 'আহা, ছি, ওকি, ওকি!' বলে তাকে টেনে তুলে কোলাকুলি করলেন। নরমে গরমে টিকটিকি হয়।

খুব খাওয়াল নেপেন আমাদের চারজনকে। মন্দ না লোকটা।

লাগলো সবার তাক্

শ্রী প্রীতিভূষণ চাকী

বেতার গান গাইবে বলে
তৈরি হলো ব্যাঙ
তানপুরোতে তান সাধলো
গ্যাঙোর গোঙর গ্যাঙ্‌··
চিন্তা এখন, ব্যাঙের সাথে
তবলা বাজায় কে?
গিরগিটিটা তাল ঠুকলো
ধেটে কেটে ধে!

দিন দেখে দুই শিল্পী ভায়া
চললো ইডেন পানে
অডিশনে আউট হযে
দুঃখ পেলো প্রাণে;
এমন সময় সদারং-এ
পড়লো তাদের ডাক।
গান বাজনায় মাৎ করলো
লাগলো সবার তাক্!

কুঁজো

শ্রী মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

গরম গরম দারুণ গরম মিটছে নাকো তেষ্টা
বাজার গেছে আনতে কুঁজো বাড়ীর চাকর কেষ্টা।
কুঁজোতে জল ঠাণ্ডা থাকে—সে জল খেলে প্রাণটা
তৃপ্তি সুখে তৃপ্ত থাকে বেশ তো কয়েক ঘণ্টা।

কয়েক ঘণ্টা কাটলো তবু কেষ্টার নাই পাত্তা
বুদ্ধু ভুতুম বাজার গিয়ে দেখছে কি গান যাত্রা ?
সন্ধ্যা ঘনায় দারুণ ক্রোধে কাঁপন জাগে অঙ্গে—
কেষ্ট এলো···কুঁজো কোথায় ? ওটা কে ওর সঙ্গে ?

কেষ্ট বলে : এই তো কুঁজো, একেই হুজুর আনতে
হদ্দ হলাম, কষ্ট পেলাম সে কথা কি জানতে ?
আসতে কি চায় ? কাঁধে চড়েই আসলো ব্যাটা শেষটা।
কুঁজো কোথায় ? কুব্জকে এক আনলো ঘরে কেষ্টা।



ব্যাঙ খাও

শ্রী রবিদাস সাহারায়

মাছ খেতে সাধ কেন
আর কিছু খাও না,
মাছের বদলে কোন
খাদ্য কি পাও না ?

মাছ ভাত খাওয়া আজ
স্বপ্নের তুল্য,
দিনে দিনে মাছ হয়
অগ্নির মূল্য।
ব্যাঙের মাংস যে
খেতে খুব মজাদার,
খাচ্ছে অনেক লোক
খবর কি জান তার ?

ব্যাঙ থাকে লাখে লাখে
পচা ডোবা জলাতে,
কষ্টও খুব নয়
বেশী ব্যাঙ ফলাতে।
অতএব দল বেঁধে
ব্যাঙ চাষে লেগে যাও,
নাই বা মিলুক মাছ
মজা করে ব্যাঙ খাও।



ব্যাপারটা হাসির

শ্রী আশা দেবী

ঝণ্টু বললে: সদা হাস্যমুখে থাকবি, বুঝলি। আমি খবরের কাগজের পাতাগুলো উল্টে উল্টে দেখছিলাম মশাগ্রামের রাস্তাঘাটের কি কি উন্নতি হয়েছে। ঝণ্টুর কথাটা কানে যেতেই বলে উঠলাম: সব সময় হাসবো। লোকে তো পাগল বলবে! সব সময় কি হাসা সম্ভব?

—হ্যাঁ, যায় বৈকি ঝণ্টু গম্ভীর হয়ে বললে: তবে হাসতে পারাও তো একটা যোগ্যতার কথা! সে যোগ্যতা থাকেই বা ক'জনের বল?—ওই যে তোর কেলোপিসে ময়লা মাছের থলে নিয়ে বাজারে যান, তার মুখের দিকে তাকালে তো বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে যায়। কানে থোপা থোপা চুল আঙ্গুরের থোকার মত ঝুলছে—। সেই কর্ণাটকেশরী পিসের মুখখানা যেন একেবারে ভুষুণ্ডির মাঠের ওল। যদি একবার মুখ খুলেছে তবে আর রক্ষে নেই তার চিৎকারের চোটে। তাই বলছি যদি হাসিমুখ দেখতে চাস্ তবে কাল চল আমার সঙ্গে একটা মশারী কিনে মশাগ্রামে। কাকে বলে সদা হাস্যমুখে থাকা।—তুই কখনও গেছিস সেখানে? আমি বললাম,—না যাই নি কখনও। তবে সবাই বলে: হ্যাঁ, মামা বটে একখানা ঝণ্টের। যাকে বলে মামার মত মামা। লোক দেখলেই হেসে কুটিপাটি—কুকুর দেখলে খিলখিলিয়ে হাসি—কে যেন একদিন তাকে বলেছিল তার ছেলেটা মরে-মরে—শুনে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে মামা বলেছিলেন: তা বেশ—তা বেশ। ই-হি-হি। হেসে আর বাঁচি না।

—ও বাবা পাগল-টাগল নয় তো!

চটে গিয়ে ঝণ্টু বললে: জানিস্ হেবো, এ দুনিয়ার সংসারে যারা ভাল হয় তাদেরই লোকে পাগল বলে। বলবেই। আমার মামা বেশী ভাল লোক কি না তাই পাগল। চল না একবার মশাগ্রামে—গিয়ে আর তোর ফিরতে ইচ্ছা করবে না একেবারে। আর আমিও তো কখনও যাই নি। মামারও আমি ছাড়া কেউ নেই। একবার গিয়ে দেখলে হয়। লোকে কথায়

বলে : "মামার বাড়ীর আদর।" তা একবার মামার বাড়ীর আদর পেয়ে এলে, মন্দ হয় না। চল, কাল সকালে 'দুর্গা' বলে রওনা হয়ে যাই।

আমিও ভাবলাম। গেলে মন্দ হয় না একবার। সাঁওতালদিতে যেমন সাঁওতাল নেই,—মশাগ্রামেও হয়তো তেমনই মশা নেই। কু-লোকে রেগে-টেগে হয়তো ওর অমন বাজে একটা নাম দিয়েছে; গিয়ে ভাল লাগবে।

সুতরাং সকালেই দুর্গা-নাম করে বেরিয়ে পড়লাম ঝণ্টুর সঙ্গে।

স্টেশনে যখন নামলাম তখন প্রায় দুপুর হয় হয়। ভীষণ গরম পড়েছে। গরমে যেন মাটি ফেটে যাবে চারদিকের। আমরা নামতেই দেখি কুলিরা এসে মালপত্র খোঁজাখুঁজি করছে। আমাদের দু'জনের হাতে দু'টো টিনের সুটকেশ। আমাদের আর কুলির কি দরকার। ঝণ্টে বললে : মামার কাছে খবর পাঠিয়েছি। মামা নিশ্চয়ই স্টেশনে আসবেন, কারণ আমরা তো বাসা-টাসা ওঁর চিনি না। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের নিতে আসবেন।

আর এসেছেনও।

আমাদের দেখে তিনি হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন।

মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্যের তাপ আগুন ছড়াচ্ছে। একটু হাওয়া নেই। একটা গাছের পাতা নড়ছে না। গাছের ডালে ডালে কাকগুলো হাঁ করে বসে আছে। চড়ুইগুলো স্টেশন-মাষ্টারের খাতা-বই-এর ভেতর থেকে পোকা ধরে ধরে খাবার চেষ্টা করছে। রাস্তার কুকুরগুলো জিভ বের করে ধুঁকছে।

আমি বললাম : ঝণ্টে চল তাড়াতাড়ি, নইলে একটা গাড়ী-ফাড়ি কর। যা রোদ, মাথা পুড়ে যাবে।

—সত্যি। ঝণ্টু বললে, মামার বাড়ী কতদূর? যদি কাছে হয় তবে চল, আর যদি দূর হয় তবে একটা গাড়ী-ফাড়ি কর। এত পথ হাঁটতে পারবো না।

মামা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে এগিয়ে চললেন। আমি বললাম : না-রে হেবো দূর নয়। চল একটু কষ্ট করে, হেঁটেই যাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম। রাস্তা ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে।—পিচ্ যেন গলে যাচ্ছে গরমে। আমরা দু'জনে প্রথমে বেশ হন্ হন্ করেই চলছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমাদের গতি কমে আসতে লাগছে। গরম রাস্তার ওপরে পা দেব কি ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে যেন গরমে পা-পুড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমরা গরম চাটুর ওপর পা রাখছি, এ রাস্তা নয়।

এবার দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা।

—মামা আর তো পারি না। এবার সাইকেল রিক্সা-টিক্সা কিছু কর।

মামাকে বেশ ভালই লাগলো। তিনি কি যেন উত্তর দিলেন। মনে আশা হলো হয়তো মামা এবার একটা সাইকেল রিক্সা করে ফেলবেন। কিন্তু কোথায় কি 'কাকস্য পরিবেদনা।' মানে কাক এবং অশ্ব পড়ে পড়ে বেদনা খেতে লাগলো। যিনি একথা বলেছিলেন তিনি ঝণ্টু এবং হেবোকে কাক বা অশ্ব ভেবে এ কথা বলেছিলেন কিনা কে জানে। কিন্তু ঝণ্টু আর হেবোর যা অবস্থা তাতে বেদনা খেতে আর বাকি কি ?—

আমি বললাম : কি রে ঝণ্টে, কত কথা বলে আমায় নিয়ে এলি ;—তোর মামা খুব দয়ালু—কৃপালু আর কি বলে ওই শাঁকালু, এখন দেখছি একেবারে গোলালু। এতক্ষণ ধরে এসেছি—কত কথা বলছি সেই মারাত্মক হাসি আর মুরগীর মত কোঁকর-কোঁ ছাড়া কোন আওয়াজই তো শুনলাম না। আর চলেছেন তো চলেছেনই যেন মহাপ্রস্থানের পথে। এর না আছে এদিক না আছে ওদিক। আর তো পারি না—মাথা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে গেল। পায়ের কথা আর কী বলবো, পায়ের যে অবস্থা মনে হচ্ছে ও পা আমার নয়, অন্য কারুর। বলেই আমি লাফাতে লাগলাম; একেবারে যাকে বলে : 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তা-তা থৈ-থৈ, তা-তা-থৈ-থৈ' নাচ।

ঝণ্টু আবার রোগা সিট্‌কে। সে যেন জালের ভেতর চিংড়ি মাছের মত হুলা-হুলা নাচ শুরু করে দিল। এ পা নামায় তো ও পা ওঠায়। কিন্তু মামা—কার সাধ্য রোখে তার গতি,—সে প্রায় ছুটে চলতে লাগলো কোন দিকে না তাকিয়ে।

আমি বললাম : মামা একটু জল। প্রাণ গেল।

ঝণ্টু বললে : মামা দাঁড়াও, দৌড়িও না, তেষ্টায় যেন বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।—

কিন্তু মামা না দাঁড়ায়, না পিছু ফিরে চায়। আমরা দু'জনে এবার ছুটতে লাগলাম। মামা একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে কোঁকর-কোঁ করেই ছুটতে লাগলো।

আমরা বুঝলাম বেগতিক। মামা ভেড়াবেঁকা পথ ধরে যে ভাবে ছুটছে তাতে যদি এই জঙ্গলের পথ ধরে কোনদিকে চলে যান, আমরা একেবারে

এখানে নতুন, কিছুতেই চিনে বের করতে পারবো না। কাজেই মামার পিছু একেবারেই ছাড়া চলবে না। সঙ্গে যেতেই হবে।

বেশ খানিকটা গিয়ে গরমে ক্লান্তিতে আমি প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে যখন পড়েছি তখন মামার বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে পৌছলাম আমরা।

এবং অস্ফুট স্বরে বললাম: জল। প্রাণ যায়।

মামা ঘরে গিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না।

ঝণ্টু ছুটে ঘরে গিয়ে দেখলে মামা থালায় মিষ্টি সাজাচ্ছে যেন কি কি—নিপুণ হয়ে।

আমি আর ভাবলাম না, বারান্দায় বালতি থেকে এক ঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে, বাকী জলটা মামার মাথায় ঢেলে দিলাম।

ঝণ্টু বললে: কর কি! কর কি!

আমি বললাম: বেশ করি। যা করা অনেক আগেই উচিত ছিল তাই করেছি। তোর তো মামা নয় ডাকাত। মানুষ খুনো আর হাসি না হাসি—এর যেন গলার ফাঁসি।

বালতি থেকে খানিকটা জল ঢক ঢক করে খেয়ে মামা বললে: তা বেশ—

এতক্ষণে বোঝা গেলো তাঁরও প্রাণ যাচ্ছিল তেষ্টায়।

—তা বেশ।—ঝণ্টে আয়, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবো না। মামার হাসিমুখের অভ্যর্থনার যদি এই নমুনা হয় তবে বাকী আর যে কী আমাদের কপালে আছে তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। পালিয়ে আয়।

ঝণ্টু অনেকক্ষণ ধরে কি যেন লক্ষ্য করছিল মামার দিকে তাকিয়ে, আমার দিকে চোখ পড়তেই বললে: হেবো সুটকেশ ফেলে চলে চল। আর থাকা নয়; বলতে বলতেই মামা একেবারে হাসতে হাসতে এক হাঁড়ি পচা গোবর জল ঝণ্টের মাথায় ঢেলে দিলে। আর বাকীটা নিয়ে আমার দিকে হেসে হেসে ছুটে আসতে লাগলো। আমি দেখলাম মামার ঘরে যত আবর্জনা, ছেঁড়া জুতো, গোবর গোলা হাঁড়ি হাঁড়ি জল, পচা মাদুর আর কত কি তাঁর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস—সারাদিন আস্তাকুঁড়ের সংগ্রহ। এবার ঝণ্টেকে ছেড়ে উনি হেসে হেসে পায়ের বেড়ী বাজিয়ে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলেন।

পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে বললে: পালাও,—বদ্ধ পাগল!

উনি পনের দিন ভাল থাকেন, পনের দিন উত্থাম হয়ে ওঠেন। পালাও—পালাও, আর রক্ষে নেই। আমরা দু'জনেই স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগলাম। আর পেছন থেকে সমানে মামার হাসির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো—ও-হো-হো—পেট গেল হাসিতে। ই-হি-হি-হি—কি মজার কথা। জল তেষ্টা-হি-হি। জলে বড় পোকা কেটা বড় বোকা—। ই-হি-হি-হি কি হাসির কথা।



হাতের পাঁচ

শ্রী শৈল চক্রবর্তী

তিনটি জুতো নইলে নয়
পা যদিও দুটি
হাঁটতে ভালবাসি এমন
নেইকো আমার জুটি,
দু'পায়েতে দুইটি জুতো
বাড়তি একটা রাখি।
হঠাৎ যদি একটা ছেঁড়ে
তখন করবোটা কি ?

পথে যেতে দু'খান ছাতা
নইলে নয় আমার,
একটা কালো কুচ্‌কুচে রং
একটা বুটিদার।
রোদের সময় একটা খুলি
আরটি থাকে বন্ধ,
বিষ্টি হলে খুলতে সেটি
বল তো কী আনন্দ !
পাখা দেখে হাসিস বুঝি,
রাখছি পাখা কাছে
আজকে যদি গুমোট বাড়ে
খেয়ালটা কি আছে !
ভ্যাপ্‌সা গরম কাগজেতে
ছাপছে বড় হেডিং,
কিম্বা তখন করবে কি বল
লোড যদি হয় শেডিং ?
হিসেব করে চলা ভাল
হাতের পাঁচটা রেখে,
হঠাৎ যদি ঠেকায় পড়ি
তখন সামলাবে কে ?

জীবন

শ্রী মিনতি নাথ

নদীর স্রোত যেমন হয়
জীবন স্রোত তেমন বয়
কোথায় যে সুরু শেষ কোথা যায়
ধরতে পারা বিষম দায়।
স্রোতের বুকে একটি ঢেউ
ভাল মন্দ জানে না কেউ,
কাল সমুদ্রে সবাই তারা
রইবে নাকো, হবে হারা
প্রমাণ কিছুই থাকবে না তো
ছিলুম ধরায় বছর কত।
মূল্য কেবল তারই আছে
ক'দিনের এই জীবন মাঝে
যে পারে ভাই জীবনটাকে
ছড়িয়ে দিতে সবার কাছে।
দশের মুখে ফুটিয়ে হাসি
দুঃখ দৈন্য বিপদ নাশি
সকল বেড়ার বাধা ভেঙে
প্রদীপ যে জন জ্বালায় আসি।
মানুষ হয়ে জন্ম লভি
নিজের তরে করছি সবই
বিদায় বেলা আসবে যবে
জীবন ধারার রেশ কি রবে—
সেই কথাটি বারেক ভেবে
নিজের পথ বেছে নেবে।

পিপলু

শ্রী অশোককুমার মিত্র

পিপলু ছিল দুই বছরের
পিপলু এখন আড়াই ;
একা একাই চলতে পারে,
গল্প ছড়া বলতে পারে,
মাংসে আলু ডলতে পারে,
এখন মাকে ছাড়াই।
বালুর সোনা ছাঁকতে পারে,
গন্ধ লেবু মাখতে পারে,
রঙ ডুবিয়ে আঁকতে পারে,
মস্ত পাহাড় খাড়াই।
দুই বছরের ছোট্ট ছেলে
পিপলু এখন আড়াই।



খালি বাস

শ্রী কুমারেশ ঘোষ

একই রুটের পর পর দু'খানা বাস নাকের উপর দিয়ে চলে গেলো।

আমি হায় হায় করে উঠলাম।

আর একটু পা চালিয়ে এলে অন্ততঃ পেছনের বাসটাকে ধরা যেতো না হয়তো, তবে দরজায় ঝোলা প্যাসেঞ্জারের কোমরটা জড়িয়ে ধরা যেতো, বা তাদের কারোর সার্টের কলারটা চেপে ধরা যেতো, আর পাদানীতে কোন রকমে জুতোর ডগাটার ভর দেওয়া যেতো।

যেতে হয়তো। এই ভাবেই তো রোজ যেতে হয়।

কিংবা পিছলে পড়ে আমিই যেতাম চাকার তলায়, তা কে বলতে পারে! তবে ঐ যে একটা কথা আছে না—রাখে কেষ্ট মারে কে, আর মারে কেষ্ট রাখে কে?—ঐ কথাটুকুই ভরসা। রাখে কেষ্ট মারে কে? আর কেষ্ট যদি মারেনই, তবে তিনি সে কাজটা বাড়ীতেই সমাধা করতে পারেন নির্বিঘ্নেই। অতএব রাস্তায় বেরিয়ে ওসব ভয় করতে গেলে চলে না।

বাস দু'খানা কেমন কেত্‌রে কেত্‌রে চলে গেলো। একদিকে দরজার প্যাসেঞ্জারের ভারে কাননি মেরে চলেছে বাস দু'টো, আমি দেখতে পেলাম বোঝার ওপর শাকের আঁটি আমিই উঠতে পারলাম না।

ভাবছি, হঠাৎ দেখি ঐ রুটেরই একখানা বাস ঢিমে-তেতালায় আসছে আমারই স্টপেজের দিকে। হুঁঃ, যখন আসে ঐ রকমই আসে!

প্রথমে বিশ্বাস হলো না। এই রুটেরই তো? বোর্ডটা ভাল করে দেখলাম, হ্যাঁ। আর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বাসটা প্রায় খালিই। কারণ ঐ রুটেই দু'দুখানা বাস একটু আগেই সব প্যাসেঞ্জার কুড়িয়ে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে দেখেছি আমি।

বাসটা বাস-স্টপে থামতেই মনে মনে একগাল হেসে ঝপ করে উঠে পড়লাম বাসে। সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যে দরজায় কণ্ডাকটারকে একবার জিগ্যেস করে নিলাম, বাসটা শেষ পর্যন্ত যাবে তো।

—যাচ্ছে তো।—কণ্ডাক্‌টার হাসলো।

—না, অনেক সময় মাঝপথ পর্যন্ত যায় কিনা··· ।

বলেই আর বাক্যব্যয় না করে খালি সীটগুলোর দিকে এগোলাম। বাসে মাত্র চার-পাঁচজন প্যাসেঞ্জার এখানে ওখানে বসে।

কিন্তু আমি কোন্ সীটটায় বসি? সীট বেছে বসাই সমস্যা এখন।

পেছনের সীটটায় বসলাম। না, বড্ড ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সেটা ছেড়ে ডান দিকের একটি সীটে বসলাম। দূর, গায়ে রোদ্দুর লাগছে। সেটা ছেড়ে বাঁ দিকের একটা সীটে গিয়ে বসলাম। সীটটা জানালার ধারে বটে, কিন্তু জানলাটাই যে খোলা যাচ্ছে না। ধ্যেৎ, রাস্তার কিছু দেখাই যাবে না যে। বরং ড্রাইভারের পেছন দিকের সীটেই বসা যাক। তাই বসলাম। কিন্তু এখানে যে পেট্রোলের গন্ধ, ইঞ্জিনের গরম! আর হাওয়ায় পেছনের পাটকরা চুল আমার সামনে উড়ে আসচে। নাঃ, এখানে বসা যাবে না।

ঐ, ঐ যে সামনের দরজার কাছেই একটা সীট খালি। মন্দ না। ওটাতেই বসা যাক। আর দেরি করা উচিত হবে না। সামনের স্টপেজেই একটা বড় মোড়। অনেক লোক ওঠে ঐ স্টপেজে। শেষে আর সীটই পাওয়া যাবে না। বাসের অন্য প্যাসেঞ্জাররাই বা কি ভাবছে!

আর দেরি না করে, শেষ পর্যন্ত একটি সীট পছন্দ করেই তাতে ছুটে গিয়ে বসে পড়লাম। গ্যাঁট হয়ে বসলাম।

একটু পরেই মোড়ের বড় স্টপেজটায় বাসটা এসে দাঁড়ালো। যা ভেবেছি! পরের পর লোক উঠতে লাগলো। মেয়ে পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা। বাসে উঠে তারাও অবাক্ হলো। বলতে লাগলো—একি, এ যে একেবারে খালি বাস!

—ও, কতদিন পরে এমন খালি বাস চোখে পড়লো।

—বোস্, বোস্, যে যেখানে পারিস বসে পড়।

—বাবা, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি।

—হ্যাঁ বাপু, এ বাস যাবে তো?

আমারই পুরোন প্রশ্ন।

দেখতে দেখতে বাসটা ভরে গেলো। দেখি, এক দঙ্গল মেয়ে বই খাতা নিয়ে হৈ হৈ করে উঠলো। স্কুলে যাচ্ছে। তাছাড়া পাঁচমিশালী যাত্রীতে বাসটা পেট ঠাসা হয়ে গেলো দু'এক মিনিটেই।

আমি আমার সীটে বসে বসে দেখছিলাম। যারা আর বসবার জায়গা

পেলো না, তাদের জন্যে মন করুণায় ভরে উঠলো। মনে হলো, সত্যিই আমি কী ভাগ্যবান!

হ্যাঁ, আমার সীটের পাশেই এসে বসেছিল একটি মেয়ে। মেয়েরা দিব্যি পুরুষের সীটে পুরুষের পাশে ইচ্ছেমত বসতে পারে। পুরুষদের বেলায় যত বাধা।

হঠাৎ কানে এলো এক নারীকণ্ঠ: আপনি একটু উঠুন না?

শুনে চমকে উঠলাম, অ্যাঁ!

সামনে দেখি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বললো, এটা লেডিজ সীট।

লেডিজ সীট! তাই নাকি! যাঃ, লেডিজ সীটে বসেছি!

ঘাড় মুচড়ে মাথার উপর দিয়ে চেয়ে দেখি, হ্যাঁ, তাইতো! জানালার মাথায় 'লেডিজ সীট' লেখাটা যেন মুচকে হাসচে। যেন বলছে, নাও, ওঠো এবার।

ইস! আমি সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে লাগলাম। যেমন রোজ ঝুলি।

টাক ও টাকা

শ্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সত্যদাদার বড় ছেলে
নেত্যকালীর কাকা
মাথায় ছিল টাক বড় এক
ছিল না তার টাকা।

টাকার খোঁজে গেল টাকী
দেখল সেথায় সবই ফাঁকি
অবশেষে লাকি হতে
ছুটল সে ভাই ঢাকা।

টাকী গিয়ে টাক বাড়াল
ঢাকা গিয়ে টাকা হারাল
তার, টাকও হোল, টাকাও গেল
রইল সবই ফাঁকা।

দান

শ্রী বেলা দেবী

—'প্রায় একমাস শয্যাশায়ী মা একজ্বরী হয়ে রয়েছে ঘরে
উপকার নেই, বড় ভয় হয়, মা বুঝি এবার যাবেই মরে।
এই পৃথিবীতে মা ছাড়া আমার আর যে কেহই নাই আপন
ডাক্তারবাবু, বাঁচিয়ে দাও গো এবার আমার মা'র জীবন।'
গম্ভীরস্বরে ডাক্তার কন—'যেতে পারি তবে একটা কথা
ভিজিট আমার বত্রিশ টাকা, বাঁধা এই রেট জান ত তা?'
জল-ভরা চোখে বললে অশোক—'টাকা কোথা পাব, জোটে না সাবু'
ডাক্তার কন—'তবে কেটে পড় দানসত্র তো খুলি নি বাপু।
এ্যাক্সিডেণ্টে ছেলেটার দু'টো চোখই নষ্ট হয়েছে, তাই
ছেলেকে সারিয়ে তুলতে আমার অনেক—অনেক পয়সা চাই।
চোখের ব্যাঙ্কে অভাব চোখের ভরসা হয় না মিলবে কবে
হয়তো অনেক মূল্যে সে চোখ বিদেশ থেকেই আনতে হবে।'

দিন সাত পরে আর একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এলো অশোক
—'ডাক্তারবাবু শীগ্‌গির চলো, মা আমার এখনই বুজলো চোখ।'
রুক্ষ কণ্ঠে ডাক্তার কন—'ভালো জ্বালাতন করলি সুরু
তোর মা মরেছে আমি করব কি, কে এলেন আমার বাপের গুরু!'
'ডাক্তারবাবু শীগ্‌গির চলো'—গম্ভীর গলায় বলে অশোক—
'তোমার ছেলেকে দিতে চাই আমি আমার মায়ের দু'খানি চোখ।'

ছড়া

শ্রী সুধীন্দ্র সরকার

অন্ধকারে রান্নাঘরে
নেংটি ইঁদুর চুপটি করে
খাচ্ছিল বিস্কুট;
কাটুস্‌-কুটুস্‌-কুট;

দুধের বাটি উল্টে দিয়ে
বললে পুষি গোঁফ নাড়িয়ে
ভাগটা আমায় ত্থাও;
মিঁয়াও-মিঁয়াও-ম্যাও!

হঠাৎ ভুলো ঘুমের থেকে
ধড়ফড়িয়ে উঠলো ডেকে—
ছুটলো যেন ফেউ:
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ!



ভোজন দক্ষিণা

শ্রী শিবরাম চক্রবর্তী

আমাদের বাসভুত ভাই এণ্ড কোম্পানি ডকে উঠে যাবার পর, কিছুদিন পরেই আবার আমাদের মাথায় ব্যবসার ফন্দি গজিয়ে উঠল।

এবারকার বুদ্ধিটা ভোলানাথের। কিন্তু এ-রকম বেয়াক্কেলে বুদ্ধি আর হয় না, আমি বলতে বাধ্য। সত্যি বাসের কারবারের চেয়েও ঢের বেশি অবাস্তব।

আমি বললাম, 'ব্যবসা তো করবি. কিন্তু মূলধন কৈ? টাকাকড়ি সব তো সেই বাসের ব্যবসাতেই হারাতে হয়েছে আমাদের।'

'আমাদের এক মাসতুতো ঠাকুর্দা……' বলছিল ভোলানাথ।

'কি বললি? কি রকমের ঠাকুর্দা?' জিজ্ঞেস করল শৈলেশ।

'আমার মাসির বাবা আর কী!' জানাল সে।

'সে তো তোর মারও বাবা রে। দাদামশাই বল!'

'ওই হ'ল। তা, তিনি বার্মা মুলুকে টিকের ব্যবসাতে বিস্তর টাকা কামিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। দেশে মানে এই কলকাতাতেই। আহিরীটোলায় তাঁর পৈতৃক বাড়ী আছে, সেখানেই উঠেছেন তিনি।'

'টিকের ব্যবসায় বড়লোক?' অবাক্ হয় শৈলেশ।

'ঠিক বলছিস!' আমিও কম অবাক্ হই নে।

'সত্যি না তো কি! বার্মায় গিয়ে টিকের ব্যবসায়ে বহুৎ লোক ধন-কুবের হয়েছে—কে না জানে!'

'ব্যবসায় টিকে থাকাই শক্ত।' আমি বললাম—'দেখলি না, টেকা দূরে থাক্, দাঁড়াতেই পারলাম না আমরা!'

'এ বাস-এর ব্যবসা নয় রে ভাই, টিকের ব্যবসা। বলছি নে?' বলল ভোলানাথ।

'টিকে-তামাকের ব্যবসায় বড়লোক?' আমার বিশ্বাস হতে চায় না, তবে হ্যাঁ, ব্যবসায় টিকে থাকতে পারলে হতে পারে। সব ব্যবসাতেই হওয়া যায় হয়তো।'

'আরে ধুর।' বলল সে, 'তামাক টিকের ব্যবসা না রে! যে-টিকে দিয়ে হামবসন্ত আটকায় তাও না। আর পণ্ডিতমশাই শ্লোক ঝেড়ে 'টিকা লিখহ' বলে যে ব্যাখ্যা করতে দেন তার কথাও বলছি না আমি। এ হচ্ছে আসল টিকের ব্যবসা।'

'আসলটি-কে ব্যক্ত করহ, বৎস!' আমি বললাম, 'বিস্তৃত বিবরণ সহ।'

'টিক হচ্ছে একরকমের কাঠ—বার্মামূলুকে মেলে কেবল।'

'কাঠ! তাই বল! তা, আকাঠের মতন অমন টিক টিক করছিস কেন তখন থেকে?' আমি বললাম।

'ঠিক ঠিকই বলছি।' বলল ভোলানাথ—'আর এটাও জানি যে তার থেকে দামী দামী আসবাবপত্র বানায়—টিক-উড্-এর ফার্নিচারের দাম সব চেয়ে বেশি। টিক্-এর জিনিস ঢের বেশিদিন টিকে থাকে বলেই ওই কাঠের নাম টিক হয়েছে কি না, তা আমি বলতে পারব না।'

'তা তোর দাদুর টিকের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক তা তো সঠিক বুঝতে পারছি না, দাদা।' বলল শৈলেশ।

'দাদুর নিজের ছেলেপুলে বলতে কেউ নেই, আছে কেবল অগাধ টাকা, লোকটা কি ধরনের জানিস? সেই যে মারা গেলে কাগজে ছবি ছেপে বেরোয়—আর লেখা থাকে—ওঁর খুব দান-ধ্যান ছিল, যেমন পরোপকারী তেমনি দাতা, দেশহিতৈষী মহাপুরুষ, কত লোককে—কত পরিবারকে গোপনে তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন—ইত্যাদি?'

'সে মারা যাবার পর জানা যায়, জ্যান্ত থাকতে টের পায় না কেউ!' আমি প্রকাশ করি।

'এখানে জ্যান্ত থাকতেই জানা যাচ্ছে। জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত আমার দাদু। তিনি চান বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে নিজের পায়ে খাড়া হোক সবাই—তিনি নিজে যেমনটি দাঁড়িয়েছেন। সেইজন্যে কেউ গিয়ে ব্যবসার জন্য তাঁর কাছে টাকা চাইলে তক্ষুণি তিনি মূলধন দিয়ে সাহায্য করেন—এমনিতেই।'

'বলিস্ কি রে!'

'তবে আর বলছি কী! আমার এক মামাত ভাই ব্যবসা করবে বলে বেশ কিছু টাকা বাগিয়ে এনেছে তাঁর কাছ থেকে।'

'কাঠের ব্যবসা?'

'না কাঠ নয় কাটলেটের। বলছে যে বিক্রি না-হয় নিজেই খেয়ে কাটিয়ে দেবে। পয়সা দিয়ে তাকে আর কাটলেট কিনে খেতে হবে না। ব্যবসাটা মন্দ নয়।' বলল ভোলানাথ।

'সে বুঝি কাটলেট খায় খুব?' জানতে চায় শৈলেশ।

'করেছে কাটলেটের ব্যবসা?' সঙ্গে-সঙ্গেই আমার সোৎসাহ প্রশ্ন। 'কোথায় তার সেই দোকানটা রে?'

'কাটলেট না কচু! সিনেমা দেখে ফুঁকে দিচ্ছে টাকাটা। কেবল রোজ চারটে করে দিলখোস কেবিনের কাটলেট কিনে নিজের দোকানের ব'লে পাঠিয়ে দেয় দাদুকে। দাদু খুব খুশী। বলছে যে কলকাতায় ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় ব্র্যাঞ্চ খুলতে আরো আরো টাকা সাহায্য করবে তাকে।'

'ভারী কাটখোট্টা তো!' আমি বলি, 'না, তোর দাদুকে বলছি না— তোর ঐ মাসতুতো ভাইটা।'

'মাসতুতো নয়, মামাত ভাই। মাসতুতো বলে অপমান করছিস্ আমার?' ভোলানাথের ভারী গোঁসা হয়।

'ওই হোলো। মাসীর গোঁফ বেরুলেই তো মামা।' আমি এই বলে ওকে সান্ত্বনা দিই।

'তাহলে তুই যাচ্ছিস না কেন?' শুধায় শৈলেশ: 'তুই গেলে তো অনেক বেশী টাকা পাবি। তোর দাদু যখন বলছিস্।'

'না, আমি গেলে হবে না। আমি তার আপন খুড়তুত মেয়ের ছেলে যে, বলছি না যে লোকটা ভারী পরোপকারী? পরের উপকার করে, নিজের লোকের কিচ্ছু করে না।'

'নাতিরা বৃহৎ হোক চায় না বুঝি?' আমি বলি, 'তাদের নাতিবৃহৎ থাকাটাই পছন্দ করে?'

'তুই যা।' বাতলায় সে আমায়, 'তুই তো দাদুর কেউ নোস্—যাকে বলে কাকস্য পরিবেদনা। তুই গেলে দেবে ঠিক।'

'কিন্তু কি ব্যবসার কথা বলব, বল তো?'

'যা মাথায় খেলে, যা মনে আসে তখন। ব্যবসার নাম শুনলেই দাতু অজ্ঞান। টাকা তো দেয়ই, খাওয়ায় আবার। খুব খাওয়ায়, বলল আমার মামাতো ভাই। কেউ কিছু খেলে খুব খুশী হয় নাকি। খুশী হয়ে টাকা দেয় তখন।'

'বলিস্ কি?' বলে জিভের জল টানি, 'সেকথা বলতে হয় আগে।'

সেদিন বিকেলেই বেরিয়ে পড়লাম ভোলানাথের দাতুর দিশায়। ততটা টাকার লোভে নয়, যতটা ভালোমন্দ চাখার লালসায়। সত্যি বলতে চম্‌চম্, ছানার গজা, ল্যাংচা, পান্তুয়া, লেডিকেনি, দরবেশ, শোনপাপড়ি, সন্দেশ, রাজ-ভোগ, মতিচুর—তারাই আমায় মুক্তারামের মুক্ত আরাম ছেড়ে অতিদূর আহিরীটোলায় টেনে নিয়ে গেল কান ধরে হিড়হিড় করে। নাম্বার খুঁজে বাড়ী বের করতেও দেরী হ'ল না।

বিরাট বাড়ী। অবারিত দ্বার। সোজা উপরে উঠে গেলাম।

দোতলার সামনের ঘরেই সৌম্যদর্শন বয়স্ক এক ভদ্রলোককে সোফায় বসে থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখে তিনি শুধালেন, 'কে তুমি?'

'আজ্ঞে, আমি ভোলানাথের মামাতো ভাই।' জবাব দিলাম, 'আপনার নাতি ভোলানাথ।'

'ও! ...তা, ভোলানাথ তো ঠিক আমার আপন নাতি নয়। মানে, আমি বলছিলাম যে ঠিক পৈতৃক নাতি নয়।'

'পৈতৃক নাতি!' আমার বিস্মিত কণ্ঠ থেকে বেরোয়। পৈতৃক সম্পত্তি হয় আমি জানতাম। পৈতৃক নাতি হয় আমার জানা ছিল না।

পৈতৃক নাতি, মানে, বাবা বিয়ে দিয়ে গেলে নিজের বৌয়ের মেয়ের ছেলে হলে যাকে বলা যায়। আমি তো বে-থা না করেই রেঙ্গুনে পালিয়ে গেছলাম যৌবনে—ব্যবসা করতেই। ...ভোলানাথ হচ্ছে আমার খুড়তুত ভাইয়ের শালীর ছেলে।'

'তাহলে অবিশ্যি তাকে সহোদর নাতি বলা যায় না, সত্যি।'

সায় দিতে হয় আমায়।

'তাই বলছিলাম তুমি ভোলানাথের কি রকমের মামাতো ভাই?'

'আমি...আমি...আমি......'আমতা আমতা করি। আমার আমিত্ব আমায় ছাপিয়ে উঠে আত্মপ্রকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সেদিন ভোলানাথের এক মামাতো ভাই এসেছিল কি না, রাখহরি না কি

যেন নাম। বলল যে সেই ভোলানাথের একমাত্র মামাতো ভাই, আবার তুমিও বলছ...'

'আজ্ঞে, একটু ভুল হয়েছে,' শুধরে নিই আমি, 'আমি নই, ভোলানাথই হচ্ছে আমার মামাতো ভাই। গুলিয়ে ফেলেছিলাম আমি। আমি হচ্ছি ওর পিসতুত ভাই।'

'তাই বলো!' শুনে তিনি ঠাণ্ডা হন—যেন মনের শান্তি খুঁজে পেলেন তিনি। 'তোমার নামটি কি?

'আজ্ঞে আমার নাম থাকহরি।'

মামাতো আর পিসতুতো দুই ভাইয়েরা নামের দুটো পিস মিলিয়ে আমি বিশ্বাসযোগ্য করে দিই।

'আশ্চর্য! আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বংশে দেখছি হরিনামের ছড়াছড়ি। তার নামও ছিল আবার রামহরি।' বলে তিনি আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন, 'তা তুমি খেয়ে বেরিয়েছ বিকেলে?'

'আজ্ঞে' বলে আমি চুপ করে থাকি। এ-কথার আর কি জবাব দেব? সত্যি বললে বলতে হয় যে এখানে এসে বেশ করে সাঁটবো বলে সেই সকাল থেকে দাঁতে কুটোটি দিয়ে পড়ে আছি। কিন্তু ভোলানাথের কথাটা দেখছি মিথ্যে নয় নেহাৎ। টাকার কথাটা না পাড়তেই তিনি বাবার কথাটা পেড়ে বসেছেন।

আহিরীটোলার বিখ্যাত সন্দেশের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠেছি। তিনি উঠে এসে আমার নাকের ডগা টিপে ধরলেন।

এ কী! খাবার নাম করে হঠাৎ আমার এই নাকমলা কেন? চমকে উঠতে হয়! এরপর আবার কানমলা খেতে হবে নাকি?

তারপর ঠোঁটে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'ঠাণ্ডা! ...দেখি, তোমার হাত দেখি।'

আমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'হাতও ঠাণ্ডা দেখছি। ভালো কথা নয়।'

তারপর তিনি আমার পায়ে হাত দিতে এগুচ্ছেন দেখে আমি তিন পা পিছিয়ে এলাম, 'একী! আমার বাপের বয়সী হয়ে আমার পায়ের ধুলো নেবেন সে কি হয়? আমি একটা পুচকে ছেলে?'

'তোমার পায়ের ধুলো নিতে যাব কেন? আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডা কিনা

দেখছিলাম কিনা তাই। ...দেখলাম যে একেবারে কিছু না খেয়ে রয়েছ! অনেকক্ষণ থেকে তোমার পেটে কিছু পড়ে নি। চার-পাঁচ ঘণ্টা না খেয়ে থাকলে রক্তের চাপ কমে যায় কিনা। দেহের প্রান্তসীমাগুলো ঠাণ্ডা মেরে আসে, হাতপার আঙুল, ঠোঁট সব হিমশীতল হয়ে যায়। কিছু খেলেই ফের রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে তক্ষুণি সব গরম হয়ে ওঠে আবার। দাঁড়াও, তোমাকে আগে কিছু খাবার দিই।'

বলে তিনি থার্মোফ্লাস্ক থেকে একটা গেলাসে গরম জল ঢাললেন, তারপর একটা কৌটোর থেকে সাদা গুঁড়ো মতন কি একটা জিনিস ঢাউস চামচের বড় বড় তিন চামচ গুললেন সেই জলে। গেলাসটা এগিয়ে বললেন—'নাও খেয়ে ফ্যালো।'

সুবোধ বালকের মতন ঢক ঢক করে গিলে ফেললাম কোনরকমে।

'কি রকম খেতে?'

'বিচ্ছিরি! তেতো! আমার তো কোন অসুখ করেনি, ওষুধ খেতে দিলেন কেন আমায়?'

'ওষুধ নয়, প্রোটিনেক্স্ এর নাম। প্রোটিন কাকে বলে জানো? মাছ মাংস, ডিম, দুধ, ছানা এই সব হচ্ছে প্রোটিন। সেইসব প্রোটিনের সারভাগ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্কাশিত করে বিচুর্ণিত অবস্থায় এই কৌটোয় রক্ষিত।, নেমন্তন্ন বাড়ী গিয়ে মানুষ যত মাছ, মাংস, ডিম আর সন্দেশ সাঁটাতে পারে পুরো তিন চামচে তুমি তার সারাংশটা সব খেলে এখন।'

'একটা পুরো ভোজ খেলাম! বলেন কি!' চোখের উপর ভোজবাজি দেখে আমার তাক লেগে যায়।

'হুবহু। তবে জিনিসটা দুধে মিশিয়ে খাওয়াই নিয়ম। কিন্তু দুধ এখন পাচ্ছি কোথায়? হরলিক্স দিয়ে খেলেও হ'ত। কিন্তু গোয়ালিনী মার্কা জমাট দুধের কৌটোও খালি, হরলিক্স নেই। তাই গরম জলে বানিয়ে দিলাম। তবে একটু চিনি মিশিয়ে নিলে হ'ত হয়তো। নাও হাঁ করো।' ব'লে এক চামচ চিনি আমার মুখগহ্বরে ঢেলে দিলেন তিনি।

'চিনি খেলে এনার্জি হয়। গ্লুকোজ খেলে আরও বেশী হয় অবশ্যি। গ্লুকোজ হচ্ছে চিনির সাবস্ট্যান্স। এইবার, ভিটামিন বড়ি খাওয়ানো যাক গোটাকতক। খাবার পরেই খেতে হয়। খালি পেটে খাওয়া নিয়ম নয় তো।'

এরপর তিনি ছোট শিশির ভিতর থেকে লাল লাল দুটি কি যেন বের করলেন—'এ হচ্ছে অ্যাডক্‌স্‌লিন। ভিটামিন এ আর ডি। এ খেলে চোখ ভাল থাকে। হাড়ের শক্তি বাড়ে। কব্‌জি বাড়ে। কব্‌জি মোটা হয়। দাঁত শক্ত হয়। নাও, খেয়ে ফ্যালো টুক্‌ করে।'

চিনি খাবার পর আমার এনার্জি হয়েছিল সত্যিই। আপত্তি করে বললাম, 'আমার চোখ এমনিতেই বেশ ভালো। দাঁতও খুব শক্ত।'

'এখন আছে—এর পর তো বয়েস হলে নড়বড় করবে। কিন্তু তুমি যদি বারবার ভিটামিন এ আর ডি খেয়ে যাও তো বয়েস হলেও তোমার দাঁত কক্ষণো নড়বে না। এই দ্যাখো না, অষ্টাশী বছর বয়স, আমার দাঁত ছ্যাখো।' বলে তিনি তাঁর দাঁতের দু'পাটি বিকশিত করলেন।

তাঁর দন্তবিকাশ দেখেও আমার তেমন উৎসাহ হ'ল না। বললাম, 'প্রোটিন তো খেলাম, আবার কেন? ওতেই হবে।'

'তা কি হয়? প্রোটিনে তো খালি মাংসপেশী গজায়। পেশীর তন্তুরা গড়ে ওঠে। হাড় কি তাতে হয়? হাড় হয় ডি-ভিটামিনে। আর এ-ভিটামিনে চোখ হয় তাজা। দুধে আছে ঐ দুই ভিটামিন। এক পিঁপে দুধ খেলে যতটা এ-ডি পাওয়া যায়, দুটি ক্যাপ্‌সুলে তুমি তাই-পাবে। এই নাও, দেরী কোরো না, গিলে ফ্যালো চট করে।' সঙ্গে সঙ্গে খাবার নিয়ম বলে বড়ি দুটো একরকম জোর করে তিনি আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন।

'এবার হজম করার পালা। এইসব হজম করার জন্য বি-ভিটামিনের দরকার। বি-কম্‌প্লেক্‌স খাওয়াই তোমায় এবার…।'

হজম করার পালা শুনেই আমার পিলে চমকে গিয়েছিল, পালার জায়গায় আমি যেন ঠ্যালা শুনলাম। খাবার ঠ্যালার পরে এখন বললাম—'ওষুধের কোন দরকার নেই আমার। হজম করার ঠ্যালা? তাড়াতাড়ি এমনিতেই আমার বেশ হজম হয়।'

'বললেই হ'ল—এমনিতেই কিছু হয় না। দাঁড়াও, তোমায় হজম করাই। হজম করা কি সহজ ব্যাপার হে! এই যে বি-কম্‌প্লেক্‌সের বড়ি দেখছ—কম্‌প্লেক্‌স্ মানে একটা গ্রুপ, বি-ভিটামিনের সম্প্রদায়। এর ভেতরে আছে একাধিক বি-ভিটামিন। বিভিন্ন কাজ এদের—বি-ওয়ান্ হচ্ছে বেরিবেরির ওষুধ, বাতও আটকায়।'

বাধা দিয়ে বলি, 'আমার বেরিবেরি হয় নি। বাত কক্ষণো হয় না।'

'হয় না, কিন্তু হতে কতক্ষণ। বাত হলেই তোমায় চিৎ করে ফেলবে, বিছানা থেকে উঠতে দেবে না। তারপর আর কোন বাতচিৎ নেই, কাজেই তার আগেই···প্রিভেন্‌সন ইজ বেটার দ্যান কিওর—বলে থাকে শোনো নি? তারপর, বি-টু-থ্রি-ফোর—এদেরও নানান গুণাগুণ আছে তার বিশদ ব্যাখ্যানের দরকার নেই, তবে তোমাদের এখন ছাত্রজীবন—বি-সিক্‌স্ মানে পাইরোডিক্‌সিন—এটা খাওয়া তোমাদের বিশেষ দরকারী। এতে মেমরী বাড়ায়। আর বি-টুয়েল্‌ভ হচ্ছে রক্তবর্ধক।'

রক্তের জন্য আমার কোন লালসা ছিল না, তবে মেমরিতে আমি সত্যিই কাঁচা—তাই একটু প্রলুব্ধ হয়ে হাত বাড়ালাম, 'দিন তাহলে দুটো বড়ি দিন, খাই। মেমরিটা আমার চটপট বাড়াতে চাই।'

'বাঃ, এই তো বেশ! লক্ষ্মীছেলের মতন কথা। দুটো কেন, চারটে খাও। এন্‌তার আছে। পুরো এক শিশি দিয়ে দেব তোমাকে।'

বি-ভিটামিন খাইয়ে তিনি বললেন—'এবার, সি-ভিটামিনটা খেলেই পুরো হয়ে যায়। এ-ডি আগেই খেয়েছ, বি-ও খেলে, এবার সি। ৫০০ মিলিগ্রামের এক বড়ি রোজ একটা খেলেই যথেষ্ট।'

চার বড়ি খেয়ে আমার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল—তারপর ৫০০ মিলিগ্রাম সি-য়ে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম আর তিনি বলে চললেন, 'আরো সব ভিটামিন রয়েছে, ই' কে, ইত্যাদি—সেসব খাবার তোমার দরকার নেই, প্রোটিন হল, কার্বোহাইড্রেট হয়েছে। এবার কিছু ফ্যাট। তাহলেই হয়ে যায়। তোমার খাওয়াটা কম্‌প্লিট হয়।' ফ্যাট বলে না, ফট্ করে দেরাজ থেকে তিনি একটা পেল্লায় বোতল বার করলেন, বললেন—'এ হচ্ছে ফ্যাটের সেরা ফ্যাট। খাঁটি কডলিভার তেল।' কডলিভার শুনেই চমকে উঠেছি! ভোজন পারাবার পার না হলে টাকার কথাটা পাড়া যাবে না। তাই হাবুডুবু খেয়েও কোনরকমে সাঁতরেছি, এবার কডলিভারে কাতরে উঠলাম। তিনি বলছিলেন, 'এই কডলিভারের তিন চামচ আর তার সঙ্গে গ্রেন দুই কুইনিন—মিশিয়ে খেলেই, কডলিভার প্লাস কুইনিন—যেমন খাদ্য তেমনি একটা বলকর টনিক।'

টনিকের নাম শুনেই আমি টন্‌কো হয়ে উঠলাম। গা বমি বমি করতে লাগল আমার। পাছে ভোলানাথের দাদুর গায়ে বমি করেই বসি—তাই বম্‌বিং এর আগেই তিনলাফে সিঁড়ি টপকে ফুটপাথে নেমে আমার ওয়াক!

সেই ওয়াক্-এর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় প্রোটিন ভিটামিন, ইত্যাদি, এমন কি যে কডলিভার খাই নি তারও খানিকটা বেরিয়ে গেল।

তারপর সেখান থেকে সটান আমার ওয়াকিং সুরু। উঠলাম এসে সোজা ভোলানাথের আস্তানায়।

'এই তোর দাদু! এমনি সে খাওয়ায়? খাইয়ে খুশী হয় আবার। খুশী হয়ে টাকা দেয়! তোর দাদুর নিকুচি করেছে?'

আমি তাকে মারতে বাকী রাখি কেবল।

আগাগোড়া সব সে কান দিয়ে শোনে, তারপর মাথা নাড়েঃ

'রাখহরি কি মিছে বলেছে। মিথ্যে কথা বলার ছেলেই নয় সে। পাকা বিজনেস্ ম্যান। সব কটা খাবার সে মুখ বুজে খেয়েছিল, প্রত্যেকটা আইটেম চেয়ে চেয়ে নিয়েছে আবার? চেখে চেখে তারিয়ে খেয়েছে। কডলিভার প্রায় দশ চামচ গিলেছিল—বিশ গ্রেন কুইনিন্ তারপর। চামচটা অব্দি চেটেপুটে খেয়েছে। তবে না খুসি হয়েছে আমার দাদু! তখন না দিয়েছে টাকা। বলেছে যে আবার এসে খাবে—যত খুসি—যতো তোমার প্রাণ চায়। ফের, ফের টাকা দেব তোমায়। আর তুই খেলিই না তো কী হবে! ভোজন করলে তারপরে তো দক্ষিণার কথা—তখন তো দক্ষিণা'! গজগজ করে ভোলানাথ, গঞ্জনা দেয় আমাকে।

আলোর দেশ

শ্রী দীনবন্ধু আঢ্য

এক যে আছে মজার দেশ
কেবল সেথায় আলো,
আঁধার বলে নেইকো কিছু
ঠাঁই পায় না কালো।
নেইকো সেথা মাঝ বয়েসী,
নেই যে বুড়ো বুড়ি,
নেই সেথা ভাই, জোয়ান-মরদ
উনিশ কিংবা কুড়ি।

কেবল সেথা বাস করে ভাই
খোকা খুকির দল,
হিংসা, দ্বেষ তাইতো নেই
আনন্দে ঝল্‌মল্।
মন চায় যে ওদের দেশে
একেবারেই যাই,
বয়স ধর্ম দেয় যে বাধা
তাইতো উপায় নাই।

অবাক্ কাণ্ড

শ্রী সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বলবো কি ভাই, অবাক্ লাগে ভাবতে গেলে কাণ্ডটা
বোঁ-বাঁই-বাঁই ঘুরছে সদাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা !
চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীকে বিরামবিহীন পাক দিয়ে,
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা হচ্ছে নাকি তাই নিয়ে !
সূর্য ঘিরে পৃথিবীটাও পাক খাচ্ছে, থামছে না,
লাট্টু হয়ে দিন-রাত্তির ঘুরছে তবু ঘামছে না !
বছর ভরে সূর্যটাকে পরিক্রমা করছে সে,
ঘূর্ণি-নাচে কক্ষণো তার তাল-ভঙ্গ নাইকো যে !
সূর্য আবার চলছে ঘিরে আরেক মহা-সূর্যকে,
বুঝতে নারি ঘুরছে সবাই খেয়াল-খুশির কোন্ ঝোঁকে !
ঝরণা নামে পাহাড় থেকে, আকাশে মেঘ যায় ভেসে,
বাতাস ছোটে আপন মনে—কী জানি কার উদ্দেশে !
নদীর স্রোত চলছে বেগে কোন্ অজানার সন্ধানে—
ঘুরছে সবাই, ছুটছে—যাদের চলার নেশায় মন টানে !
এই দুনিয়ায় স্থির কিছু নেই, শান্তও কেউ নয় মোটে—
আমার বেলাই দেখছি শুধু গালমন্দ সব জোটে !
টো-টো করে ঘুরে বেড়াই—সেটা আমার দোষ নাকি ?
সবাই যখন 'ভবঘুরে', আমি না হয় 'উড়ন-চাকি'।

যেমন ভাবনা

শ্রী ইলা গুপ্তা

যদিও থাক দুঃখে কষ্টে
ভাববে তুমি সুখী।
ভাববে মনে তোমার চেয়ে
আছে অনেক দুঃখী॥

তা'হ'লে আর তোমার মনে
দুখ পাবে না ঠাঁই।
সুখে তোমার কাটবে জীবন
সুখ হবে দুখটাই।



অপদেবতা

শ্রী সুমথনাথ ঘোষ

ভূতে গল্প লেখে! এমন অসম্ভব কথা ভূ-ভারতে কেউ কোনদিন শুনেছে বলে আমার জানা নেই। ছেলেবেলা থেকে দেশী বিদেশী হরেকরকমের গল্প পড়েছি, তাছাড়া লোকের মুখে সম্ভব অসম্ভব কত যে কাহিনী শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই! কিন্তু সত্যি-কথা বলতে কি লেখক-ভূতের কথা, জীবনে এই প্রথম শুনলুম। অবিনাশের মুখে।

টেবিলের ওপরে সজোরে একটা ঘুষি মেরে সে বললে, আমার নিজের চোখে দেখা, অবশ্য তোরা বিশ্বাস করলি বা না করলি তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ তোমার আমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে যে বিশাল বিপুল জগৎ পড়ে রয়েছে, তার কতটুকু খবর আমরা জানি?

অবিনাশ যদি গল্প-লেখক হতো তাহলে ভাবতুম, পুজোর বাজারে পাঠকদেয় চমক লাগাবার জন্যে, এ তার উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত এক উদ্ভট কল্পনা!

কিন্তু অবিনাশ একেবারে ভিন্ন লাইনের লোক।

সে নিজে বলে, মা সরস্বতীর আমি তেজ্যপুত্তুর! চোর-ডাকাত, খুনী আসামী নিয়েই আমার কারবার, দারোগাগিরির চাকরী করতে করতে ভুলেই গেছি যে এককালে তোদের সহপাঠী ছিলুম।

তার ওপর জীবনের অর্ধেকটা যে মফস্বলেই কেটে গেল! বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের ভেতরে চেপে নিলে।

বাস্তবিক এককালে আমরা একেবারে অভিন্নহৃদয় ছিলুম। পটলা, চণ্ডী, সত্য, অবিনাশ আর আমি। পঞ্চপাণ্ডব বলে একদিন কলেজে সবাই আমাদের ঠাট্টা করতো! আমাদের এই পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র অবিনাশই

চাকরীর খাতিরে দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল। অবিনাশ কিন্তু যখনই কলকাতায় আসতো আমাদের সঙ্গে দেখা না করে যেত না। তা সে এক ঘণ্টার জন্যেই হোক্ বা পনেরো মিনিটের জন্যে হোক্।

বেশ মনে আছে, সেদিন কিসের একটা ছুটি। আমরা চারজনে বিকেল থেকে জমায়েৎ হয়েছি আমার বৈঠকখানায়। এমন সময় হঠাৎ আকাশ যেন ভেঙে পড়লো। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার ঘরের সামনের গলিটায় এত জল দাঁড়িয়ে গেল যে তার মধ্যে রিক্সা পর্যন্ত ভয় পায় ঢুকতে।

চণ্ডী উত্তর কলকাতা থেকে এসেছিল আমার বাড়ী বালীগঞ্জে। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে সে বারে বারে তাকাচ্ছিল, আর জিজ্ঞেস করছিল, হাঁরে কি করে বাড়ী ফিরে যাবো?

পটলা বললে, তুই কি একলা বাড়ী যাবি, আমাদের বুঝি ঘরবাড়ী নেই। আয় তার চেয়ে একটা ভূতের গল্প বলি। এই দুর্যোগে বেশ মুখরোচক লাগবে! ওদিকে সময়ও কোথা দিয়ে কেটে যাবে বুঝতে পারবি না।

ওসব এখন ভাল লাগছে না! তাছাড়া ভূত-ফুত আমি বিশ্বাস করি না কোনদিন, জানিস ত? বলে সে মুখ বেঁকালে।

ঠিক সেই সময়! ঠক্ ঠক্ করে দরজায় শব্দ হলো! বাইরের দরজাটা যেমন খুলেছি, দেখি অবিনাশ!

এ্যাঁ, অবিনাশ তুই! এই দুর্যোগে এলি কি করে? সবাই একসঙ্গে সেকথা জিজ্ঞেস করতে সে বললে, কেন হেঁটে। ভগবান পা দু'খানা দিয়েছে কি করতে? আমরা পুলিশের লোক তায় মফস্বলে থাকি, এই রকম দিনেই আমাদের কাজ জমে ভাল। তারপর কবে কোন বর্ষার দিনে কত বড় বড় চোর-ডাকাত ধরেছে, তার কথা বলতে থাকে একে একে।

পটলা বলে, ওসব গল্প এখন রাখ ভাই, তার চেয়ে কোন ভূত-প্রেতের গল্প বল, এই বর্ষার দিনে চায়ের সঙ্গে জমবে ভাল। শুনেছি, পল্লীগ্রামের ভাঙাবাড়ী, বনজঙ্গল, শ্যাওড়া গাছে নাকি যতসব ভূতের আড্ডা!

হেসে উঠলো অবিনাশ। চোদ্দটা বছর ধরে বাংলাদেশের কত গাঁয়ে ঘুরলুম, কিন্তু একটা ভূতও কখনও দেখি নি! বলে চায়ের পেয়ালাটায় শেষ চুমুক দিতে গিয়ে বললে—তবে হ্যাঁ, দেখি নি বললে একেবারে মিছে কথা বলা হবে। দেখেছি, কিন্তু তোমাদের এই বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে নয়, মধুপুরে এক বাগান-বাড়ীতে!

—আরে কি রকম শুনি শুনি! সবাই এবার কৌতূহলী হয়ে উঠি!

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বলে অবিনাশ আরম্ভ করে দিলে। সেবার মধুপুরে 'চেঞ্জ'-এ গিয়েছিলুম সপরিবারে।. বাহান্নবিঘেতে ঢুকতেই বাঁ হাতে এক চমৎকার বাংলো পেয়েছিলুম। এমন ফুলফোটা ইউক্যালিপটাস্ গাছ দিয়ে ঘেরা সুন্দর বাংলোতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, সত্যিকথা বলতে কি জীবনে সেই প্রথম! বাড়ীর তুলনায় ভাড়াটা বেশ কম বলেই আরো ভালো লেগেছিল সকলের।

রবিবার ওখানে হাট বসে। তরিতরকারী কিনে মিষ্টি কিনতে ঢুকেছি বর্ধমান মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এমন সময় একটি ছোকরা এগিয়ে এসে বললে—মেসোমশাই কবে এলেন? চিনতে পারছেন?

একটু পরে বাপের নাম বলতে, বললুম—ভেরি সরি। তা তোমরা এখানে কোথায় উঠেছো বাবা?

ছেলেটি বললে—কালিপুর টাউনে, এক ডাক্তারবাবুর বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। আপনারা কোন্‌দিকে আছেন?

বললুম—অনেকটা দূরে। তবে ভারী সুন্দর বাড়ীটা। এসো না বাবা একদিন বিকেলের দিকে বেড়াতে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবো মেসোমশাই।

বলে ছেলেটি শুধালো—আপনাদের বাংলোটার কি নাম?

বললুম—পাইন ভিলা।

কিন্তু নামটা শোনা মাত্র ছেলেটির মুখটা যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর একটু থেমে বললে—সেই লাল রঙের পাঁচীল ঘেরা বাড়ীটা, চারিদিকে ইউক্যালিপটাসের গাছ আর ভেতরে সুন্দর ফুলের বাগান ত?

বললুম—রাইট, তুমি চেনো নাকি বাড়ীটা?

—হ্যাঁ। আমিও প্রথমে ওই বাড়ীটা পছন্দ করেছিলুম কিন্তু রিক্সওলাটা নিষেধ করলে। বললে—এমন সুন্দর বাড়ীটা তালাবন্ধ পড়ে আছে, ভাড়া হয় না কেন, বুঝতে পারছেন না? এতে অপদেবতা আছে।

হেসে বললুম—তাই নাকি! আমি পুলিশের লোক, ভূতে ভয় পাই না। তবে শুনেছি, এখানের রিক্সাওলাগুলো কমিশন পায় ভাড়াটে ধরে দিলে বাড়ীওলার কাছে। তুমি ছেলেমানুষ, তাই তোমাকে ওই বলে, অন্য বাড়ীতে নিয়ে গেছে বেশী টাকার লোভে!

ছেলেটি এবার কণ্ঠে বিস্ময় চেপে বললে—আপনি ত তিন রাত্তির কাটিয়েছেন, সে রকম কিছু বুঝতে পারেন নি ?

—না। বলে আবার হেসে উঠলুম।

বলা বাহুল্য, বাড়ীতে এসেও ও-কথাটা কাউকে বলি নি। আমার স্ত্রীকেও নয়। কারণ ওসব ভূতপ্রেত আমি কোনদিন বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু আশ্চর্য! সেইদিন রাত্রে। বোধহয় তখন আটটা কি সাড়ে আটটা বেজেছে। আমি ভেতরের ঘরে বসে হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোয় মেজ ছেলেটাকে পড়াচ্ছি আর ছোট মেয়েটাকে খাইয়ে-দাইয়ে আমার স্ত্রী ঘুম পাড়াচ্ছে সামনের ঘরে। বড় ছেলেটা তখনও পাশের ছোট ঘরটাতে বসে নিবিষ্টমনে কি যেন লিখছিল খাতায়। এমন সময় হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে আমার স্ত্রী ছুটে এসে বললে—ওগো দেখতো শীগ্‌গির টর্চটা নিয়ে বাইরে বেরোও ত, কে যেন একটা লোক এক হাতে টর্চ নিয়ে আলো জ্বালতে জ্বালতে ফটক খুলে ভেতরের দিকে এলো !

আমি তৎক্ষণাৎ বিছানার তলা থেকে টর্চটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলুম। ছেলে-মেয়ে, গিন্নী সবাই আমার সঙ্গে বাইরে এলো। কিন্তু এদিক ওদিক বাগান, ফটক সব আলো ফেলে ফেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথায় কিছু দেখতে পেলুম না।

তখন স্ত্রীর ওপর রাগ হলো। বললুম—মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, নাকি স্বপ্ন দেখছিলে ?

যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালি লাগে না, বিশ্বাস করো। ফটকের কাছে হঠাৎ কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠতেই আমি মশারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে জানালার পাশে এসে যেই দাঁড়িয়েছি স্পষ্ট দেখলুম একটা রুগ্নগোছের লোক। এক হাতে তার লাঠি, আর এক হাতে টর্চ। অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছে না বলে মাঝে মাঝে আলো জ্বালিয়ে এগিয়ে আসছিল।

—ওই ত কুকুরটা ওখানে বসে রয়েছে বাবা !

বলে উঠলো আমার মেজ ছেলেটা। টর্চটা টিপতেই দেখি, ওই বাড়ীর শেষ-প্রান্তে যে ঘরটায় তালাবন্ধ তার সামনে বসে আছে কুকুরটা।

আমার স্ত্রী বলে উঠলো, হ্যাঁ, ওই লাল কুকুরটাই ফটকের কাছে এতক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাচ্ছিল। এখন 'গেট' থেকে পালিয়ে এসে, কেমন চুপচাপ ওখানে বসে আছে।

পরের দিন আবার এক কাণ্ড! দুপুরে আমরা সবাই যখন নিদ্রায় মগ্ন হঠাৎ ছোট মেয়েটা কেঁদে উঠলো, মা এই দেখো আমি ছবিটা এঁকেছিলুম তাতে লালরঙ মাখিয়ে দিয়ে ছুটটে পালিয়ে গেল একটা মেয়ে!

—মেয়ে? কোন্ মেয়ে, কোন্‌দিকে পালালো? —বলে ধড়মড় করে উঠে পড়লো আমার স্ত্রী! কিন্তু সব দরজাই ত বন্ধ, কোনদিক দিয়ে মেয়ে ঢুকবে? তাই ধমকাতে লাগলো তাকে, মিছিমিছি আমার ঘুমটাকে ভাঙিয়ে দিলি? তারপরে বললে—দেখি, তোর ছবিটা। কিন্তু ছবি দেখে একেবারে হতভম্ব! তখন আমায় ডেকে তুলে ছবিটা দেখালে আর বললে—একটা মেয়ে নাকি ঘরে ঢুকেছিল, ও তাকে দেখেছে—তাড়া করতে সে পালিয়ে গেছে! অথচ দরজাগুলো সবই বন্ধ! —এই বলে একটু থেমে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে —এ বাড়ীতে কি তবে ভূত আছে?

আমি ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলুম—বাজে কথা বলো না, ছেলে-মেয়েরা তাহলে ভয় পাবে।

সেদিন সন্ধ্যা তখনো হয় নি। সবে অপরাহ্নের শেষে আলো পশ্চিম আকাশের গা থেকে অদৃশ্য হয়েছে, এমন সময় বাগান থেকে কতগুলো ফুল তুলে ঘরে রাখতে গিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে আমার স্ত্রী বললে—এ বাড়ীতে নিশ্চয় ভূত আছে। তার সারাদেহে কাঁটা উঠেছে, গলার স্বর থর থর করে কাঁপছে। বললে—আমি স্পষ্ট দেখেছি, বিশ্বাস করো। ওই পাশের ঘরটায় বড়খোকা লেখাপড়া করে যে টেবিল-চেয়ারে, ঠিক সেইখানে বসে একটি লোক কি যেন লিখছিল। আমি ফুলগুলো খোকার টেবিলে রাখতে যাচ্ছিলুম। এমন সময় দরজার ফাঁকে চোখ পড়তেই, ওরে বাপরে····থর থর করে তার সারা দেহ কাঁপছে।

এবারে কি বলে সান্ত্বনা দেবো, সে বলে উঠলো—এ-বাড়ীতে আর নয়! কালই এখান থেকে চলো অন্য কোথাও। কেবল আমি নয় তোমার ছোট মেয়েটাও ত দেখেছে।

কথা হলো, পরের দিন আমরা সকালে বাড়ী খুঁজতে বেরুবো এবং বাড়ী পাওয়া মাত্র মাল-পত্র নিয়ে উঠে যাবো।

কিন্তু সেইদিন রাত্রে যাকে বলে 'ক্লাইম্যাক্স' একেবারে চূড়ান্ত ঘটে গেল।

পটলা সাগ্রহে বলে উঠলো—কি রকম? তোর বউয়ের ঘাড়ে-টাড়ে চাপলো নাকি?

অবিনাশ বললে—আরে তাহলে ত বাঁচতুম। ভূত লোকের ঘাড়েই চাপে শুনেছি, কিন্তু এ যে তার চেয়েও সাংঘাতিক, অবিশ্বাস্য এক ঘটনা!

আমরা সবাই এবার একসঙ্গে বলে ফেললুম—কি রকম অবিশ্বাস্য, চট করে বলে ফেল্! আর 'সাস্‌পেন্স'-এ রাখিস্ নি!

সত্যি এবার অবিনাশ যা বললে, আমরা তা শুনে বোবা বনে গেলুম।

চণ্ডী বলে উঠলো—এ কখনো সম্ভব নয়। এ তোমার বাগ্‌বাজারী গুল্।

সত্য বললে—ঢেরঢের ভূতের গল্প শুনেছি কিন্তু বাপের জন্মে এ রকমটা কখনো শুনি নি। এই প্রথম শুনলুম তোর মুখে!

টেবিলে ঘুষি মেরে অবিনাশ বলল—আগে শোন্ সবটা, তারপর আমায় বলিস্। হাতে হাতে প্রমাণ না পেলে আমি-ই কি বিশ্বাস করতুম এ-সব?

—হ্যাঁ, সেদিন রাত্রে আমার স্ত্রী বললে—দেখো একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে! এ কেমন করে সম্ভব, আমার ত কিছুতেই মাথায় আসছে না। বড়খোকা তিন চারদিন ধরে ওই ঘরে বসে যে গল্পটা লিখেছে, তুমি পড়লে অবাক্ হয়ে যাবে। যেমন তার ভাষা, তেমনি স্টাইল, তেমনি প্লট। পড়লেই মনে হয় কোন পাকা হাতের লেখা। অথচ বড়খোকা স্কুলের ম্যাগাজিন্-এ যে দু'চারটে গল্প লিখেছে সব-ই কাঁচা লেখা, সবে ত শুরু করেছে।

অবিনাশ একটু থেমে আবার বললে—তাহলে তুমি কি বলতে চাও?

—আমার স্ত্রী তখন যা বললে তা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে বললে—ঠিক ওই গল্পটা প্রবাসী পত্রিকাতে বছর আষ্টেক আগে বেরিয়েছিল। হুবহু এই প্লট, এই ভাষা, এই লেখা!

জিজ্ঞেস করলুম—তা কেমন করে হয়। এদিকে তোমার ছেলে বলছ তিনচার দিন ধরে নিজে ওটা লিখেছে!

—হ্যাঁ, সেটাই ত ভাবনার কথা। তাহলে কি, সেই গল্পের লেখকের মৃত্যু হয়েছে? সে ভূত হয়েছে।

পটলা বললে—সত্যি খুব জমিয়েছিস্? তারপর কি করলি? কি করে বুঝলি যে ও গল্পটা ভূতের লেখা?

—বলছি শোন। বলেই অবিনাশ শুরু করলে—পরদিন সকালে মালিটাকে গিয়ে চেপে ধরলুম। বললুম, এ-বাড়ীতে ভূত আছে, সবাই বলে কেন, সত্যি কথা বল। তোকে বকশিস্ দেবো!

—ও তখন বললে—অনেকদিন আগে একটা বাবু এখানে অসুখ নিয়ে

এসেছিল। সে কেবল কাগজ কলম নিয়ে ওই ঘরটায় বসে কি লিখতো। দিনরাত তার ওই এক কাজ লেখা-লেখা আর লেখা! তারপর এইখানেই লোকটা মরে গেল। সেই থেকে বাবু এ-বাড়ীতে যারা ভাড়া আসে, তারাই দু'একদিন থেকে পালিয়ে যায়। একজনরা পনেরো দিন ছিল। তাদের একটা ছোট মেয়ে ছাদ থেকে পড়ে মরে যায়। তারপর থেকে এ-বাড়ীতে আর কোন লোক এসে থাকে নি।

আমি এবার বললুম—এ-থেকে কি করে বুঝলি যে গল্পটা সেই ভূতের লেখা।

অবিনাশ বললে—তারপরই কলকাতায় গিয়ে আমার স্ত্রী পুরোনো 'প্রবাসী'টা খুলে দেখে, হুবহু একেবারে মিলে যাচ্ছে। তখন সেই গল্পের লেখকের নাম দেখে আমার স্ত্রী চমকে ওঠে। এ যুগের একজন খ্যাতনামা লেখক তিনি।

বললুম—কিন্তু তিনি ত বেঁচে আছেন!

—হ্যাঁ। সেইখানেই ত আসল রহস্য। মালির খাতা থেকে সেই লেখকের নাম-ধাম, ঠিকানা আমি লিখে এনেছিলুম। আমি পুলিশের লোক, বুঝতেই পারছিস। তারপর একদিন খুঁজে খুঁজে নদে জেলার ঘূর্ণিগ্রামে সেই ঠিকানায় গিয়ে হাজির হয়ে লেখকের মাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জানলুম ওঁর ছেলের নাকি সাহিত্যিক হবার সখ ছেলেবেলা থেকেই ছিল। কিন্তু গরীব বলে কেউ তাকে আমল দেয় নি। এখান থেকে কাগজে, পত্র-পত্রিকায় যত লেখা পাঠায় সব ফেরত আসে, একটাও বেচারী ছাপা দেখে যেতে পারে নি। তখন হতাশ হয়ে আর লেখা কোথাও পাঠাতো না। শুধু নিজের মনে লিখে যেতো ঘরে বসে।

এইভাবে মন-গুমরে থাকতে থাকতে একদিন তার যক্ষ্মা রোগ ধরলো। তাকে নিয়ে চলে গেলুম মধুপুরে হাওয়া বদল করতে। সেইখানে, একদিন তার সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো এক বড়লোকের ছেলের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তার কাছে সে সমস্ত লেখাগুলো দিয়ে বলে—আমার জীবন ত শেষ হয়ে এলো, আর হয়ত বেশীদিন বাঁচবো না। তুই বড়লোক, শহরে থাকিস। অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে, যদি একটা গল্পও কোনরকমে মৃত্যুর আগে ছাপা দেখে যেতে পারি, তাহলে সুখে মরতে পারবো। নইলে, এই লেখাগুলো সব গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিস্!

অবিনাশ এবার একটু থেমে বললে—আমি তখন তার সেই বড়লোক বন্ধুর নামটা কি জানতে চাইলুম। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে বুড়ী তখন যে নামটি বললেন, শুনে আমার গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। একেবারে হুবহু সেই ব্যক্তির নাম। যিনি আজ এ যুগের একজন খ্যাতনামা লেখক বলে দেশে সুপরিচিত।

এই বলে অবিনাশ চুপ করলে, আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম

কেমন হতো ?

শ্রী অমরনাথ রায়

জড়ের যদি থাকতো জীবন
জীব হতো নিষ্প্রাণ—
বলতো কথা গাছপালারা
সারাটা দিনমান।

দিনটা যদি আঁধার হতো
থাকতো রাতের আলো,
রাতটা এসে ঘুচিয়ে দিতো
আঁধার দিনের কালো।

বল্ দেখি ভাই কেমন হতো
ঘটলে এসব ভাই ?
ঘোর কলিতে এমন ধারা
ঘটতে মানা নাই।

বর্ষার দিনে

শ্রী বিবেক রায়

কালো মেঘে আকাশ ঢাকে
বর্ষা আসে নেমে,
ঝির ঝির ঐ বৃষ্টি পড়ে
একটু থেমে থেমে।

নীল গগনের প্রান্ত যেন
ধোঁয়ায় গেছে ঢেকে
ঝুম্‌কোলতা লুটিয়ে পড়ে
মাটির পরে বেঁকে।

রাস্তা দিয়ে চলছে ছাতা
কাদায় ভরা পথ,
তারই মাঝে চলছে ছুটে
কলকতার রথ।

নজরুল

সামসুল হক

'বাংলা' কেমন যেন গন্ধময় সুমধুর নাম,
হাজার শিশুর মতো ধানশিষ করিতেছে খেলা—
চুরুলিয়া গ্রামটিতে ফলিয়াছে সোনামুখী আম,
একটি কিশোর সেথা বাঁশি হাতে ঘোরে সারাবেলা।
মুখে মুখে ছড়া কাটে, ছায়াঘেরা অশথের তলে
গান বেঁধে সুর ক'রে গেয়ে যায় পাড়ায় পাড়ায়,
সকলেই ভালোবাসে, লোকে তাকে 'দুখু মিয়া' বলে,
টুকটুকে দুখু মিয়া কতো কথা তাদের শোনায়।

সেই শিশু দুখু মিয়া একদিন এই বাংলায়
গরীবের—ব্যথিতের গান গেয়ে রাঙালো আকাশ:
যেমন আগুন ঝরে বোশেখের কৃষ্ণচূড়ায়,
বললে—মানুষ হয়ে মানুষের কোনো সর্বনাশ
ক'রো না ক'রো না, ওগো পৃথিবীর মানুষেরা শোনো,
মানুষ—মানুষ, তার ছোটবড়ো ভেদ নেই কোনো।

অংবোল তাবোল

শ্রী হিমালয়নির্ঝর সিংহ

কাঁকুড়গাছির উড়ে ঠাকুর কাঁকুড় করে রান্না,
চোরবাগানে চোর এসেছে—থামা খোকা কান্না।
কাঁটাপুকুর ভর্তি কাঁটায়; মাণিকতলার 'মাণিক'
বালিগঞ্জে ভর্তি বালি ঘুরে এসো খানিক
সিংগীবাগান গিয়ে খেয়ো সিংগীমাছের ঝোল;
বড়বাজারে বড় লোকেরা করছে গণ্ডগোল।
চিলেকোঠায় চিল ঢুকেছে,
থামা খোকা কান্না।
তোর জন্যে তৈরী আছে
হরেক রকম রান্না।



বাবা কেষ্ট পেয়েছে

শ্রী প্রবোধ সরকার

১ম দৃশ্য

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা। সময় সকাল—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, পাত্র, মিত্র, অমাত্য, যে যার আসনে বসে আছেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—কই, গোপালকে তো দেখছি না!

অমাত্য—আজ ক'দিন হোল মহারাজ, গোপাল রাজসভায় আসতে প্রায়ই দেরী করছে।

কৃষ্ণচন্দ্র—এর কারণ কি অমাত্য?

অমাত্য—আজ্ঞে, এর কারণ একমাত্র গোপালই জানে!

[গোপাল রাজসভায় এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার জন্য শুয়ে পড়ল—
মহারাজের পায়ের কাছে]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—গোপালের ভক্তির মাত্রা আজ কিছুটা বেশী বলে মনে হচ্ছে।

অমাত্য—আর কতক্ষণ উপুড় হয়ে প্রণাম করবে গোপাল? ওঠ।

পাত্র—গোপাল ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে মহারাজ,

[গোপাল উঠে বসতে বসতে]

গোপাল—বিশ্বাস করুন মহারাজা আমি ঘুমোই নি। (হাই তুলতে তুলতে), একটু বিশ্রাম করে নিলাম।

অমাত্য—প্রণামের নামে বিশ্রাম।

গোপাল—অমাত্যমশায়ের কথা কখনও কি মিথ্যা হয়? রথ দেখা আর কলাবেচা একই সঙ্গে সারা হয়ে গেল, ধান্দার ধাক্কা সামলানো কি চাড্ডিখানি কথা!

কৃষ্ণচন্দ্র—আজকাল রাজসভায় আসতে তোমার প্রায়ই বিলম্ব ঘটছে কেন?

গোপাল—(জোড়হাত করে) ধান্দায় বেরুতে হলে একটু-আধটু দেরী হয়েই থাকে মহারাজ।

কৃষ্ণচন্দ্র—ধান্দা! কিসের ধান্দা।

গোপাল—আজ্ঞে, অর্থের।

কৃষ্ণচন্দ্র—এখানে থেকে তুমি যা অর্থ পাও তাতে তো তোমার সংসার বেশ স্বচ্ছলভাবেই চলে যায়।

গোপাল—গৃহের খরচটা চলে ঠিকই, কিন্তু গৃহিণীর খরচ সংকুলান হয় না।

কৃষ্ণচন্দ্র—গৃহিণীর খরচ?

গোপাল—অপরাধ নেবেন না মহারাজ। আপনার দেওয়া অর্থে সংসার চালিয়ে গৃহিণীর দাঁতের মিশি আর পানের দোক্তা কিছুতেই যুগিয়ে উঠতে পারিনে। তাই রোজ সকালে একটু করে ধান্দায় বেরুই।

কৃষ্ণচন্দ্র—তুমি একটি অপদার্থ।

গোপাল—যথার্থ মহারাজ। অপদার্থের—অ মানে না, পদ মানে পদমর্যাদা, আর অর্থ মানে টাকা। আমার কোনটাই নেই। না আছে পদমর্যাদা আর না আছে টাকা, অতএব আমি একটি অপদার্থ।

অমাত্য—তুমি কি বলছ গোপাল। তুমি হচ্ছ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্য। পদমর্যাদা কি তোমার কিছু কম?

গোপাল—আজ্ঞে বয়স্য মানে তো ভাঁড়। এক পয়সায় পাওয়া যায় এক পণ। এই তো ভাঁড়ের মূল্য।

কৃষ্ণচন্দ্র—ভাঁড়ের যখন কোন মূল্য নেই তোমার কাছে—তখন কাল থেকে তুমি রাজসভায় এসো না।

গোপাল—দোহাই মহারাজ, কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাব।

অমাত্য—কিন্তু রোজ রোজ রাজসভায় দেরী করে এলে তোমার চাকরী কেমন কোরে থাকবে বল।

গোপাল—আপনি ঠিকই বলেছেন মন্ত্রীমশাই, একদিন আধদিন নয়, রোজ রোজ দেরী! এমন করলে কারুর চাকরী থাকে।

কৃষ্ণচন্দ্র—তোমার চাকরীও থাকলো না।

গোপাল—মহারাজের কথার ওপর আর কথা নেই। হাকিম নড়ে তবু হুকুম নড়ে না। চাকরীতেই যখন জবাব হয়ে গেল, তখন কিছু নগদ নারায়ণের ব্যবস্থা করুন। একেবারে খালি হাতে বাড়ী যাব সেটা কি ভাল দেখাবে!

কৃষ্ণচন্দ্র—তুমি এখন যেতে পার গোপাল।

গোপাল—আপনার হুকুম তো আর অমান্য করতে পারিনে। কিন্তু মহারাজ, টাকা আমাকে পেতেই হবে, আর টাকা আপনাকে দিতেই হবে। পেন্নাম—

[গোপালের প্রস্থান]।

২য় দৃশ্য

[স্থান—গোপালের বাড়ী, সময়—দুপুর]

গোপালের স্ত্রী ও পুত্র নেপাল আসীন।

গোপালের স্ত্রী—হ্যাঁরে ন্যাপলা, তোকে যে গোবর আনতে পাঠিয়েছিলুম কি হল ?

ন্যাপলা—গোবর পাওয়া গেলুনি।

গোপালের স্ত্রী—ডিংরেপনা পেয়েছিস্, দেশ পাড়াগাঁয়ে গোবরের অভাব ?

ন্যাপলা—বিশ্বাস কর মা, সারা মাঠ ঘাট, পথ, তন্ন তন্ন করে গরু-খোঁজা খুঁজলুম, গরু মিলল কিন্তু গোবর মিলল নি। ওরা কেউ নাদ্ছে না। সবাই জোলাপ খাবার পরামর্শ করছে।

গোপালের স্ত্রী—তবে রে হতচ্ছাড়া হাড়-হাবাতে হাপাত কুঁড়ে। মায়ের সঙ্গে মশকরা।

ন্যাপলা—মায়ের সঙ্গে মশকরা করব আমি তেমন বাপের বেটাই নই।

গোপালের স্ত্রী—ভাঁড়ের বেটা ভাঁড় কি কখনও ভাল হয়।

ন্যাপলা—খবরদার বলছি মা-মণি বাপ তুলে কথা বোল নি।

[গোপালের প্রবেশ]

গোপাল—কি সর্বনাশ, এ যে মায়ে-বেটায় কুরুক্ষেত্তর।

ন্যাপলা—বাবা তুমি এর বিচার কর, মা আমার বাপ তুলেছে।

গোপাল—তুলবে বই কি! একশো বার তুলবে। হাজার বার তুলবে। লক্ষবার তুলবে। তোমার বাপ তো একটা হেঁচি-পেঁচি লোক নয়, সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্ত। তাকে তোলার সৌভাগ্য কটা লোকের হয়? ও সব কথা থাক। চট্ করে এক ঝুড়ি এঁটেল মাটী নিয়ে আয় তো বাবা।

[নেপালের প্রস্থান]

গোপালের স্ত্রী—মাটী কি হবে গা।

গোপাল—তোমায় একটা কেষ্টঠাকুর গড়ে দেবো।

গোপালের স্ত্রী—আহা! মুখে তোমার ফুল চন্দন পড়ুক।

গোপাল—মুখে নয় গিন্নী মুখে নয়। বল, হাতে। মুখ ঠাকুর গড়বে না, গড়বে আমার হাত।

গোপালের স্ত্রী—ও একই কথা। কই রে মাটী কি হল? (বলতে বলতে গোপালের স্ত্রীর প্রস্থান)।

গোপাল—পাছে কোন কাজ করতে হয় তাই মাটীর নাম করে ইনিও কাটলেন। (পকেট থেকে সন্দেশের ঠোঙা বার করতে করতে) এই ফাঁকে সন্দেশ ক'টা শেষ কোরে ফেলা যাক।

[গোপাল উবু হয়ে বসে সন্দেশ খেতে শুরু করল]

৩য় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। সময়—সকাল।

কৃষ্ণচন্দ্র, পাত্র, মিত্র, অমাত্য আসীন।

অমাত্য—টাকা না পেয়ে গোপাল কাল ভয়ানক ক্ষেপে গেছে মহারাজ।

কৃষ্ণচন্দ্র—গোপাল কি তাহলে রাগ করে রাজসভায় আসা বন্ধ করলে।

মিত্র—কাল তো তার চাকরীতে জবাব হয়ে গেছে মহারাজ!

কৃষ্ণচন্দ্র—বারোমাসে তেরো পার্বণের মতো—বারোমাসে তেরোবার ওর চাকরীতে জবাব হয়ে যায়, কিন্তু সে জবাবকে ও মোটে আমলই দেয় না।

পাত্র—মহারাজের কথা অমান্য!

অমাত্য—কথাটা ভেবে দেখবার মতো। জবাব হয়ে যাবার পর তার তো প্রবেশ নিষেধ। রাজ আদেশ অমান্য করা কিছুতেই বরদাস্ত করা যেতে পারে না মহারাজ।

পাত্র—রাজসভায় প্রবেশ করে করুক, তবে তার আগে মহারাজের অনুমতি——

[গোপালের ছেলে নেপালের প্রবেশ]

(তার পরণে থান ধুতি, গলায় উত্তরীয়, রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, খালি পা)

অমাত্য—কে তুমি!

নেপাল—আমি শ্রীগোপালের ছেলে। শ্রীনেপাল।

কৃষ্ণচন্দ্র—গোপাল—মানে—

নেপাল—যথার্থ অনুমান করেছেন মহারাজ। গোপাল—মানে, গোপাল ভাঁড়।

কৃষ্ণচন্দ্র—তা-তা তোমার এ বেশ কেন?

নেপাল—আমার বাবা শ্রীগোপাল ভাঁড় কেষ্ট পেয়েছে।

অমাত্য—আহা! বড় ভাল লোক ছিল—গোপাল। সে যে অকালে কেষ্ট পাবে, তা আমরা ভাবতেও পারি নি মহারাজ।

পাত্র—ধান্দায় বেরুনোর ধাক্কায় কাল থেকেই তার শরীরটা ভেঙ্গে পড়ে ছিল। ধাক্কাটা—বেচারা সামলে উঠবার আগেই কেষ্ট পেয়ে গেল।

কৃষ্ণচন্দ্র—তাই তো বড়ই দুঃখের কথা, অমন বয়স্য আর দুটি পাওয়া যাবে না।

অমাত্য—যথার্থ মহারাজ, ভাঁড়ামিতে ওর জোড়া মেলা ভার।

কৃষ্ণচন্দ্র—দুঃখ করো না নেপাল, সবই ভগবানের লীলা। সবার বাবারাই একদিন কেষ্ট পেয়েছে, বর্তমানে পাচ্ছে আর ওই একই ভাবে কেষ্ট পাবে।

নেপাল—আমি তাহলে এখন আসি মহারাজ।

কৃষ্ণচন্দ্র—মন্ত্রীমশাই, গোপালের ছেলে নেপালকে তার দায় উদ্ধারের জন্যে পাঁচশ টাকা নগদ দিয়ে দিন।

[টাকা নিয়ে নেপালের প্রস্থান]।

অমাত্য—গোপাল মরে গেল! এ যেন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত।

কৃষ্ণচন্দ্র—আমি কিছুতেই ভাবতে পাচ্ছি না মন্ত্রীমশাই, যে গোপাল আজ আর আমাদের মধ্যে নেই—

পাত্র—মহারাজ, গোপাল আমাদের অনেক হাসিয়েছে, অনেক কাঁদিয়েছে, অনেক ভাঁড়িয়েছে। তার জন্যে আমাদের একটা শোকসভা করা দরকার।

কৃষ্ণচন্দ্র—নিশ্চয়! আপাততঃ আসুন আমরা এক মুহূর্ত সময় নীরবে দাঁড়িয়ে গোপালের আত্মার শান্তি কামনা করি।

[সবাই নীরবে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে পড়ল]

গোপাল—(নেপথ্যে) আসতে অনুমতি হয় মহারাজ।

কৃষ্ণচন্দ্র—কে! কে! কে কথা বললে?

[গোপালের প্রবেশ]

গোপাল—মহারাজ! আমি গোপাল।

[মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া অন্য সকলে ভূত ভূত বলে চিৎকার করে উঠল]

গোপাল—মা-ভৈঃ। মা ভৈঃ! আমি ভূতও নই আর ভবিষ্যতও নই। পরিপূর্ণ বর্তমান। কাজেই আপনাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

কৃষ্ণচন্দ্র—তুমি বেঁচে আছ?

গোপাল—বেঁচে না থাকলে কেউ সশরীরে মহারাজের চরণ দর্শনে আসতে পারে?

অমাত্য—তুমি তাহলে মারা যাও নি গোপাল।

গোপাল—আমি মারা গেলে আপনি কি খুশী হবেন মন্ত্রীমশাই?

অমাত্য—আরে ছি ছি ছি, ও কী কথা বলছ গোপাল! তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হোক।

গোপাল—তাহলে হঠাৎ আপনারা আমায় ভূত ঠাওরালেন কেমন করে। আর আমি যে মারা গেছি, একথাই বা আপনাদের বললে কে?

কৃষ্ণচন্দ্র—তোমার গতি-মুক্তির জন্যে ঘাট-খরচ বাবদ, এই মাত্র তোমার ছেলে নেপাল রাজকোষ থেকে টাকা নিয়ে গেল।

গোপাল—মহারাজের কাছে টাকা কি সে চেয়েছিল?

কৃষ্ণচন্দ্র—এমন দায়-বিপদের সময় টাকা কি আমি না দিয়ে থাকতে পারি গোপাল।

গোপাল—দায়-বিপদটা আবার কিসের হোল। আমি কি সত্যি-সত্যি মারা গেছি!

অমাত্য—তোমার ছেলে তাহলে আমাদের ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিয়ে গেছে, এই ধাপ্পা দেওয়ার শাস্তি তোমায় ভোগ করতে হবে।

গোপাল—তা না হয় করলুম। কিন্তু আমার ছেলে ন্যাপলা কি বলেছে—তার বাপ গোপাল মারা গেছে!

কৃষ্ণচন্দ্র—মারা গেছে অবশ্য বলে নি। বলেছে বাবা কেষ্ট পেয়েছে!—

গোপাল—মাপ করবেন মহারাজ। গোপালের ছেলে নেপাল একবিন্দুও মিথ্যে বলে নি। তার বাবা সত্যি-সত্যিই কেষ্ট পেয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র—তার মানে?

গোপাল—মহারাজ প্রমাণ চান, এই তো ?

কৃষ্ণচন্দ্র—হেঁয়ালি রাখ, স্পষ্ট করে বল, তুমি কি বলতে চাও!

[গায়ে ঢাকা চাদরের ভিতর থেকে একটি সুন্দর কৃষ্ণমূর্তি বার করে]

গোপাল—মূর্তিটি কি সত্যি সুন্দর নয় মহারাজ।

[গোপাল ভক্তিভরে মূর্তিটি মাথায় ঠেকাল। সকলে অবাক্ বিস্ময় নেত্রে চেয়ে রইল সেই কৃষ্ণমূর্তির দিকে।

হাসি আর কাসি

শ্রী বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

হাঃ হাঃ হাঃ হাসতে পারো
কাসতে পারো ক্যামন কাসি,
য্যামন কাসে কেষ্টকাকা
য্যামন হাসে রাঙা মাসী।
কাসি বটে দেখেছিলাম
কাশী যেবার গিয়েছিলাম,
ভুঁড়িওলা পাণ্ডাঠাকুর
কেসেছিল গাঁজার কাসি
ক'লকেতে তার গাঁজা ঠাসি'॥
হাসি কাসি পাশাপাশি
দেখেছিলাম বর্ধমানে
দিদ্‌মা হাসে ফোক্‌লা দাঁতে
দাদু কাসে হুঁকোর টানে।
তোষামুদের হাসি হেঁ হেঁ
হেসে বলে ভাবছ কি হে
বড়লোকের বাছা তুমি
দেশজোড়া যে টাকার মানে
মানীলোক যে সবাই জানে॥

ক্লাবঘরেতে আড্ডা চলে
ঠাট্টা চলে হেসে হেসে,
সিগারেটের ধোঁয়া টেনে
কেউ বা মরে কেসে কেসে।
এমনি তরো আশে পাশে
কেউ বা হাসে কেউ বা কাসে,
হাসি কাসি সবার আছে
বিশ্ব জুড়ে সকল দেশে
হাসির পাশেই কাসি মেশে॥
হাসতে আবার কেউ বা কাসে
দম ফেটে যায় হাসির টানে
হাসি কাসি যমজ দুটি
রয় যে দেখি একই প্রাণে।
হাসির মাঝে ফুর্তি যে রয়
কাসতে গেলে পরাণ বেরয়,
দুটি যেন ঠিক বিপরীত
হাসিতে ভাই জীবন আনে,
কাসিতে সেই জীবন হানে॥

আকাশ-কুসুম

শ্রী রঞ্জিতভাই

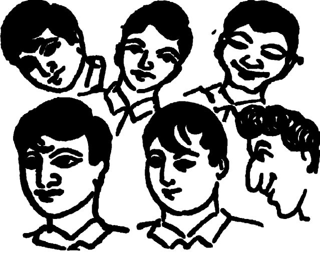
দেখছে স্বপন চিংড়িপোতার
চ্যাপ্টা মাথা শুটকে চাষী
কোঁৎকা কালো হোঁদ্‌কা হাতী
বাজায় কোথা বাঁশের বাঁশী,
চাইলে আবার দেখলে চেয়ে
সুদ কষছে সাঁইমশাই
সুদে সুদে জীবনটা তার
কাটছে যেন নিঠুর কষাই।
রাস্তা দিয়ে যায় কে যেন
মোষের মত? পেয়াদা কাশী
তুলিয়ে লাঠি চলছে দুলে
উপরি টাকার মিষ্টি হাসি।

গাইছে নাকি ঝুমঝুমি সাপ
চাষীর পেটে উর্দ্ধ ভাষায়,
ভাবের মাঝে ভাবছে চাষী
ধানের পাহাড় সেই আশায়!
আকাশ কুসুম দেখছে চাষী
লাল কালো নীল সর্ষেফুল,
ধানের পাহাড় পড়লো চাপা
বানের জলে নেইক কূল।
—'ধ্যুৎ তেরি ছাই!' চিংড়িপোতায়
চাই না যেতে কলকাতায়—
ওদের সাথে মিশলে শুধু
আকাশ কুসুম মন মাতায়!

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রী রেণুকা দেবী

কে এনেছে সঙ্গে করে
হাতের ছোট্ট মুঠায় ভ'রে
স্বর্গপুরের তুলি,
রঙ ছড়ানো অপরূপ ছবিগুলি।
প্রথম কান্না কে কেঁদেছে—ওঁয়া-ওঁয়া ওঁয়া
কান্না তো নয় বলছে যেন,—ক্ষীরের পুতুল দে মা,
ক্ষীরের পুতুল গড়লো নিজেই—
আঁকলো বুড়োআংলা—
রাজকাহিনী পড়ে? হোলো মুগ্ধ সারা বাংলা।
সরল লেখায় মিশিয়ে হাসি—ঝরায় মিঠে সুর,
সেই যাদুকরের নামটি হল—অবন ঠাকুর।




নাতি-নাতনীদের সঙ্গে

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

দাদু— খুকুমণি খুকুমণি
রাগ করেছ কেন
মুখ শুকিয়ে চুপটি করে
বসে আছ হেন
(খুকু) রাগ করেছ কেন ?

দিদু— মা বুঝি আজ বকেছে ওই
মিনি বেড়ালটিরে
বাবা বুঝি দেয় নি চুমু
আপিস থেকে ফিরে ?

দাদু— ভুলো কুকুর তোমার সাথে
করল বুঝি আড়ি
পারুল দিদি তোমায় ছেড়ে
গেল শ্বশুরবাড়ী ?

দিদু— চাঁদের মতন মুখখানিতে
দুখের ছায়া হেন
রাগ করেছ কেন খুকু
রাগ করেছ কেন ?

খুকুমণি— মা আমাকে দুষ্টু বলে,
বাবা বলে দস্যি,
দাদু বলে লক্ষ্মী মেয়ে
নাকে নিয়ে নস্যি,

ঠাকুমা বলে পোড়ারমুখী,
বড়দা বলে মুখ্যু,
ছোটদি খালি পেত্নী বলে
সেই ত আমার দুঃখু।

দাদু— লক্ষ্মী মেয়ে সোনা মেয়ে
এসো আমার কোলে
মা বাবাকে বকে দেবো
বড়দাদাকে ধমকে দেবো
আচ্ছা করে ছোটদিদিটার
কানটি দেবো মলে।

দিদু— ঠোঁট ফুলেছে মিনটুরাণীর
জল এয়েছে চোখে
কি হয়েছে দিদিমণি
কে বকেছে তোকে ?

মিনটুরাণী— মা আমাকে সমস্ত দিন বকে
আগের মত বাসে না আর ভালো,
আমি নাকি ছোট্ট খুকুর চেয়ে
দেখতে খারাপ দেখতে অনেক কালো,
আমি নাকি ভারি দুষ্টু মেয়ে
দুরন্ত আর "স্তি সবার চেয়ে,
ইস্কুলেতে যাবার আগে যদি
খেলতে গিয়ে একটু দেরী হয়
এমনি করে বকে ওঠে মা, যে
মায়ের কাছে যেতেই লাগে ভয়,
খুকু তখন মায়ের কোলে বসে
মজা দেখে খিলখিলিয়ে হাসে।
খেলনা নিয়ে ছাদের ওপর গিয়ে
চুপটি করে যখন পুতুল খেলি
কিংবা খুকুর লবেনচুষের থেকে
একটা যদি মুখেই দিয়ে ফেলি

মা তখুনি ভাঁড়ার থেকে এসে
ধমক দিয়ে কান্ মলে দেয় কষে।
খুকুর মতন ছোট্ট ছিলাম যবে
মা আমাকে ভালবাসতো কত,
আদর করে কোলে নিত মোরে
ঠিক আমাদের ছোট্ট খুকুর মত
এখন আমি বড় হয়ে গেছি
তাই মা বলে পোড়ারমুখী পেঁচি।

দাদু— আ-হা-হা মিনটু দিদি
আমার কাছে এসো,
খেলনা দেবো পুতুল দেবো
সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেবো
মায়ের সঙ্গে আড়ি করে
আমায় ভালবেসো।

দিদু— কি হয়েছে তপন দাদুর
মুখটি কেন ম্লান
চোখ ছল ছল দাদু ভাইয়ের
কিসের অভিমান?

তপন— দিদু! আমার ঠাকুরদাদার সাথে
আড়ি আড়ি একেবারে আড়ি,
ইস্‌কুলেতে কামাই হবে বলে
ফিরিয়ে দিল সেজোমামার গাড়ী,
হল না ক' মামার বাড়ী যাওয়া
হল না আর নেমন্তন্ন খাওয়া।
আমার মত ছোট্ট ছেলেমেয়ে
কতই ত' সব ইস্‌কুলেতে যায়,
তারা কি আর যায় না মামার বাড়ী
ইস্‌কুলে কি ছুটি নাহি পায়?
আমার বেলায় শুধু কেন তবে
নিয়ম এত কড়াক্কড়ি হবে?

কাল থেকে আর হাসবো না ক' আমি
খেলবো না ক' কোন রকম খেলা
সারাটা দিন ইস্কুলেতেই রব
সকাল বিকেল দুপুর সন্ধ্যাবেলা,
সেখান থেকে ফিরবো না ক' বাড়ী
ঠাকুরদাদার সঙ্গে আমার আড়ি।
রাগ করেছি বলে যদি ডাকে
"কোথায় গেলি আয় রে কাছে দাদু",
আদর করে কোলে নিয়ে বলে
"রাগ কোরো না লক্ষ্মী সোনা জাদু",
তাও আমি কইব না ক' কথা
তাতেও আমি তুলব না ক' মাথা।
দাদু! তুমি ছোট্ট ছিলে যবে
আমার মত কিংবা খুকুর মত
তখন যদি তোমার দাদু তোমায়
মামার বাড়ী যেতেই নাহি দিত
কেমন হত ভাবতে পার তা' কি
মনে তোমার দুঃখু হত না কি?

দাদু— ঠিক বলেছিস ঠিক বলেছিস
তপন দাদু ভাই,
বুড়ো হয়ে এক্কেবারে ভুলে গেছি
আমার নিজের ছেলেবেলাটাই।
শীগ্গির যা ফোন করে দে মামার বাড়ী
আসুক গাড়ী
পেট ভরে খা নেমন্তন্ন
আমার তাতে কোনই অমত নাই
(আর) আমি যে তোর পেটুক দাদু
সে কথা তো জানিস,
ভাল ভাল মাছ মিষ্টি
ভুলিস নে ভাই

আমার জন্যে দিদুর জন্যে
একটুখানি আনিস !!

খুকুমণি— ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো,

মিনটুরাণী— পেটটি নাদা ঠাকুরদাদা
চুলগুলো সব শনের নুড়ো,

তপন— ঠাকুরদাদার শুকনো গালে
চাকুম চুকুম মিষ্টি হাসি

তিনজনে— ঠানদিদি গো ঠাকুরদাকে
বড্ডো মোরা ভালবাসি
(তোমার চেয়ে ভালবাসি) ।

নেশাড়ে

শ্রী শুভ্রা ঘোষ

একদা দুই আপিংখোর—
চড়িয়ে দিয়ে নেশার ঘোর
আপন মনে টলতে টলতে—
ঢলতে ঢলতে, চলতে চলতে—
খোস গল্প বলতে বলতে
ছাড়িয়ে গেল গাঁ শহর— !

সাঙ্গ হল দূর সফর—
ভাঙল যখন নেশার ঘোর !!
প্রথম বলে—"আক্কেল কি
নাই রে তোর ?
ফেললি হারিয়ে রাস্তা না ?
কোথায় মোদের আস্তানা !
কে বল দেবে খুঁজে এখন ?
সময় কারো শস্তা না !"

দ্বিতীয় বলে—মাৎ ডরো,—
মিছে কেন ভয় করো ?
চড়াও আবার নেশা জোর !
হোক না কেন রাত্রি ভোর !
সামনে দিকে রাস্তা থাক্
পিছু পানে হট্‌তে থাক ;
পৌছে যাব আস্তানা ।
মাথা আমার
বুদ্ধি-ঠাসা বস্তা না ? !"

শুনবো বসে রাখাল ছেলের বাঁশী

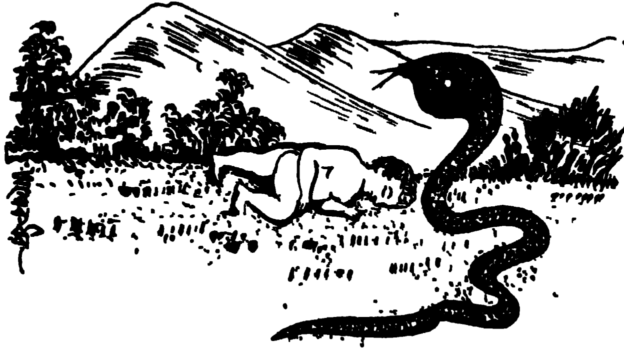
বন্দে আলী মিয়া

হাসি খুশীর বাঁশী বাজে আজি সারা বেলা
কাশের বনে খেলবো আজি লুকোচুরি খেলা,
নীল আকাশে সাদা মেঘ—জলে ছায়া পড়ে
কত রঙের পাখী আসে দূরে বালুচরে।
রাখাল ছেলে মোষের পিঠে ওপারেতে যায়
মন যে মোর নদীর চরে হোথা যেতে চায়।
ওই যে সেথা হিজল গাছ—তলে বসি তার
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশী শুনি বারে বার।
বাঁশীর সুরে ঢেউ উছলি ভেঙে পড়ে কূলে
কাঁপন লাগে তৃণে তৃণে—ঝরা ফুলে ফুলে।
হিজল গাছের শাখা পাতা দোলে সারা বেলা
সেথায় গিয়ে রাখাল সনে খেলবো একেলা।
ঘরেতে আজ রইবো নাকো যাবো বালুচরে
হোথায় যেতে মনটি মোর কেমন যে করে!
হিজল ছায়ে বসি রাখাল বাজাইবে বাঁশী
শুনবো আমি সারাটি দিন বসি পাশাপাশি।

খুকুর রান্না

শ্রী শিউলি সেনগুপ্ত

হাঁড়ি আনতে ভাঙল গেলাস
গেলাস আনতে কড়া
এবার খুকু কিসে করে
ভাজবে তালের বড়া?
থালা আনতে পড়ল খুন্তি
খুন্তি নাড়তেই বাটি
খুকুর রান্না সত্যি যে আজ
হবেই হবে মাটি।
চেঁচিয়ে খুকু তার স্বরে
জুড়ে দিল কান্না।
মা এসে চোখ মুছিয়ে
বলেন: ছিঃ-ছিঃ সোনা,
আর না।



ফণিমুকুট রাজা

শ্রী মনোজ বসু

আদিবাসী মুণ্ডাদের পল্লী, রাঁচির অনতিদূরে, ফণিমুকুট রাজারা তথায় রাজত্ব করতেন। মুকুটে পেঁচানো সাপের মূর্তি—প্রকাণ্ড ফণা, ফণার চূড়ায় মানুষের মুখ, এই থেকে ফণিমুকুট নাম। রাজবংশ এখন লোপ পেয়ে গেছে শুনতে পাই।

নাগরাজের ছেলে পুণ্ডরীক। রাজার ইচ্ছে, ছেলেকে শাস্ত্র পড়িয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু সাপ দেখলেই লোকে পালায়, সাপকে কে শাস্ত্র পড়াতে যাবে? ভেবে চিন্তে রাজা ছেলেকে বললেন, মানুষের মূর্তি নিয়ে নে তুই। কাশী চলে যা, শাস্ত্র পাঠ শেষ করে ঘরে ফিরে আসবি।

তাই হ'ল। পুণ্ডরীক আর সাপ নন, সুঠাম সুন্দর এক রাজপুত্র।

খুব নাম-করা এক পণ্ডিত ছিলেন কাশীতে, দেশ-বিদেশের অনেক ছেলে তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়ত। পুণ্ডরীক চলে গেলেন তাঁর কাছে।

মেধাবী ছেলে পুণ্ডরীক—যেমন চেহারা, তেমনি স্বভাব-চরিত্র। পণ্ডিত তাঁকে চোখে চোখে রাখেন, পণ্ডিতই শুধু নন—তাঁর স্ত্রী, তাঁর মেয়ে মনিমালা। পুণ্ডরীক একেবারে বাড়ীর ছেলে হয়ে উঠেছেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। পড়াশুনা শেষ। পুণ্ডরীক দেশে-ঘরে যাবেন এবার। নাগরাজাও ছেলেকে তাই বলে দিয়েছিলেন। পণ্ডিতের বাড়ীশুদ্ধ সবাই মন-মরা। পুণ্ডরীক চলে গেলে ঘরবাড়ী বুঝি অন্ধকার হয়ে যাবে।

পণ্ডিত পুণ্ডরীককে কাছে ডাকলেন, শোন, আমার যতকিছু বিদ্যা তোমায় দান করেছি। কিন্তু গুরু-দক্ষিণা পেলাম কই?

পুণ্ডরীক বললে, আদেশ করুন।

পণ্ডিত বললেন, বুড়ো হয়ে গেছি—কোনদিন চোখ বুজব। অনেক যত্নে চতুষ্পাঠী গড়ে তুলেছি, চতুষ্পাঠী উঠে যাবে আমার মৃত্যুর সঙ্গে। তুমি এই চতুষ্পাঠীর ভার নাও, অধ্যাপনা করো। এই আমার গুরু-দক্ষিণা। নিশ্চিন্তে তা হলে মরতে পারব।

আর পণ্ডিতের স্ত্রী বললেন, মেয়েটার ভারও তুমি নাও বাবা। মনিমালাকে বিয়ে করো।

রূপে-গুণে মনিমালা অতুলন। পুণ্ডরীকেরও মনে মনে সেই ইচ্ছে। তবে আর কি, বাধা কিসের?

বিয়ে হয়ে গেল। বাড়ী ফেরা মুলতুবি। শিষ্য ছিল পুণ্ডরীক, জামাই হ'ল এখন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক।

সাপ হয়েও পুণ্ডরীক পুরোপুরি মানুষ এখন। সাপের কয়েকটি লক্ষণ রয়ে গেছে শুধু।

মনিমালা রাত্রিবেলা পুণ্ডরীকের সঙ্গে এক বিছানায় আছে। পুণ্ডরীকের গায়ে হাত পড়তে সে শিউরে উঠলেঃ একি, এত ঠাণ্ডা কেন তোমার গা? অসুখ-বিসুখ কিছু আছে?

পুণ্ডরীক উড়িয়ে দেয় একেবারে, দূর, ঠাণ্ডা কোথায় দেখলে? হাতই ঠাণ্ডা তোমার।

কথা বলছে, মুখ থেকে ভক ভক করে দুর্গন্ধ বেরোয়। চমক খেয়ে মনিমালা বলে, বিশ্রী একটা গন্ধ তোমার মুখে—

হতে পারে—

বেকায়দায় পড়ে খানিকটা পুণ্ডরীক স্বীকার করে নেয়। বলে, সকাল-সন্ধ্যে দু-বার করে আমার মুখ ধোওয়ার অভ্যেস। নানান ঝঞ্ঝাটে সন্ধ্যে-বেলায় মুখ ধোওয়া আজ আর হয়ে ওঠে নি।

কৈফিয়ত মনিমালার মনে ধরে ন। কিন্তু মুখে কিছু সে বলল না; উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল।

সকালবেলা বাপকে গিয়ে বলে, তোমার জামাইয়ের কি একটা সাংঘাতিক অসুখ। পেটের ভিতরের নাড়িভুঁড়ি পচে গিয়েছে মনে হয়। একবার কাছে এনে কথা বলিয়ে দেখো, টের পাবে।

জিনিসটা নিয়ে পণ্ডিত আর উচ্চবাচ্য করলেন না। দেখে শুনে পছন্দ করে

জামাই করেছেন। জামাইয়ের মুখে উৎকট গন্ধ, চাউর হয়ে না যায়। লোকে বোকা বলবে আমাদের। শত্রু হাসবে।

সেই সময়টা ভাগ্যক্রমে প্রতাপগড়ের রাজবৈদ্য কাশীতে এসেছেন বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজো দেবার জন্য। অত বড় বৈদ্য ভূ-ভারতে আর নেই। পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে বহুকালের চেনা-জানা। রাজবৈদ্য বড় খাতির করেন তাঁকে। পণ্ডিত রাজবৈদ্যের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললেন, আপনি নিজে একবার দেখে যান বৈদ্যমশায়। দেখে-শুনে ওষুধ-পত্তোর দিন। ব্যাপারটা গোপন থাকবে। আপনি জানলেন আর আমি জানলাম। রোগীও অবশ্য জানবে। না জেনে উপায় কি?

বৈদ্য এসেই আচমকা পুণ্ডরীককে বললেন, হাঁ করো দিকি।

অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁ করতে হ'ল। বৈদ্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন মুহূর্ত-কাল। মুখের কাছে মুখ এনে শুঁকলেন। ঘরের মানুষজন সরিয়ে দিলেন: রোগীকে কয়েকটা গোপন জিজ্ঞাসা আছে। আপনারা থাকলে হবে না।

তারপরে নির্জন হলে কঠোর কণ্ঠে বৈদ্য শুধালেন: তুমি কে?

কে আবার, শাস্ত্র শিখতে এসেছিলাম। পাঠ অন্তে এখন অধ্যাপনায় আছি।

মানুষ তুমি কখনো নও। আমার কাছে ধাপ্পা দিতে এসো না। সাপ তুমি—নররূপ নিয়ে আছ। সাপের সর্বলক্ষণ তোমার দেহে। চেরা জিভ—একেবারে দুইখণ্ড। সাপ ছাড়া এ জিনিস হতে পারে না।

চাপা ভর্ৎসনা করে উঠলেন: সরল-বিশ্বাসী নিরীহ পণ্ডিতমশায়কে তুমি বঞ্চনা করেছ।

বৈদ্যের পায়ে পুণ্ডরীক আছাড় খেয়ে পড়ল: আমি চলে যাচ্ছি। কাউকে বলবেন না এসব। চলে যাওয়ার পর তখন বলতে পারেন। শিক্ষা সারা হলেই ঘরে ফিরে যাবার কথা। যাওয়া হয় নি বলে বাবা রেগে যাচ্ছেন, কাল সকালেই আমি চলে যাব।

অধ্যাপক চলে যাচ্ছেন, ছাত্রেরা কত এসে বলল। পণ্ডিতমশায় নিজেও বললেন। পুণ্ডরীক অবিচল। যাবেই সে।

মনিমালা জেদ ধরল: আমিও শ্বশুরবাড়ী যাব তবে। যেখানে স্বামী, সেইখানে আমি। স্বামীহারা হয়ে থাকতে পারব না।

বাপ-মাকে প্রণাম করে মনিমালা স্বামীর পিছু পিছু চলল। রাস্তাঘাট

ছিল না তখনকার দিনে, গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থা নেই। পায়ে হেঁটে চলেছে দিনের পর দিন। মেয়েলোক হলে কি হয়, মনিমালাও সমানে যাচ্ছে পুণ্ডরীকের পিছন ধরে। মনে কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ: রাজবৈদ্যের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর উপর টান ধরল কেন? রাজবৈদ্যও আকারে ইঙ্গিতে কিছু বলে থাকতে পারেন।

বারংবার মনিমালা প্রশ্ন করে: তুমি কে? তুমি কে?

আর পুণ্ডরীকেরও তুড়ুক জবাব: মানুষ আমি আবার কে?

এমনি করে রাঁচি অঞ্চলে এসে পডল। অনেক—অনেক আগের কথা, এখনকার এই শহর ছিল না তখন। পাহাড়, জঙ্গল, বর্ষাকাল, জল জমেছে খানাখন্দে, বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে—আকাশে মেঘ থম থম করছে, বৃষ্টি আবার হবে।

একটা গুহা খুঁজে-পেতে নিয়ে সেইখানে দুটিতে শুয়ে পড়ল, নাগরাজার রাজ্য আর সামান্য দূর। দেশে-ঘরে প্রায় তো এসে গেল—সেই আনন্দে পুণ্ডরীকের ঘুম হচ্ছে না। গ্যাঙর গ্যাং গ্যাঙর গ্যাং—ব্যাং ডাকছে এদিকে সেদিকে। লোভ সামলানো পুণ্ডরীকের দায় হয়ে উঠল। পথশ্রমে ক্লান্ত মনিমালা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে—এই সুযোগ, এই সুযোগ! চুপিচুপি উঠে গুহা থেকে বেরিয়ে ডোবার ধারে চলে এসেছে। বড় বড় কোলাব্যাং বর্ষার জলে থলথল করছে। আর গলা ফুলিয়ে ডাকছে।

যাত্রা-থিয়েটারের পালার শেষে রাজা-মন্ত্রীরা সাজঘরে এসে গোঁফ-দাড়ি সাজপোষাক যেমন খুলে ফেলে দেয়, পুণ্ডরীকও তেমনি হাত-পা-মাথা একে একে দেহ থেকে খুলে ডোবার ধারে রাখল। লহমার মধ্যে সাপ হয়ে বুকে হেঁটে সরসর করে বেড়াচ্ছে। মনের আনন্দে ছোবল মারছে জলের উপর, ব্যাং ধরে ধরে খাচ্ছে।

পাতার খসখসানি হঠাৎ। ফণা ঘুরিয়ে সাপ চেয়ে দেখল—কী সর্বনাশ, মনিমালা যে এসে গেছে। ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে মনিমালা দেখল, পুণ্ডরীক পাশে নেই। তাকে খুঁজতে গুহা থেকে বেরিয়েছে। মানুষটা দেখতে দেখতে সাপ হয়ে গেল—স্বচক্ষে দেখেছে সে, ঠকঠক করে কাঁপছিল। তারপর সামলে নিয়ে মনিমালা ছুটে পালাচ্ছে। 'মনিমালা' 'মনিমালা' মানুষের মুক্ত নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সাপও ছুটল—বলে, কোথায় চললে তুমি? শোন, শোন—

মনিমালা বলল, কাশী ফিরে যাচ্ছি। মা-বাবার কাছে। শ্বশুরবাড়ী আমি যাব না।

সাপ বলে, স্বামী ছেড়ে চলে যাবে—সে হতে পারবে না। হতে আমি দেবো না।

প্রতারক, ভণ্ড—বলে গালিগালাজ করতে করতে মনিমালা আরও জোরে

পুণ্ডরীকও রেগেছে। এক-ফণা সাপ এই মুহূর্তে সহস্র ফণা হয়ে গেল। লেজের দিকে তরতর করে বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে আর কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। মনিমালার মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল। আর সেই হাজার ফণার ফোঁসফোঁসানিতে ঝড় উঠেছে।

মনিমালা ডাইনে-বাঁয়ে সামনে পিছনে যেদিকে পালাতে যায়, দেহ যথেচ্ছ লম্বা হয়ে ফণাগুলো সেইদিকে ঝুঁকে পথ আটক করে। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মনিমালা পাগলের মতো ছুটোছুটি করল খানিক, জ্ঞান হারিয়ে তারপর মাটিতে পড়ল। ছেলে হ'ল সেই অবস্থায়। ছেলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের মৃত্যু, ছেলেকে মনিমালা বুকে নিতে পারল না।

সকাল হ'ল; মুণ্ডাদের পুরুষ-মেয়ের একটা দল বনের মধ্যে গাছ কাটতে এসেছে। ওঁয়া ওঁয়া করে কান্না শুনতে পায়। গিয়ে দেখে, পাথরের উপর ফুটফুটে এক বাচ্চা, প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ ফণা মেলে ছাতা ধরার মতন রোদ আচ্ছাদন করে আছে। সাপ দেখে লোক এগোয় না, ফিসফিস করে শলা-পরামর্শ করছে।

সাপ হঠাৎ মানুষের গলায় কথা বলে উঠলে: নাগ রাজপুত্র পুণ্ডরীক আমি। এই আমার ছেলে। তোমরা নিয়ে লালন-পালন করো, বড় হয়ে এই ছেলে খুব প্রতাপশালী হবে, রাজা হয়ে প্রজাদের শাসন-পালন করবে।

এই কথা বলে সাপ ছোট হতে হতে একেবারে কেঁচোর মতন হয়ে গেল। ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হ'ল আর দেখা গেল না।

পুণ্ডরীকের কথা ফলে গেল। মুণ্ডাদের মধ্যে বড় হ'ল সেই ছেলে। বিশাল এক অঞ্চলের অধিপতি হ'ল। সে রাজার মাথার মুকুটখানাতে ঠিক যেন এক অজগর সাপ হেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আছে। ফণা তুলে রয়েছে সে সাপ, ফণার চূড়ায় মানুষের মাথা।

ঐ রাজাদের তাই ফণিমুকুট রাজা বলত।

একটা ভুলের জন্য

শ্রী অতীন মজুমদার

বলত' ভজা, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে কার ?
—চোরকে বাপু পালাতে ঠিক পথ যে দেখায়—তার ।
ন্যাড়া কেন বেলতলাতে একটি বারই যায় ?
—বেলগাছেতে দত্যি থাকে, তাই ন্যাড়া ভয় পায় ।
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, খুড়তুতো ভাই কারা ?
—ওদের বাপের থাকলে দু'ভাই, তাদের ছেলে যারা ।
কিসে দেবে তেল, যদি না চরকা নিজের থাকে ?
—ঠিক ঘুমোবার আগেতে তেল দেবে নিজের নাকে ।
বলতে পারিস্ গেঁয়ো যোগী কেন রে ভিখ্ পায় না ?
—র‍্যাশনে যা' চাল পাওয়া যায়, ভিখ্ দেয়া তায় যায় না ।
বল মজুরী পায় কত যে ভূতের বেগার খাটে ?
—যাওয়ার যত খরচ পড়ে কেওড়াতলার ঘাটে ।
পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বল কে পারে খেতে ?
—কাঁঠালে লোভ অথচ ভয় পায় না জেলে যেতে ।
কেমন ক'রে কানাকে পথ বলত' দেখায় কানা ?
—জানিনেক, কানাই পারে দিতে জবাবখানা ।
ইস্ ! ভজা তুই পারলিনেক শেষটা জবাব দিতে,—
নইলে পুরো একশ'-ই তুই ঠিক পারতিস্ নিতে ।
বরাত খারাপ, ১-টাই ভুল, তাইত গেলি ঠকে',
১০০ থেকে ১ কেটে তুই শূন্য দিলাম তোকে ।

বিদ্যা-বুদ্ধি

শ্রী সবিতা গুপ্তা

বুদ্ধি না থাকিলে বিদ্যা কভু নাহি হয় ।
বিদ্যা হতে বুদ্ধি বড় সর্ব জনে কয় ॥
বুদ্ধি বলে অসাধ্য সাধন হয় বিশ্ব মাঝে ।
বুদ্ধি হীন পরাজিত দেখ সব কাজে ॥



সলিলেশ লিখছে—

শ্রী মণীন্দ্র দত্ত

নাঃ, আর পারা যায় না। পেটের ভিতর এক ডজন ছুঁচো যেন একসঙ্গে ডন-বৈঠক মারছে। আর পেটেরই বা দোষ কি? সেই কোন্ সকালে পাইস হোটেলের স্বল্পতম ডাল-ভাত পেটে পড়েছিল। তারপর কড়া লিকারের হাফ-কাপ চা ছাড়া এই সন্ধ্যা নাগাত কিছুই তো পেটে পড়ে নি। অতএব সেই পেটে ছুঁচো ডন মারবে না তো কি কথাকলি নৃত্য করবে?

বেচারী সলিলেশ! তারই বা দোষ কি? বি, এ, পাশ করবার পর থেকে এই দুই বছর ঠায় বেকার। অবশ্য পুরো বেকার নয়। মাঝে মাঝে কাজ জোটে। কখনও ছাত্র পড়ানোর কাজ, কখনও বা শিক্ষা-নবীস—গল্পলেখকের কাজ। তাতেই কোনরকমে চলে।

কিন্তু একে কি চলা বলে? মদন সরকার থার্ড বাই লেনের ১১।১।এক্ নম্বরের অতি পুরাতন জীর্ণ বাড়ীর ততোধিক স্যাঁতসেঁতে একতলার একখানি ঘর। সেখানে দিন-রাত্রির তফাৎ নেই। চব্বিশ ঘণ্টাই অন্ধকার। ইলেক-ট্রিক লাইটের বালাই নেই। কেরোসিন লণ্ঠন সম্বল। এ হেন এক ঘরের অংশীদার তিনজন। সলিলেশ, সীতেশ ও সুবেশ। সুবেশ চাকরী করে এক কাঠের দোকানে। সীতেশ হোমিওপ্যাথি-বাক্সের ক্যানভাসার। আর সলিলেশ গ্র্যাজুয়েট বেকার। কখনও গৃহ-শিক্ষক, কখনও গল্প-লেখক।

কিন্তু সে-গুড়েও বালি। গত ছ'মাস কোন ছাত্র জোটেনি সলিলেশের কপালে। গল্প যা পাঠিয়েছে, তার বেশীর ভাগই ফেরৎ এসেছে পত্রিকা অফিস থেকে। বাকিগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় দিন গুনছে।

অবশ্য আজকের কথাটা আলাদা। এক বন্ধুর বৌ-ভাতে সুবেশের আজ নেমন্তন্ন। সুবেশ প্রস্তাব দিয়েছিল, চলো তিনজনেই যাওয়া যাক্। রোজ-রোজ পাইস-হোটেলের ডাল-চচ্চড়ি আর কাঁহাতক চালানো যায়? একটা দিন বিয়েবাড়ীতে মুখটা বদলে আসা যাবে। সীতেশ প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছিল। কিন্তু সলিলেশ কিছুতেই রাজী হয় নি। ওরা দু'জন অনেক যুক্তি-তর্ক দেখিয়েছে, সাধ্য-সাধনা করেছে, কিন্তু সলিলেশ বিনা নেমন্তন্নে বা বন্ধুর নেমন্তন্নের বকলমে ভোজ খেতে কিছুতেই রাজী হয় নি। অগত্যা সুবেশ আর সীতেশ সন্ধ্যার আগেই সেজে-গুজে রওনা হয়ে গেছে। যাবার সময় বলে সলিলেশ আজ যেন পাইস হোটেলের চৌ-কাঠ না মাড়ায়। ওরাই ফিরবার পথে ওর জন্য ভাল-মন্দ যা হোক খাবার নিয়ে আসবে।

মনঃপূত না হলেও এ প্রস্তাবে সায় না দিয়ে সলিলেশের উপায় ছিল না। গত মাসখানেক যাবৎ সলিলেশের পকেট একেবারে গড়ের মাঠ। ঘর ভাড়া ওরা দু'জনেই চালায়। পাইস হোটেলের তিনজনের বিলও ওরাই মিটিয়ে দেয়। মাঝে মধ্যে হাত খরচের আট-দশ আনা পয়সাও কখনও সীতেশ কখনও বা সুবেশ ওর পকেটে গুঁজে দেয়। এইভাবেই দিন কাটছে সুদিনের আশায়। কাজেই আজও ওদের নির্দেশ মত ভাল-মন্দ খাবারের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি?

কিন্তু এভাবে একলা ঘরে শুয়ে-বসেই বা কতক্ষণ কাটানো যায়। বৌ-ভাতের ভোজ সেরে দুই মূর্তিমান কতক্ষণে ফিরবে তারই বা ঠিক-ঠিকানা কি? এদিকে পেটের মধ্যে—

নাঃ, তার চাইতে বরং কাগজ-কলম নিয়েই বসা যাক্। এই অবসরে একটা গল্পের কাঠামো যদি গড়ে তোলা যায়।

লণ্ঠনের ফিতেটা আর একটু উসকে-দিয়ে সলিলেশ কাগজ-কলম নিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়ল বিছানায়। এটা ওর অনেক দিনের অভ্যাস। সেই ছেলেবেলা থেকে। বুকের নীচে একটা বালিশ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে না পড়লে ওর লেখা-পড়া কোনটাই জুতসই হয় না।

কিন্তু পকেট যার গড়ের মাঠ, পেট যার ছুঁচোর ডন-খানা, তার মগজ যে সাহারা মরুভূমি ছাড়া আর কিছু হয় না। এ সত্য উপলব্ধি করতে বেশী সময় লাগলো না সলিলেশের। দু'তিনবার দু'তিনটে লাইন লিখলো আর কাটলো। আবার লিখলো, আবার কাটলো। নাঃ, আজ রাতে আর গল্প লেখাও হবে না।

হতাশ হয়ে কলমের মুখ বন্ধ করে বিছানার উপর মুখ থুবড়ে চোখ বুজলো সলিলেশ।

ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্—

কে যেন খুব আস্তে আস্তে দরজায় টোকা মারছে।

চমকে ঘাড় তুললো সলিলেশ। আবার দরজা ঠোকার শব্দ। এবার একটু জোরে।

এমন অসময়ে কে আবার জ্বালাতন করতে এলো রে বাবা! সুরেশ-সাতেশ যে নয় সেটা নিশ্চিত। ওরা হলে এতক্ষণ হৈ-হৈ করে বাড়ী মাথায় করে তুলতো।

তাহলে কে? দোতলার সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক কি? যিনি একখানি ঘর নিয়ে একলা থাকেন। স্বপাকে আহার করেন। আর সময়-সুযোগ পেলেই ওদের একতলার ঘরে এসে তিন ভুবনের গল্প শুরু করেন। বকতেও পারেন ভদ্রলোক। সারাক্ষণ বকর বকর। তবু লোকটাকে সলিলেশ সমীহ করে চলে। তাঁর নাকি অনেক টাকা। খেয়ে না খেয়ে সেই টাকা তিনি পাহারা দেন যক্ষের মত।

আবার ঠক্-ঠক্-ঠক্।

সলিলেশ উঠে দরজা খুলে দিয়ে আবার এসে বসলো বিছানায়। ভাল করে তাকিয়েও দেখল না কে ঢুকলো ঘরে।

—আপনার নাম সলিলেশ?

চমকে উঠলো সলিলেশ। কণ্ঠস্বর অপরিচিত। মুখ তুলে তাকালো। মাঝবয়েসী একহারা চেহারার ভদ্রলোক। পরণে ময়লা ট্রাউজার ও গলাবন্ধ কোট। গলা পর্যন্ত সব ক'টি বোতাম আঁটা। মাথায় একখানা রুমাল বাঁধা। লণ্ঠনের আলো পড়ে তার উপর জলের ফোঁটাগুলো তখনও চিক্-চিক্ করছে।

—আপনার নাম কি সলিলেশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সলিলেশ সেন?

—হ্যাঁ।

—শ্রী সলিলেশচন্দ্র সেন?

—আমার পুরো নামটা তাই বটে। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন—ঘরের কোণে রাখা বিবর্ণ চেয়ারটা দেখিয়ে দিলে। লোকটি এগিয়ে এসে

চেয়ারে বসল। বাঁ-হাতে মাথার রুমালটা খুলে মুখ মুছল। ভেজা রুমালটা রাখল চেয়ারের হাতলে।

এতক্ষণে সলিলেশের খেয়াল হলো, লোকটির হাতে একটি কালো রঙের ব্যাগ আছে। ব্যাগটা হাত থেকে না নামিয়েই তিনি কথা বললেন, আপনার একজন শুভার্থীর কাছ থেকে আমরা আসছি।

—আমার শুভার্থী?

—হ্যাঁ। আপনার একান্ত শুভার্থী।

—শুভার্থী! পুরুষ—না মহিলা?

—তা বলতে পারব না।

—সে কি?

—ঠিক তাই। সবই তাঁর নির্দেশ। আমার হাত দিয়ে তিনি যা পাঠিয়েছেন সেটা আপনাকে দিয়ে একটা রসিদ নিয়ে আমি চলে যাব। ব্যস্। এছাড়া আর একটি কথাও নয়। তাই তার নির্দেশ।

সলিলেশ ভালো করে তাকালো ভদ্রলোকের দিকে। কি যেন ভাবলো। তারপর প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, কি এনেছেন আপনি আমার জন্য সেটা জানতে পারি কি?

কোন জবাব দিলেন না ভদ্রলোক। নিঃশব্দে হাতের ব্যাগটা কোলের উপর রেখে খুলে ফেললেন। তার ভিতর থেকে বের করলেন ব্রাউন কাগজে আলগা ভাবে মোড়া একটা বাণ্ডিল। ব্রাউন কাগজের মোড়ক খুলে ভদ্রলোক বের করলেন থাকে থাকে সাজানো ছোট ছোট প্যাকেট।

সলিলেশের দুই চক্ষু ছানাবড়া। সব কড়কড়ে নতুন নোটের তাড়া! বকের মত ঘাড় উঁচু করে সলিলেশ দেখল, সব একশ' টাকার নোট। লোকটি বললেন, এখানে দশ হাজার টাকা আছে।

নিজের অজ্ঞাতেই একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এলো সলিলেশের গলা দিয়ে।

—এসব টাকা আপনার জন্যই এনেছি।

—আমার জন্য! দশ হাজার টাকা! —ঢোক্ গিলতে গিলতে কথাটা বললো সলিলেশ।

—হ্যাঁ আপনার জন্য। আপনি শুধু একখানি রসিদ লিখে দিন। ব্যস্। আমিও টাকাটা বুঝিয়ে দিয়েই ঘরে চলে যাই।

ধীরে ধীরে বুঝি সলিলেশের বুদ্ধি ফিরে আসছে। একটু একটু করে ভাবতে পারছে যেন। এতগুলো টাকা তাকে কে দেবে? কেনই বা দেবে? মুখ তুলে প্রশ্ন করলো,—আপনি বলছেন এই শুভার্থীর নাম আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না?

—না।

—আচ্ছা, এতগুলো টাকা তিনি আমাকে দিচ্ছেনই বা কেন?

—যেহেতু টাকার আপনার দরকার। আর এ টাকা একেবারে নিঃশর্ত দান। কখনও ফেরৎ চাওয়া হবে না। শুধু একটা রসিদ দেবেন যাতে দাতা বুঝতে পারেন যে টাকাটা আপনার হাতেই পৌচেছে।

একটু ভেবে সলিলেশ বললো,—বেশ, টাকাটা আমি নেব এবং যথাযথ একটা রসিদও দেব।

—আমিও একটা রসিদই চাই।

একটু ইতস্ততঃ করে সলিলেশ বললো, কিন্তু রসিদটা একজন সাক্ষীর সামনে সই হওয়া উচিত নয়?

—সাক্ষী!—মুহূর্তকাল কি যেন ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, হ্যাঁ, সাক্ষী রাখতে পারেন। আমার কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু চাই রসিদে আপনার নাম-ধাম থাকবে। আর থাকবে আজকের তারিখ। ব্যস্। ডাকুন, কাকে সাক্ষী ডাকবেন ডাকুন। আমাকে যেন অযথা দেরী করিয়ে দেবেন না।

বিছানা থেকে উঠতে উঠতেই সলিলেশ বললো,—না, না, মোটেই দেরী হবে না। এই বাড়ীর দোতলায় একটা কোণের ঘরে থাকেন ধীরাজবাবু। আমি যাব আর তাঁকে ডেকে নিয়ে আসব।

দরজার দিকেই এগিয়ে যেতে যেতেই হঠাৎ বাঁ দিকে ভদ্রলোকের দিকে তাকালো সলিলেশ। তাকিয়েই আঁতকে উঠলো। একি!

এতক্ষণ খেয়াল করে নি, কিন্তু সেই মুহূর্তে সলিলেশের মনে হোল—ঘরে ঢোকার পর থেকে ভদ্রলোক কোন সময়েই তার সঙ্গে মুখোমুখি হন নি। ঘরে ঢুকেছেন একপাশে কাত হয়ে। সেইভাবেই এতক্ষণ বসে আছেন। এবার তাঁর মুখের অন্য দিকটায় চোখ পড়তেই সলিলেশ সবিস্ময়ে দেখলো, তাঁর কানের নীচ থেকে ঘাড় পর্যন্ত রক্তের মোটা দাগ। লণ্ঠনের আলোয় সেই দাগটা চক্‌চক্ করছে।

গলার ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা আর্তনাদকে কেমন করে যে চেপে রেখেছিল সেই মুহূর্তে তার হদিশ সলিলেশ নিজেও জানে না। তবে আর্তনাদ সে করে নি। ভীত, ত্রস্ত, কম্পিত পদক্ষেপে সে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তিন লাফে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলো। ধীরাজবাবুর কাছেই সে যাবে। তাঁর সাহায্যই নিতে হবে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার। লোকটা নিশ্চয় খুনে-ডাকাত। এসব টাকা ও নিশ্চয় কাউকে খুন করে নিয়ে এসেছে। উঃ, কি ভয়ানক লোক!

ধীরাজবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। সব সময় বন্ধই থাকে। ঘরের দরজা তিনি কখনও খুলে রাখেন না। কি জানি পাছে তাঁর যক্ষের ধন খোয়া যায়।

সলিলেশ ভীত গলায় ডাকলো,—ধীরাজবাবু, দরজা খুলুন—দরজা খুলুন।

কোন সাড়া নেই। এরই মধ্যে কি ঘুমিয়ে পড়লেন ধীরাজবাবু? কিন্তু আর তো সময় নষ্ট করা যায় না। দেরী হ'লে ওদিকে লোকটা যদি সটকে পড়ে।

সজোরে দরজায় ধাক্কা দিলে সলিলেশ। সশব্দে দরজা খুলে গেলো।

ঘর অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। তবে কি ধীরাজবাবু বাইরে গেছেন ঘর খুলে রেখে? না, না, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এসব ভুল তিনি করতেই পারেন না।

—ধীরাজবাবু!

কোন সাড়া নেই কিন্তু ততক্ষণে ঘরের অন্ধকার একটু পাতলা হ'য়ে এসেছে। সেই আধো অন্ধকারে সে দেখলো, ধীরাজবাবু তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন।

—ধীরাজবাবু!

কোন সাড়া নেই। তাহলে? ছোট কাঠের টেবিল থেকে দেশালাইটা নিয়ে মোমবাতিটা ধরিয়ে ফেললো সলিলেশ। আর সেই আলোয় দেখলো, ধীরাজবাবু হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। তাঁর কাটা গলাটা হাঁ করে আছে।

সলিলেশ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার হাত-পা বুঝি পেটের ভিতর ঢুকে গেছে। গলা দিয়ে একটা শব্দও বের হচ্ছে না। শুকিয়ে বুঝি কাঠ হয়ে গেছে।

পরমুহূর্তেই সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। এক এক লাফে পাঁচটা করে সিঁড়ি পেরিয়ে নীচে নেমে গেলো। প্রাণপণে ছুটলো তার ঘরের দিকে। যেমন করে হোক লোকটাকে ধরতেই হবে। পুলিশে দিতে হবে।

তার ঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু সে তো বেরুবার সময় দরজা খুলে রেখেই গিয়েছিল। তাহলে?

দরজার হাতলটা চেপে ধরলো সলিলেশ। চটচটে কি যেন লাগলো হাতে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একটানে দরজা খুলে ফেললো সলিলেশ।

ঘর ফাঁকা। লোকটা উধাও!

মেঝের উপর অনেকগুলো নোট ছড়িয়ে আছে। আর যে চেয়ারে লোকটা বসেছিল তার নীচে রয়েছে একজোড়া চামড়ার গ্লাভস্ আর একখানি ভোজালি। সবই রক্তমাখা।

ঘরের মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সলিলেশ। উত্তেজনার বশে কখন যে ডান হাত তুলে কপাল মুছেছে নিজেই বুঝতে পারে নি। খেয়াল হোল, যখন বুঝলো যে কপালটাও চটচট করছে।

একি! তার ডান হাত যে রক্তমাখা। সভয়ে সে সরে গেলো দেয়ালে ঝোলানো আয়নাটার কাছে। তার সারা কপালে রক্তের দাগ। কোথা থেকে এত রক্ত এলো তার হাতে আর কপালে?

অকস্মাৎ মনে পড়লো, দরজার হাতলটাই চটচটে লেগেছিল। নিশ্চয় কেউ হাতলটায় রক্ত মাখিয়ে—

এবার সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো সলিলেশের চোখের সামনে। এই বদমায়েস লোকটা ধীরাজবাবুকে খুন করে তার ঘরে ঢুকে টাকা দেবার ভান করে উল্টে তাকেই খুনী সাজিয়ে সরে পড়েছে। এবার সে নিশ্চয় পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে তাকেই খুনের দায়ে ধরিয়ে দিতে।

একান্ত অসহায় ভাবে একেবারেই ভেঙে পড়লো সলিলেশ। মনে হোল ও বুঝি যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

বাইরে একটা সোরগোল শোনা গেল। সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো তীব্র স্বরে। অনেক উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কয়েকটা ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে সলিলেশদের ঘরের দিকে। নিশ্চয়ই পুলিশ আসছে।

এই তো এই ঘরে। ওই দেখুন খুনী বামাল সমেত ধরা পড়েছে।

এ কর্কশ কণ্ঠস্বর সলিলেশের চেনা। ঘরে ঢুকলো সেই লোকটা। সঙ্গে দু'জন পুলিশ।

বিমূঢ় সলিলেশ হয়তো ছুটে পালাবার চেষ্টা করেছিল। হয়ত এক পা এগিয়ে গিয়েছিল দরজার দিকে, কিন্তু দ্বিতীয় পদক্ষেপের আগেই দুটো কঠিন হাত চেপে বসল তার গলায়। আর সেই সঙ্গে বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হোল তার কানে—

আরে বাবা, আর ঘুমুতে হ'বে না পড়ে পড়ে। এবার ওঠো। খাবার খাও। আর এই নাও তোমার চিঠি। লেটার বক্সে পড়েছিলো। 'শিহরণ' পত্রিকা থেকে এসেছে। একটা গল্পের তাগিদ। টাকা দেবে।

বিহ্বল সলিলেশ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো সুবেশ আর সীতেশের দিকে। তারা দু'জন দু'দিক থেকে তার গলায় হাত দিয়ে তাকে ডাকছে।

সীতেশ বললো, হাঁ করে দেখছ কি? তোমার জন্য খাবার এনেছি। পোলাও-মাংস-সন্দেশ। খাও, খাও।

ততক্ষণে লুপ্তবুদ্ধি ফিরে এসেছে সলিলেশের মাথায়।

হা হা করে হেসে উঠে সে বললো, আরে খাবার তো আছেই। একবার যখন এসেছে, ও আর পালাবে কোথায়? তার আগে চিঠিখানা দাও। একটা গল্প চাই। রোমাঞ্চকর গল্প। সেইটে আগে লিখে ফেলতে হবে। দেরী হ'লে পাছে ভুলে যাই।

কলমের মুখ খুলে সলিলেশ খচ্‌খচ্‌ করে এক লাইন লিখে ফেললো।

সুবেশ শুধালো, কি লিখলে?

—গল্পের শিরোনাম।

—কি?

—একটি রোমাঞ্চকব গল্প।

ছড়া

শ্রী ইন্দ্রাণী মজুমদার

সাদা হাতির ঢাকাই ছানা
বিকোয় দু'তিন টাকায়—
খবর পেয়ে অমনি দীপু
ছুটলো সোজা ঢাকায়;

ঢাকায় শোনে সাদা হাতির
আড়ৎ এখন ঘানায়,
কিনতে গেলেই চালান দেবে
কোয়েম্বাটুর থানায়।"

একের ভিতর তিন

শ্রী রাণা বসু

পান্না ধরেছে বায়না
চাই তার ভাঙ্গা আয়না।
মা বলেন ঃ কাছে আয় না,
দেবো তোকে আমি ময়না।
তবু থামে নাকো কান্না ॥

২

চায়না, আমার কাছে আয় না।
কাল না যাবি মামার বাড়ি কালনা ?
যাবার আগে ম্যাপ-বইটা আন না।
এনেছিস তুই। বের করতো কোন্‌খানে দেশ চায়না
পারলি না তো। এই কারণে,
তোকে কিছু কিনে দিতে
মন আমার চায় না ॥

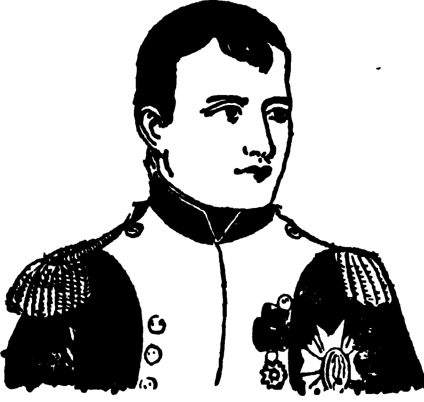
ভাই এসেছে তাই
দিচ্ছে গোন্না তাই।
দুই ভায়েতে খেলবে খেলা
উঠবে ফুটে টগর, বেলা
হাসিখুশি শিশুর মেলা
সাঙ্গ হবে মধুর বেলা ॥

একটি তারা

শ্রী শ্যামলকান্তি দাশ

মনুমেণ্টের মাথায় উঠে
দূর আকাশের একটি তারা,
দুপুররাতে সেপাই সেজে
কলকাতাকে দেয় পাহারা।

মেঘের ফাঁকে হয়তো তখন
চাঁদের বুড়ি চরকা জাগে,
একটি তারা ছড়িয়ে পড়ে
বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে ॥



নেপোলিয়ানের গুপ্তচর

শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়

গ্রামে ছোট্ট একটি তামাকের দোকানের মালিক এখন সালমিস্তার। জীবনের বেলা এখন পড়তির দিকে। আগ্রহ, উৎসাহ ও উত্তেজনা যা ছিল সব স্তিমিতপ্রায়। অথচ একদিন কী প্রতাপই ছিল তার! একেবারে যাকে বলে থরহরিকম্পমান ছিল ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়া তার নামে। আর এখন? এখন জেল-ফেরত সামান্য একজন দোকানী মাত্র সে.!

শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা যখন 'ক্ষুদে কর্পোর‍্যাল'কে পরাজিত করে নির্বাসিত করল তখন সালমিস্তারের হ'ল মাত্র কয়েক মাসের কারাদণ্ড। আর তার ধনসম্পত্তি যা ছিল তার অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত করে নিল ইংরেজরা। জেল থেকে যখন ছাড়া পেল সালমিস্তার তখনও তার যা সামান্য কিছু ছিল, তাই দিয়েই ঐ তামাকের দোকান খুলে বসেছিল সে।

এই কার্ল সালমিস্তার ছিল সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ডান হাত —গুপ্তচরদের সেরা। ঠকিয়েছিল সে সকলকে, কিন্তু ঠকায় নি কেবল তার প্রভুকে—তার প্রিয় 'ক্ষুদে কর্পোর‍্যাল' নেপোলিয়নকে। সেরা গুপ্তচর হতে গেলে যে সব গুণ থাকা দরকার তার সবগুলিই ছিল তার যেমন ছিল তাঁর অভিনয় দক্ষতা, তেমনি ছিল কূটবুদ্ধি। সে নিজেই ছিল তার নিজের গুরু।

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সীমান্তের কাছে জার্মানীর এলসেস্ প্রদেশে জন্ম হয় কার্ল কার্ভে সালমিস্তারের। যখন স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই সে রীতিমত চোরাচালানী কাজে রপ্ত হয়ে উঠেছে। তারপর যখন তার বয়স উনিশ-কুড়ি তখন তো সে পুরোদমেই বে-আইনী আমদানী-রপ্তানি চালিয়েছে দেশ-বিদেশের সঙ্গে। এই কাজ করতে করতেই সে শিখেছিল, কেমন করে কোন ব্যাপার গোপন রাখতে হয়, পদস্থ কর্মচারীদের কেমন করে ঘুষ দিয়ে বশ করতে হয় এবং কেমন করে একজনের বিশ্বাসভাজন হয়ে তাকেই ঠকাতে হয়। সালমিস্তারের গড়ন ছিল ছোটখাটো আর মুখে এতটুকু কোমলতা ও সৌন্দর্যের কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু দরকার মত লোকের চোখে নিজেকে

কমনীয় করার কৌশল জানা ছিল তার। আবার প্রয়োজন হলে দুঃসাহসী নিষ্ঠুর হতে পারত সে চরমভাবে। এইসব ক্ষমতা ছাড়াও গুপ্তচরবৃত্তির একটা মস্তবড় মূলধন ছিল সালমিস্তারের—সেটা হচ্ছে এই যে, সে যখন কোন অপরাধে অপরাধী, তখনও তার মুখের দিকে চাইলে মনে হবে সরল নির্দোষ সে।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, সে সময় ইউরোপের প্রাণ উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত। সামান্য একজন কর্শিকান সৈনিক থেকে ফ্রান্সের কর্ণধার হয়েছেন নেপোলিয়ান। সারা ইউরোপ দখল করবার সাহস তাঁর বুকে, আর পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন তাঁর চোখে। দিগ্বিজয়ের স্থচনাও দেখা দিয়েছে এরই মধ্যে—ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী দেশগুলি তাঁর করতলগত হওয়ায়।

নেপোলিয়ানের মত একজন অসামান্য শক্তিধর পুরুষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত সালমিস্তার। তারও স্বপ্ন ছিল উঁচুতে ওঠবার—রাজকীয় ব্যাপারে মাতব্বর হবার। এই কল্পনা সফল হবার সুযোগও এসে গেল একদিন।

নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনীতে স্যাভারি নামে ছিল এক সেনাপতি। সে সালমিস্তারকে ভালভাবেই জানত। স্যাভারি একদিন তার কাছে গিয়ে বললে, দেখ সালমিস্তার, তোমার মত একজন কাজের লোকেরই দরকার আমাদের দলপতির। রাজী আছ?

সালমিস্তার বললে, কি কাজ?

স্যাভারি তাকে বুঝিয়ে দিলে কাজটা। বললে, নেপোলিয়ান একটু অসোয়াস্তিতে রয়েছেন বুরবোঁ বংশীয় কয়েকজন লোকের জন্যে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কাজেই নেপোলিয়ান চান, কেউ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার চেষ্টা করলে তার পরিণামটা কি তা দেখিয়ে দিতে।

ব্যাপারটা ভাল করে শুনে নিয়ে সালমিস্তার বললে, আচ্ছা, যদি বুরবোঁদের কারুকে ভুলিয়ে আনতে পারা যায় সীমান্তের দিকে?

স্যাভারি বললে, ব্যস্ তাহলেই তো কেল্লা ফতে! তুমি তাকে ধরে ফেলবে, তারপর চূড়ান্ত যা হবার তা তো বুঝতেই পারছ।

কয়েক মিনিট আলোচনার পর ঠিক হ'ল কাকে এই পুজোয় বলি দেওয়া হবে। তরুণ ডিউক এন্‌ঘিন জার্মানীতে বডেন শহরে বাস করছিলেন। স্থির হ'ল তাকেই ফাঁদে ফেলা হবে প্রথমে। কাজ আরম্ভ করে দিল সালমিস্তার। সে প্রথমে জেনে নিল ডিউকের নাড়ী-নক্ষত্র সব। এমন কি ফ্রান্সের অন্তর্গত স্ট্রাসবুর্গের এক ধনীর মেয়ের সঙ্গে যে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে তাও

জেনে ফেললে। সালমিস্তার প্রথমে করলে কি সেই মেয়েটিকে মিথ্যা অজুহাতে বন্দী করে এনে রাখলে ফরাসী সীমান্তের একটি জায়গায়।

কয়েক দিনের পর ডিউক এন্‌থিন একটা চিঠি পেলেন, তার সেই বাক্‌দত্তার কাছ থেকে। তাতে লেখা ছিল: আমাকে এরা বন্দী করে রেখেছে। তুমি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে না গেলে উপায় নেই। নিশ্চয়ই আমার একটা ব্যবস্থা করবে।

এই চিঠি কার্ল সালমিস্তারের কারসাজি। কেমন করে হাতের লেখা নকল করতে হয়, সই জাল করতে হয় তা তার ভালরকমই জানা ছিল। কাজেই ডিউক বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে, ফরাসী সীমান্তে যাত্রা করলেন, সেখানকার কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে এ-কাজ হাসিল করতে পারবেন এই ধারণায়।

কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। সালমিস্তার ফাঁদ পেতে বসেছিল। ডিউক ফরাসী সীমান্তে প্রবেশ করার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাজির করল কর্তৃপক্ষের সামনে। কয়েকদিনের মধ্যে বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হ'ল—সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে।

এই কাজের সুদক্ষ পরিচালনার জন্যে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার মত পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল সালমিস্তারকে। ফ্রান্সের সম্রাটের গোপন বৈঠকে ডাক পড়তো তার। গুপ্তচরের কাজের গুরুত্বপূর্ণ ভার পড়ল সালমিস্তারের উপর।

নেপোলিয়ান তাকে পাঠালেন অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর সমূহ তথ্য সংগ্রহ করে আনার জন্য। নেপোলিয়ান সালমিস্তারকে বললেন, যা কিছু খবর তা সরাসরি সব আমার কাছে এসে জানাবে।

কয়েকদিন পরে এক মজার ঘটনা ঘটল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে। কিন্তু মার্শাল কার্লম্যাক তখন অস্ট্রিয়-বাহিনীর অধিনায়ক। রক্ষীদল তাঁর সামনে হাজির করল বন্দীকে। ফরাসী সীমান্তে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মার্শাল সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

সালমিস্তার শান্তভাবে জার্মান ভাষায় বললে, আমার নাম কার্ল-সালমিস্তার। আমি অস্ট্রীয়ার পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করছি, এই অভিযোগে ফ্রান্স থেকে আমায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

—কিন্তু তুমি তো গুপ্তচর বাহিনীর লোক নও?

—না, আমি তা নই। তবে আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একজন মস্তবড় হাঙ্গেরিয়ান। আমি কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সে বাস করছি।

রীতিমত অভিনয় করতে জানতো সালমিস্তার। তার কথায় কেউ ধরতেই পারল না যে তার বাবা এলগেসের এক গরীব ধর্মযাজক ছিল। তার ভাবভঙ্গী দেখে কেউ ভাবতেই পারল না যে, সে সম্ভ্রান্ত হাঙ্গেরীয় পরিবারের নয়। সে বলে চলল, আমি অবশ্য গুপ্তচর নই ফরাসীরা যা সন্দেহ করে ; তবে গুপ্তচর হিসাবে আমি আপনার সহায়তায় লাগতে পারি।

সংবাদ-সরবরাহকারী পদে সেইদিনই নিযুক্ত হ'ল সালমিস্তার। মার্শাল বললেন, তোমাকে ফ্রান্সে গিয়ে আমাদের পক্ষে গুপ্তচরগিরি করতে হবে।

মাথা নেড়ে সালমিস্তার বললে, আমি আপনার শিবির থেকেই নেপোলিয়ানের পতনের জন্য যা যা করার দরকার তা করব। ফ্রান্সে ফিরে গেলেই আবার ধরা পড়ে যাব, তখন আর কোন কাজেই লাগব না।

—চমৎকার প্রস্তাব সালমিস্তার, তুমি তাই করো।

শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ানের গুপ্তচর ভিড়ে গেল তারই শত্রুদলে, তাদের খুব বিশ্বাসী কর্মচারী হয়ে।

অস্ট্রীয়ানদের কাছ থেকে মোটা বেতন এবং অপরদিকে নেপোলিয়ানের কাছ থেকে মাসোহারা পেতে লাগল সে। রাজদরবার থেকে আরম্ভ করে, অফিসার ক্লাবে, সম্ভ্রান্ত সমাজে অবাধ হয়ে উঠল তার গতিবিধি। ধীরে ধীরে মার্শালের মন থেকে নেপোলিয়ানের ভীতি সে একেবারে দূর করে দিল। সালমিস্তার মার্শালকে বোঝাতে লাগল যে, অস্ট্রীয়া আক্রমণ করার কল্পনা নেপোলিয়ানের নেই। তার ফরাসী গুপ্ত সহযোগীদের লেখা চিঠি দেখাতে লাগল সে। তারা লিখেছে, নিজের দেশের ভিতরকার ব্যাপারে নেপোলিয়ান ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছে। চিঠিপত্র ছাড়া নিয়মিত খবরের কাগজ আসত ফ্রান্স থেকে সালমিস্তারের কাছে তা নেপোলিয়ানের আদেশেই ছাপিয়ে পৃথক-ভাবে পাঠান হ'ত। বেচারা মার্শাল তাকে বিন্দুবিসর্গও সন্দেহ করতে পারেন নি।

এরপর একদিন সালমিস্তারের কাছে সংবাদ এলো—সম্রাট অস্ট্রীয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। খবর পেয়েই সালমিস্তার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল মার্শালের শিবিরে। উত্তেজনার ভাব দেখিয়ে তাঁকে বললে, মার্শাল আর দেরী নয়। সারা ফ্রান্স নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্স থেকে আমার চরেরা গোপন খবর পাঠিয়েছে বিদ্রোহের। অস্ট্রীয়ার সীমান্তে যেসব ফরাসী বাহিনী ছিল, তাদের সব ফিরে যাবার হুকুম হয়ে গেছে। এই বিপ্লব দমন করবার

জন্যে নেপোলিয়ানের ঐ সব সেনাদের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। আর দেরি নয় মার্শাল! ফরাসী বাহিনীকে পিছন থেকে আক্রমণ করুন, অস্ট্রীয়ার জয় নিশ্চয়ই।

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সালমিস্তার। দারুণ উত্তেজনা ও ভাবী বিজয়ের গর্বে লাফিয়ে উঠলেন মার্শাল, বললেন, ঠিক বলেছ সালমিস্তার, আর বিলম্ব নয়!

মার্শাল তাঁর ত্রিশ হাজার বাছাই সেনাবাহিনীর উপর আদেশ জারি করলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল, বিশাল অস্ট্রীয়ান বাহিনী উলস্ শহর ছেড়ে এগিয়ে চলেছে ফ্রান্স অভিমুখে। কিন্তু হঠাৎ কি যে হয়ে গেলো মার্শাল্ ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। দ্রুত এগিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে ফরাসী সেনারা ফিরে চলেছে তাদের রাজধানীর দিকে। কিন্তু একি! তারা তো চলে যাচ্ছে না, তারা তো এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। ফরাসীদের শত শত কামান গর্জন করে উঠল, আকাশ বাতাস গেল ধোঁয়ায় ঢেকে। মার্শাল আরো জোরে হেঁকে উঠলেন, দ্রুত এগিয়ে চলো।

দুরন্ত লড়াই বাধল দুই দলে। তিনদিন অবিরাম যুদ্ধ, অবিরাম বর্ষণ। রক্তে আর বৃষ্টির জলে রণস্থল রক্ত-কর্দমাক্ত এক ভীষণ আকার ধারণ করল। তবুও দুই দলের যুদ্ধের বিরাম নেই। সৈনিক আর তাদের বাহন ঘোড়াদের মৃতদেহে চারিদিক স্তূপাকার হয়ে গেল। শরীর আর বইছে না, তবুও লড়ছে সৈন্যদল—ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে দলে দলে।

তৃতীয় দিন মার্শাল তার অবশিষ্ট বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিলেন নেপোলিয়ানের কাছে। কিন্তু তখনো তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি সালমিস্তারের কারসাজি। তারপর কোনমতে ফিরে এলেন ভিয়েনাতে—ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে বিষন্ন মার্শাল।

সালমিস্তার কিন্তু তার আগেই ভিয়েনাতে ফিরে এসেছিল। অস্ট্রীয়ার সম্রাটকে সে বুঝিয়েছিল যে, মার্শাল ম্যাকের জন্য এই পরাজয়। কারণ ফরাসীরা প্রস্তুত আছে জেনেও তিনি তাদের আক্রমণ করতে এগিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ানের বাহিনী আরও এগিয়ে এসেছে দেশের ভিতর।

সালমিস্তারের ফাঁদে আরার পড়ল অষ্ট্রিয়ান বাহিনী—অস্টারলিজের বিখ্যাত যুদ্ধ আর সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেই সমস্ত অষ্ট্রীয়া দখল করলেন নেপোলিয়ান।

নেপোলিয়ান ভিয়েনাতে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সালমিস্তার অস্ট্রিয়ানদের মনে এই বিশ্বাস অটুট রেখেছিল যে, সে তাদের বন্ধু এবং তাদের জন্যেই সে জীবনে সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু যখন তারা তার আসল রূপ ধরতে পারল, তখন সালমিস্তার হাওয়া হয়ে গেছে ভিয়েনা থেকে। এর কিছুদিন পর সে যখন আবার ফিরে এলো, তখন সে নেপোলিয়ান সরকারের এক পদস্থ সেনসর অফিসার।

সম্রাট নেপোলিয়ানের জন্যে সালমিস্তার হাজার হাজার লোককে ঠকিয়েছে মিথ্যে কথা বলে। বিপুল সৈন্যবাহিনীকে ঠেলে দিয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। নেপোলিয়ানও তার কাজের জন্যে বরাবর তাকে পুরস্কৃত করেছেন মুক্তহস্তে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সালমিস্তারের একটি অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। সেটি হ'ল ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক উপাধি। তিনি বলেছিলেন, ওটা ছাড়া সবকিছু তিনি তাকে দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু একজন গুপ্তচরকে তিনি ঐ শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করতে পারবেন না।

একছুটে

শ্রী নির্মলেন্দু গৌতম

বন ছাপিয়ে নামলো আঁধার
বেরিয়ে পড়লো বনের রাজা
চোখের সামনে দেখলো কেবল
মজার মজার খাবার যা-যা!

সঙ্গে সঙ্গে জিভের জলে
ভিজিয়ে দিয়ে বনের মাটি,
দারুণ মজায় বনের মধ্যে
করলো খানিক হাঁটাহাঁটি।

যেই থামা, সেই বনবেড়ালের
বাচ্চাটা ঠিক সামনে এসে,
ভয়েই বুঝি বিষম খেয়ে
'খ্যাঁক' ক'রে সে উঠলো কেশে

বনবেড়ালের বাচ্চাটাকে
ভাবলো কী যে বনের-রাজা,
এক ছুটে সে নিরুদ্দেশে
রইলো পড়ে খাবার যা-যা!

বিপ্লব মোচ্ছব

শ্রী পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরানোকে পুড়িয়ে,
নতুনকে গুঁড়িয়ে,
যা-আছে তা উড়িয়ে
আমাদের বিপ্লব।

দেশে আছে যতো কিছু,
ছোটো বড়ো উঁচু নিচু,
আগুয়ান আর পিছু
দুরমুশ করো সব।
নীতিবোধ খাও গুলে,
ভদ্রতা দাও তুলে,
বিলকুল যাও ভুলে
সদ্‌ভাব অনুভব।

লেখাপড়া দিয়ে ছেড়ে
রকে বসো গিয়ে গেড়ে,
তুলে চাঁদা করো তেড়ে
বারোয়ারি, উৎসব।
পাশ করো টুকে, ভাই,
তারপর ছিনতাই
ভাববার কিছু নাই—
বিপ্লব মোচ্ছব।

উড়নচণ্ডী

শ্রী মনোজিৎ বসু

জানিস্ কি তুই, দিদি আমার
নিত্যি কেবল উড়ছে?
লণ্ডনে আজ, মস্কোতে কাল
দিব্যি কেমন ঘুরছে!
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরেও
নেইকো দিদির ক্লান্তি।
কেমন ক'রে বেড়ায় উড়ে
তা যদি তুই জান্‌তি!
হাঁ ক'রে ছাই ভাবিস্ কী তুই,
লাগছে মনে খট্‌কা?
মিথ্যে বলি? দিদি আমার
যায় না কামস্‌কট্‌কা?
বেরুট থেকে অস্ট্রেলিয়া,
কিংবা ওয়াশিংটন;

দিল্লী থেকে যায় টোকিও,
মালয় হয়ে লণ্ডন।
দিদি আমার দেশ-বিদেশে
নিত্যি সে ভাই যাচ্ছে।
তুই হাঁদারাম, ভাবিস্ বুঝি—
'পয়সা কোথায় পাচ্ছে?'
শোন্ তবে শোন্, আসল ব্যাপার-
দিদি এয়ার-হোস্টেস্।
দেশ-বিদেশে তাইতে ঘোরে
পয়সা ছাড়াই রোজ বেশ!
আকশে-পথে উড়ে বেড়ায়—
নামটা দিদির 'চণ্ডী'।
ওড়ে ব'লেই বাবা তাকে
বলেন—'উড়নচণ্ডী'!



মোহিনীর কান্না

শ্রী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

গা ছমেছমে রাস্তা।

দিনের বেলাতেই যেতে ভয় পায় লোকে, রাতে তো কথাই নেই। এদিকের ত্রিসীমানা মাড়ায় না কেউ। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিথর নিঝুম রাতে অনেক লোকের নিঃশ্বাস পড়তে শুনছে ধ্যানেশ। বেশ জোরে। সময় সময় অনেক নিঃশ্বাস আর নিজের নিঃশ্বাস এক হয়ে যাচ্ছে যেন। একসঙ্গে দ্বিগুণ জোরে পড়ছে।

দ্রুতগতিতে চলছে ধ্যানেশ।

হাতে টর্চ জ্বালানোর উপায় নেই। তাকে দেখতে পেলে, চিনতে পারলে সর্বনাশের একশেষ। অন্ধকারে তাকে কেউ দেখতে পাবে না বলে, মিশমিশে কালো রঙের প্যান্ট-শার্ট পরেছে। অন্ধকারে মিশে চলছে।

যে কাজ করতে যাচ্ছে, সে কাজ এই নিশুতি রাত ছাড়া করা মুশকিল, লুকিয়ে করতে হবে। সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে।

মোহিনী তাই বলে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে, ভয়ংকরের মোকাবিলা করতে ভয়ংকরও হয়ে উঠতে হবে। মোহিনী তার সহায়। ঠিক জায়গায় ঠিকমতো সময়ে ও প্রতীক্ষা করবে। জায়গার নিশানা বলে দিয়েছে। গহিন রাতে নিজের কাজ সেরে এসে ঘুমুবে যখন রামরতন, সেই মুহূর্তে সুযোগ নিতে হবে।

বিচার বুদ্ধি আর ভরসায় উনিশ-বিশ হয়ে গেলে অর্থাৎ একচুল এধার-ওধার হয়ে গেলে, আর রক্ষে নেই। দু'জনের মুণ্ডু ধড় থেকে খসে পড়বে এই মেঠো পথে, কিংবা জঙ্গলে, না হয় পুকুরপাড়ে।

জায়গাটার বাতাসে হাহাকার উঠছে থেকে থেকে। মোচড় দেয়া ব্যথা-গলা কান্না মেশানো। চলাপথে জুতোর মুখে বার বার কি যেন কি ঠেকছে, টর্চটা জ্বাললো নীচু করে, হাত চাপা দিয়ে। মড়ার মাথা। একটা-আধটা গোটাকতক ছড়ানো এদিকে-ওদিকে। নিমগাছটার পেছনে ঘাপটি মেরে

বসে আছে একটা শেয়াল। টর্চটা নিভিয়ে ফেলতে দপ করে জলে উঠল ওর দু'চোখ।

হেমন্তের রাত্রি।

হিম হাওয়া পেছন দিক থেকেই আসছে। ঠেলছে যেন ধ্যানেশকে। ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সামনে। আরো সামনে। আরো—আরো। বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। পচা মড়ার উৎকট গন্ধ। মাথা ধরে যাচ্ছে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দেখে দেখে জায়গা নির্বাচন করেছে বেশ মোহিনী। শ্মশান। ধ্যানেশ বলেছিল, অন্য একটা জায়গা বেছে নাও না কেন?

—ওটাই উপযুক্ত। ওখান দিয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো যাবে। একটা কীট-পতঙ্গেরও নজরে পড়তে হবে না। কাজ হাসিল হবে অনায়াসে।

কিন্তু কোথায় তাড়াতাড়ি—এ যে অনেক দেরী হচ্ছে। মনের অবস্থা এমন হয়ে আসছে, একপা-র পথ দশপা মনে হচ্ছে। এগোতে ইচ্ছে করছে না। ধ্যানেশ এখন কি কর'বে? পৌঁছিয়েও কোন লাভ নেই। অনুসরণ করছে না তাকে কেউ। দিশেহারা ধ্যানেশ মোহিনীর জন্য অস্থির হয়ে উঠছে। মোহিনী না এলে, রাস্তা দেখাবে কে? বিপদে পড়ে যাবে শেষে।

মনের মধ্যে সংশয়-আতঙ্ক উঁকি মারতে শুরু করল মোহিনীর কথা চিন্তা করতে। সত্যিই মোহিনী সরল না কুটিল? মানুষের মুখ দেখে সব সময় বোঝা যায় না। কথাবার্তায়ও না। ফ্যাসাদে ফেলার জন্য আসতে বলে নি তো? মোহিনীর কথা বিশ্বাস ক'রে জীবন বিপন্ন না হয়!

প্যাণ্টের ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখল। ঠিক আছে।

দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। একটু বসতেও। কিন্তু পারছে না। কে যেন জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে দাঁড়াতে দেবে না। যতক্ষণ না তার ইচ্ছে পূরণ হবে, ততক্ষণ?

অনেক দেশে ঘুরেছে, অনেক গাঁয়ে [illegible]ছে, থেকেছে। এমন হয় নি কখনো। রাতবিরেতকে রাতবিরেত বলে মনেই হয় নি। আর আজকের রাত্তিরকে? শুধু রাত্তির নয়, ভয়ংকর রাত্রি মনে হচ্ছে। তাকে ঘিরে ভয়ংকর নামছে চতুর্দিকে। এরপর চারদিকের ওই কালো যবনিকা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে। তারপর চেপ্টে পিষে কালো যবনিকায় মিশিয়ে নেবে একদম।

কেন এলো মোহিনীর কথায় ধ্যানেশ? ও যখন বলছিল, তখন মনে হয় নি মিথ্যে, মনে হয় নি বানানো, মনে হয় নি কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে এই সরল শিশুর মতো মেয়ের মিষ্টি চাউনিতে। এটা ওর স্বাভাবিক চাউনি। কিন্তু বলছিল যখন, চেখের তারায় উত্তেজনা নাচছিল। এলোমেলো চুল মুখের এপাশে-ওপাশে দুলছিল। দেহের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জড়ো হয়েছে। মুখখানা সিঁদুর বর্ণ।

কথা কইতে কইতে দু'চোখ জলে ভরে এলো। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, বিশ্বাস করুন আমার কথা। আর সইতে পারছি না।

বিশ্বাস করেছে। করেছে বলেই তো এসেছে ধ্যানেশ। গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়ের, বৌ। তাছাড়া ওর হাবভাবে মনে হয় নি ছলচাতুরিতে ভরতি। ওর কথার এমন আকর্ষণ—ছুটে এসেছে।

মোহিনী যবে গেছল ধ্যানেশের কাছে, তার দিনদুয়েক বাদে এসেছে। আজ আসবে মোহিনী জানে না। মোহিনীকে খবর দিলে, নিশ্চয় অপেক্ষা করত। ওকে না দেখতে পেয়ে, বোধহয় সন্দেহের দানা বাঁধছে ভেতরে।

একটু রাত হতেই, মোহিনীর কথা মনে পড়ছে কেবল। মনে হয়েছে মোহিনী যেন দু'দিন আগের মতো সামনে দাঁড়িয়ে বলছে সমস্ত। সেই জল-ভরা চোখ, সেই কাঁদো কাঁদো মুখ, সেই কান্নায় ভেঙে পড়া কাঁপা গলা। —আপনি আসুন না একবারটি। আজই আসুন। দয়া করে আসুন আমার সঙ্গে।

ধ্যানেশ ক্লান্ত। অন্য কাজ থেকে সবে এসেছে। তবু ওর জন্য মনটা এত অস্থির হয়ে পড়ল যে, চারদেয়ালের বদ্ধঘরে তিষ্ঠতে পারল না একদণ্ড। বেরিয়ে পড়ল।

এসেছে। কিন্তু মোহিনী কোথায়? ও যে কথা দিয়েছিল নিশ্চয় থাকবে। বলেছিল ধ্যানেশ, দেখলে তো, তোমার সামনেই যা ঝামেলা এসে ঘাড়ে চাপল—সেখানেই যেতে হচ্ছে আগে। না গিয়ে উপায় নেই, জরুরী। তোমার ওখানে যদি অন্যদিন যাই, তোমায় পাব কোথা?

—যতদিন না যান আমি একই জায়গায় অপেক্ষা করবো প্রতি রাত্তিরে। হতাশার সুর বেজে উঠেছিল মোহিনীর কণ্ঠস্বরে।

কষ্ট হয়েছিল ধ্যানেশের। বলেছে, সত্যিই যাবো আমি। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, রোজ রাত্তিরে বাইরে থাকলে রামরতনের নজরে পড়বে না?

দৃঢ় গলায় বলেছে মোহিনী, না। ওসময় ওর উত্থান-শক্তি রহিত। নেশার পিঁপেয় ডুব দিয়ে থাকেন উনি। অন্য রাজ্যে বিচরণ তখন। সে সব আমার দায়িত্ব। আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই।

আচমকা মোহিনীকেই যেন দেখল ধ্যানেশ। দূর দিয়ে যাচ্ছে উত্তরমুখো। দু'চোখ রগড়ে নিল। সামনে কুয়াশা। বড় বড় চোখ ক'রে ওইদিকেই তাকাতে লাগল। সত্যিই মোহিনী যাচ্ছে। যাতে ধ্যানেশের লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, সেইভাবেই যতটা সম্ভব, আঁকা-বাঁকা দু'ধারে গাছ-গাছালি ভরা পথ হলেও চোখের সিধেই চলেছে।

ধ্যানেশ দ্রুত পা চালিয়ে চলছে মোহিনীকে লক্ষ্য রেখে।

ঝাঁকড়া মাথা আমগাছটার তলায় গিয়ে থামল মোহিনী। দাঁড়িয়ে আছে।

মোহিনী বলেছিল, রামরতন এখন যা করছে সেটা অসহ্য। কোন রকমেই তাকে আর প্রশ্রয় দিতে পারে না সে।

আগে কালীমূর্তি বসিয়ে যে রোজগার করত, সেটা তবু সওয়া যায়। যদিও মোহিনী সে কাজ করতে বাধা দিয়েছে অনেকবার। মায়ের নামে ভণ্ডামি করাটা ভালো নয়। মা তোমায় বলে দেয়—কোন রোগের কি ওষুধ? ও গাঁয়ের নিমু কবরেজ মারা গেল—তুমি রাতারাতি মহাপুরুষ সাধক মায়ের বরপুত্র বনে গেলে। নিমু কবরেজের বোকা ছেলে—এই হারুর কাছ থেকে বাপের মুষ্টিযোগ লেখা খাতাটা হাতিয়ে নিলে বেশ। তারপর গাছ-গাছড়া নিয়ে আসছো, থেঁতো করছো, আর শিশিতে তার নির্যাস পুরে টাকা লুটছ দু'হাতে। কি—না মা স্বপ্নে ওষুধ বলে দিচ্ছে তোমায়।

ক্রোধে ফেটে পড়েছে রামরতন। বলেছে, আমার ব্যাপারে নাক গলাবি না বলে দিচ্ছি। সহধর্মিণী স্বামীর সব কাজে সাহায্য করবে, তা নয় উল্টো, বাধা দেবে।

—মিথ্যে বলুক, যাই করুক, দ্রব্যগুণে কিছু লোকের তো উপকার হ'ত তবু। এবারে ওদের পিশাচে পেয়েছে বোধহয়। তা না হলে—বিবেক বলে কোন বস্তু যদি থাকে কারো—এমন কাজ করে না।

মোহিনী হাতে ধরেছে, পায়ে পড়েছে, পাষাণ-হৃদয় লোকটাকে চোখের জলে টলাতে চেষ্টা করেছে—পারে নি। পাষাণে চিড় খায় নি। সরু রেখার আঁচড়টি অবধি পড়ে নি।

উনি বাদশাহ বনবেন নাকি। ধনুক-ভাঙা পণ—শরীর পতন কি মন্ত্র সাধন। কোন দেব-দেবীর সাধনায় নয়। অর্থ উপার্জনের। আগের সঙ্গতি-পন্ন লোক মানেই লাঠিয়াল-ডাকাতের বংশধর। এ পেশা বেছে নিতে তারই বা দোষ কি ?

মোহিনীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।

দিনের পর দিন এই অন্যায় সহ্য করছে মোহিনী। মোহিনী একা, অসহায়। স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে বিপথ থেকে সরিয়ে আনা। পারছে না। কত রকম ভয় দেখাচ্ছে, তবুও না।

তেলিপাড়ায় ডাকাতি হ'ল। ওদের বাড়ীতে আগুন জ্বলল। বাল্যবন্ধু পদ্মার ছ'মাসের ফুলের মতো বাচ্চাটা কি দোষ করেছিল—পদ্মা গয়না খুলতে চায় নি—তা বলে ওর বুকের রত্নটাকে বুক থেকে টেনে নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ?

হাঁপাচ্ছিল মোহিনী। বসে পড়েছে বেঞ্চিতে। জলের ধারা নেমেছে হু-হু করে দু'চোখ উপচে। বলছে, এর প্রতিকার একমাত্র আপনিই করতে পারেন।···

আমগাছটার কাছাকাছি আসতেই, মোহিনীকে দেখতে পেল না আর ধ্যানেশ। টর্চ জেলে দেখতে গিয়ে, অতর্কিতে একটা দুর্দান্ত আক্রমণ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

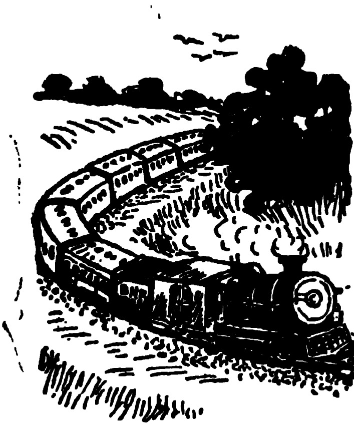
নিমেষের মধ্যে কি যে হয়ে গেল তার ঠিক নেই। রিভলবার বার করে গুলি চালিয়েছে ধ্যানেশ। হুইসল বাজিয়েছে। আশেপাশে ওঁত পেতে ছিল যে সব সিপাই—ধ্যানেশ গোয়েন্দার নির্দেশে ছুটে এলো।

রামরতনের পায়ে গুলি বিঁধেছে। পড়ে গেছে। দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধল সিপাইরা ওকে। পালাতে যেন না পারে।

কোদালটা পড়ে রয়েছে পাশে। মানুষ প্রমাণ মাটি কোপানো হয়েছে। মোহিনীর মৃতদেহ শোয়ানো। গলায় আঙুলের দাগ। কালসিটে পড়ে গেছে। মোহিনীকে শেষ করে নিয়ে এসে, সবে মাটি চাপা দিতে যাচ্ছিল রামরতন, ধরা পড়ে গেল।

ধ্যানেশের চোখের কোণ জ্বালা করে উঠেছে। দু'দিন আগে এলে, হয়তো মোহিনীকে এভাবে দেখতে হ'ত না। একটা খুনের সংবাদ পেয়েই দৌড়তে হয়েছিল সে সময়।

মোহিনীর কথাটা কানে বাজছে ধ্যানেশের। বাবু, আমি ওকে বলি, পুলিশে ধরিয়ে দিয়েও একাজ বন্ধ করাবো তোমার। ও বলে, চেষ্টা করে দেখ না একবার। আমার চর চারদিকে। তোকে আর দুনিয়ায় থাকতে হবে না তাহলে। বলুক ও। আমি প্রাণের মায়া করি না বাবু। যদি মরেও যাই, তবু ওকে ধরিয়ে দোবই দোব।



রেল

শ্রীশৈবাল চক্রবর্তী

কটা দেশলাই,
পাই তো বানাই।

মজার সে খেল
এত বড় রেল।
পর পর জুড়ে
কাঠি দিয়ে ফুঁড়ে,
ধোঁয়া ভুস্ ভুস্
মিনু ভারী খুশ
এঁকে বেঁকে যায়
পুষিটা লাফায়।
বাবা বলে বাঃ
থেমে গেল যাঃ,
দেখি ইনজিন
গুঁজি আলপিন!
চলে রেল দূর
ডাইনে পুকুর,
রেল থেমে যান
ওপাশে বাগান।
মাঠ ছেড়ে পূবে
রেল ঠিক যাবে,
ধোঁয়া ভুসভুস
ওপারে আকাশ।
নীল নীল মেঘ
রেল দ্রুত বেগ,
এঁকে বেঁকে যায়
বাঁশীটা বাজায়।
সরে যায় লোক
আরও জোর হোক,
কু ঝিক ঝিক
চলোহ রে ঠিক!
ঘোরে কত দেশ
বাবা বলে বেশ,
হল যেই সাঁঝ
সেরে সব কাজ।
ফিরে আসে ঠিক
কু ঝিক ঝিক,
তাকে নিয়ে শুই
দু'জনে ঘুমুই।



সাধুর যাদু

যাদুকর এ. সি. সরকার

গ্রামের শেষে অশথ গাছে ঝোলে বাদুড় মেলা
তার তলাতে জমায় আসর ভণ্ড সাধুর চেলা।
ফিতে বিহীন খড়ম পায়ে
হেঁটে সে যে আদুড় গায়ে
রাতারাতি জমায় পশার দেখিয়ে যাদুর খেলা।
গাঁয়ের চালাক ছেলে হাঁদু
বলে, 'এসব নিছক যাদু—
সব চালাকি ঘুচাই ব্যাটার, চলরে মাথুর, প্যালা।
গঁদ মাখিয়ে খড়ম পরে
মন্ত্র-গুণের ভড়ম করে
সামনে সবার ধরবো এবার জাদুর যাদুর খেলা।'
তার পরে যা ব্যাপার ঘটে
কাণ্ড সেটা লেখার বটে
তল্পি নিয়ে পালায় জাদু খেয়ে হাঁদুর ঠেলা!

ও মেঘ তুই উড়ে যা

শ্রী দিলীপকুমার সান্যাল

ও মেঘ তুই উড়ে যা—
খরার দেশে চলে যা,

নামুক চাষী মাঠে মাঠে
নতুন সুর হাটে বাটে,
সোনার ফসল ঝলমলিয়ে
উঠুক হেসে কলকলিয়ে,—

শুকনো প্রাণে নবীন আশা
দে ছড়িয়ে ভালোবাসা।
যা-যা মেঘ উড়ে যা—
দুখের দেশে চলে যা।



ইচ্ছা পূরণ

শ্রী অমলশঙ্কর রায়

এক কাঠুরে পরিবার।

কাঠুরে, তার স্ত্রী আর তাদের একটি মেয়ে।

তারা থাকে বনের এক পাশে। পর্ণকুটির, ছোট একটা বাগান। বাগানে গাছে গাছে ফল, জমিতে শাক-সবজি নানা রকম।

কাঠুরে দিনভর কাঠ কাটে, বাগানে কাজ করে, তাদের দিন কেটে যায়।

কিছু দূরে এক ধনী বাস করে। তার টাকা পয়সা, ধন দৌলত, লোক লস্কর অনেক। কাঠুরে ভাবে তারা যদি ঐ ধনীর মত টাকা-পয়সার মালিক হত তাহলে কি মজাটাই না হত। ছোট মেয়েটি বলে, 'যদি এক পরী এসে আমাদের বর দিতে চাইত তাহলে এ ধরণের ইচ্ছার কথাই বলতাম?

বলতে বলতে একটি অপরূপ পরী এসে দাঁড়ায়, বলে, 'আমাকে তোমরা ডাকছিলে—আমি এসেছি। বল তোমরা কি চাও?' পরীকে দেখে কাঠুরেরা তাকিয়ে থাকে। তাদের মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না।

পরী আবার বলে, 'আমি তোমাদের বর দিতেই এসেছি। বল তোমরা কি চাও? তিনটি বর দেব। ভেবে দেখ, কি কি বর তোমরা চাও?' বলে পরী শূন্যে মিলিয়ে যায়।

কাঠুরে বসে পরামর্শ করতে থাকে, কি ধরণের ইচ্ছা তারা পূরণ করবে। কাঠুরের স্ত্রী বলে, 'আমরা চাই প্রকাণ্ড এক বাড়ী, অনেক টাকা পয়সা আর অসংখ্য দাস-দাসী।' কাঠুরে বলে, 'নাঃ, তার চেয়ে বড় জিনিষ স্বাস্থ্য। শরীরটা তাগড়াই থাকলে খাটতে পারব আর অনেকদিন বেঁচে থাকবো।' কথাটা স্ত্রীর মনে ধরল না। সে বললে 'গরীব হয়ে বেশীদিন বেঁচে থাকায় সুখ কি? বড়লোক হওয়ার মত সুখ আর কিসে আছে বল?'

এইভাবে কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। তারা ভাবে আর ভাবে—কি বর তারা চাইবে? দিনের পর রাতও কেটে যায়। তারা ঠিক করে উঠতে পারে না, কি বর তারা চাইবে।

তখন শীতকাল। বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা। ঘরের এক পাশে উনুন জেলে, তারা গা গরম করছে। এমনি সময়ে কাঠুরে-গিন্নি বলে ওঠে, 'এখন যদি বেশ খানিকটা মাংস পেতাম তাহলে সেটা আগুনে ঝলসে দিব্বি খেতে পারতাম।

এমন আরাম আর কিসে আছে, বল ?' বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে বেশ বড় একখণ্ড মাংসের টুকরো তাদের সামনে এসে পড়ল। তারা দেখে অবাক্। তবে তখনই তারা বুঝতে পারল এটা সেই পরীর দান।

কাঠুরের মাথা গরম হয়ে উঠল, সে—স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে—'ছি ছি, এত জিনিষ থাকতে এক টুকরো মাংস চাইলে ? এখন বসে বসে ঐ মাংস শোঁকো আর খাও। তোমার যেমন বুদ্ধি।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাংসের টুকরোটা টুক্ করে গিয়ে কাঠুরে-গিন্নির নাকে গিয়ে লাগে আর ঝুলতে থাকে। মাংসের চমৎকার গন্ধ কাঠুরে-গিন্নির নাকে গেলেও সে অস্বস্তি বোধ করে। সে মাংসের টুকরোটা ধরে টানাটানি করে—যাতে সেটা নাক থেকে আলগা হয়ে যায়। কিন্তু কিছুতেই যে তা হবার নয়। যন্ত্রণায় কাঠুরে-গিন্নি চেঁচাতে সুরু করে আর বলে, 'ব্যথায় মরে গেলাম। আমাকে বাঁচাও।' বলার সঙ্গে সঙ্গে মাংসের টুকরোটা ঝুপ্ করে নাক থেকে খসে নীচে পড়ে গেল, কাঠুরে-গিন্নি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

একটু পরে কাঠুরে-গিন্নি বলে, 'তাহলে পরীর তিনটে বর দেওয়াই হয়ে গেল। পরী বেশ একটা রঙ্গ করে গেল আমাদের সঙ্গে। যাক আর বর চাওয়া নয়,—এবার আমরা যেমন পরিশ্রম করে আর সৎভাবে দিন কাটাচ্ছিলাম তেমনি ভাবেই কাটাবো। সে-ই ভাল।'

কাঠুরে বলে, 'নিজে খেটে যতটুকু পাওয়া যায় সেটাই সব চাইতে বড় পাওয়া। এর চাইতে বড় রকমের পাওয়া আর কিছুতেই নেই।' বলে সে মাংসের টুকরোটা তুলে নিয়ে আগুনে ঝলসাতে থাকে।

---

* ফরাসী রূপকথা।

সোনার কাঠি

শ্রী প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপোর কাঠিতে রাজকন্যার চোখে নেমেছিল ঘুম ;
সোনার কাঠিটা আজো জুটল না, কন্যা আজো নিঝুম।
মণি-মাণিক্য-মুক্তোয় গাঁথা
হাতীর দাঁতের পালঙ্ক পাতা,
হীরে-জহরত-চুনি-পান্নার সাজশয্যার ধুম—
ধনরত্নের স্নেহযত্নের আরামে ঘোচে না ঘুম।

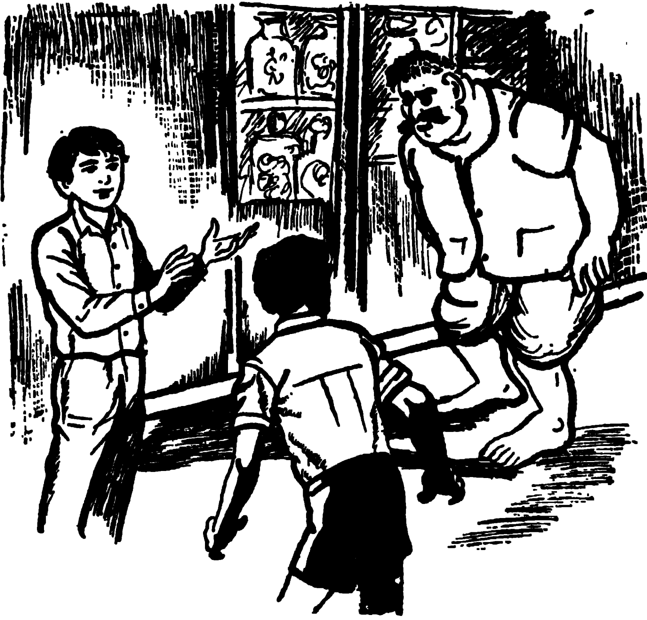
রাজকন্যাটি জাগলে কিন্তু মরা রাজ্যটা বাঁচে,
রাজপুত্রের সোনার কাঠিতে আজো জোর যাদু আছে।
অতএব, আজো খোঁড়া ঘোড়াটার
তাড়াতাড়ি ছোটা বড় দরকার,
বেঘোরে ঘুমোতে নাড়িটা না ছাড়ে, প্রেতাত্মা নাচে পাছে,
বড় প্রয়োজন রাজপুত্রের, রাজ্যটা যাতে বাঁচে।

আঁকিয়ে

শ্রী বারীন বসু

নাম তার হরিতোষ,
বাহাদুর পোটো,
যদিও বা বয়সেতে
নিদারুণ ছোটো!
ছায়াঘেরা উঠোনের
এককোণে বসে।
গাছ পালা নদী জল
এঁকে যায় কষে!

একটানা আঁকছেই,
মোটে নেই কমা
রং-তুলি নেই তবু
ছবি হয় জমা!
স্বপ্নালু দুই চোখে
ভাবখানা এই,—
ইচ্ছের বড় কোনো
শিক্ষক নেই।



কলকাতার 'নতুনদা'

শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সে অবশ্য হ'লও আজ অনেকদিনের কথা। ধরো ১৯১৮ সাল হবে, এখন থেকে প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগের ঘটনা।

আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি। কাশীতে দশাশ্বমেধ রোডের উপর এখন যেখানটায় বড় একটা কাটরা হয়েছে, ওপরে হোটেল—তখন সেইখানে পাশা-পাশি দুটো বড় লোহালক্কড় মানে তারের জাল পেরেক কড়া কোদাল ইত্যাদির দোকান ছিল, যতদূর মনে পড়ছে কব্জা ছিটকিনি ইত্যাদিও পাওয়া যেত। একটা ছিল ঘোষমশাইয়ের আর একটা মুখুজ্জেমশাইয়ের। তাঁর আসল নাম আর না-ই বললুম, ধরো দেবুদা।

দেবুদা ছিলেন বিশেষ মোটা, এতখানি লম্বা, তার উপযুক্ত ভুঁড়ি। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে মনে হত একটা পাহাড় উঁচু হয়ে আছে। আর শুয়েই থাকতেন সকাল-সন্ধ্যা। দোকানের সামনে একটু রক ছিল, তাতে মাদুর বা সতরঞ্চি পেতে তাকিয়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতেন সকাল-সন্ধ্যা, ভেতরে দোকান দেখত কর্মচারীরা। উনি স্রেফ শুয়ে শুয়ে তামাক খেতেন আর কাগজ পড়তেন। বিকেলের দিকে দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব আসতেন, কেউ ঐ রকেই, কেউ বা সামনের পেভমেণ্টে টুল কি লোহার চেয়ারে বসে আড্ডা দিতেন।

দেবুদা খুব সদালাপী মজলিসী লোক ছিলেন, তাছাড়া তামাকও খাওয়াতেন ভাল। এই দুটোর অভাব নেই বলেই বন্ধুদের টেনে আনত এবং অনেক রাত পর্যন্ত ধরে রাখত। তখন দোকান বন্ধ করার কোন আইন ছিল না। ওঁদের আড্ডার পাল্লায় পড়ে বেচারী কর্মচারীদের এক একদিন রাত সাড়ে নটা দশটা পর্যন্ত আটকে থাকতে হত।

দেবুদা খুবই মোটা ছিলেন, খোলা ফিটন কি ভিক্টোরিয়া ছাড়া উঠতে পারতেন না, নিজস্ব একটা ফিটন রেখেছিলেন সেই জন্যে—সাধারণ বগি-গাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব ছিল৷ তখনকার ট্যাকসীতেও ঢুকতে পারতেন কিনা সন্দেহ—কিন্তু তবু একটা ব্যায়াম তাঁর ছিল—সাঁতার কাটা। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতার শিক্ষক কালিদাস মানিক আর মান-মন্দিরের ঘাটের একটি খোঁড়া ডোম (ইনিও সাঁতার শেখাতেন, দুটো পা ছিল না, একটা ডোঙ্গা তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। তাতেই চড়ে একখানা খাটো দাঁড়ের সাহায্যে দ্রুত গঙ্গা বেয়ে যাতায়াত করতেন) ছাড়া আর কেউই তাঁর সঙ্গে সাঁতারে পাল্লা দিতে পারতেন না। অত মোটা মানুষ তো, তবু একবারও না থেমে বা দম না নিয়েই দুবার গঙ্গা পারাপার করতে পারতেন। বর্ষায় গঙ্গায় আর কেউ নামতে সাহস করতেন না কিন্তু দেবুদা একবার ঠিক ওপার থেকে ঘুরে আসতেন। গরমের সময় যখন গঙ্গা তপস্বিনী রূপ ধারণ করতেন, অর্থাৎ শীর্ণ হয়ে যেতেন তখন দুপুর বেলা মর্ণিং স্কুল ভাঙ্গা ছেলেরা কেউ কেউ তাঁর চওড়া পিঠে উঠে বসত তিনিও অবলীলাক্রমে চারজন পর্যন্ত—অবশ্য আকার ও বয়স বুঝে, পিঠে চাপিয়ে পারাপার করতেন। এতে তাঁর কষ্ট ছিল না বরং আমোদই পেতেন। এ জন্যে ছেলেরা তাঁর প্রতি খুব অনুরক্ত ও অনুগত ছিল।

কাশীর সবাই জানত তাঁকে। ছেলেদের তো কথাই নেই, ভালবাসত শ্রদ্ধাও করত। কিন্তু এসব কথা বাইরের লোকের জানার কথা নয়। কাশীতে অনবরতই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রীরা আসে, তখনও আসত। কলকাতা থেকে 'ড্যাঞ্চি' বাবুরা যেতেন সস্তার মাছ আর রাবড়ি খেতে। বড়-দিনের ছুটিতে তাঁদের ভীড়টা বেশী হ'ত—কারণ রামনগরের বেগুন আর কাশীর পেয়ারা অন্য আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হ'ত। (এখন মাছও আর সস্তা নেই, রাবড়ি অখাদ্য, বেগুনও আর অত বড় হয় না—তবু নামটা আছে।)

আমি যে ঘটনার কথা বলছি—সেও সেই ড্যাঞ্চি বাবুদেরই কথা। সেও

এক শীতকাল, বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় কোন কলেজ থেকে তিন-চারটি ছোকরা গেছে সস্তায় ভালভাল খেতে আর ফুর্তি করতে। তখন সাড়ে চার টাকার মতো গাড়ি ভাড়া ছিল হাওড়া থেকে কাশীর। দেড়টাকায় ভাল হোটেলে থাকা-খাওয়া চলত। যাত্রী-তোলা বাড়িতে দৈনিক চার আনাতে ঘর মিলত। এ ছেলে তিনটিও (কি চারটি ঠিক মনে নেই) কালীতলায় পেছনে একটা যাত্রী-তোলা বাড়িতে উঠেছিল, তবে রান্না-বাড়া করত না। এক বেলা হোটেলে খেত—দৈনিক পাঁচ আনা দিলে দই মিষ্টি সুদ্ধ ভাত মাথাপিছু পাওয়া যেত—আর একবেলা বিশ্বনাথের গলির অথবা কচুরী গলির বিখ্যাত কচুরী ও রাবড়ি খেয়ে কাটাত। এরা যাতায়াতের পথে দেবুদাকে বোধ হয় দেখেছিল, নিশ্চয় হাসাহাসিও করেছিল খুব কিন্তু আয়ত্তের মধ্যে হাতের কাছে পাবে তা ভাবেনি। দেবুদা প্রত্যহই শীত গ্রীষ্ম বেলা বারোটা সাড়ে বারোটায় চান করতে যেতেন। গরমের দিনে ঘণ্টা ছয়েকের কম জল থেকে উঠতেন না। শীতে অতটা থাকা যেত না, তবু আধ ঘণ্টা তো হ'তই। সেদিনও দৈবের খেলা—ছেলেগুলি অহল্যাবাঈ ঘাটের রাস্তায় বসে তেল মাখছে আর জলে নামবে কিনা ভাবছে—দেবুদা গিয়ে উপস্থিত। তখন বিন্দুমহারাজ বলে এক ঘাট-পাণ্ডা ছিলেন—ভারী জবরদস্ত মানুষ—তিনি থাকলে কেউ কোন বেয়াদপি করতে সাহস করত না—কিন্তু সেদিন তিনিও সকাল সকাল 'আস্নান পূজা' সারতে উঠে পড়েছেন। ঘাটও জনবিরল, একে প্রচণ্ড শীত তায় মেঘলা করে আছে—এ অবস্থায় গঙ্গায় চান করতে আসবে এমন পাগল আর ক'জন আছে। ঐ ছেলেগুলো এসেছিল তার কারণ ওদের সেই যাত্রীতোলা বাড়ির তেতলায় কলে জল যায় না, এতগুলো লোকের স্নানের জল রাখার মতো পাত্রও নেই ওদের কাছে।

ছেলেগুলো দেবুদাকে আসতে দেখে হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার করে উঠল—মজা করার একটা লোক এতক্ষণে পাওয়া গেছে এই আনন্দে।

আর সত্যিই—একে ঐ মোটা, তার খালি গা; বুক ও পেটের মাংস চলার ধাপে ধাপে থল থল ক'রে নাচছে; ডানদিকের ওপর-হাতে এতখানি একটা চওড়া কবচ, গায়ে চুপচুপে ক'রে তেল মাখা—

তামাশা করার মজা দেখবার মতোই চেহারা তাতে তো কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম দেখার উৎকট উল্লাসটা কেটে যেতেই নানারকম টিটকিরি শুরু হয়ে গেল।

একজন বললে, 'ওরে গজকচ্ছপ জানিস? পুরাণে আছে। বিরাট একটা হাতী আর বিরাট একটা কাচ্ছপে দশহাজার বছর ধরে লড়াই হয়েছিল। লড়াই করতে করতে কেমন তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেছে ছাখ—'

আর একজন বললে, 'এই হোঁদল কুৎকুৎ কোথায় পাওয়া যায় জানিস? আমার বড় শখ—একটা পুষব।'

তৃতীয়জন বললে, 'ধ্যুস। একেই জাম্বুমান। কেষ্ট এর মেয়েকেই বিয়ে করছিল।'

আরও অনেক কথা বলতে লাগল ওরা। আরও খারাপ খারাপ অপমানের কথা সব। দেবুদা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, কথাগুলো শুনতে পেলেন মনে হ'ল না তাঁর হাবভাব দেখে। যেমন ধীরেসুস্থে যাচ্ছিলেন তেমনিই এসে—শুকনো কাপড় আর জামা একটা কাঠের পাটায় রেখে যথারীতি আঙ্গুলে ক'রে একটু গঙ্গার জল তুলে মাথায় ছিটিয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগলেন জলে।

ছেলেগুলো যেন এইটেরই অপেক্ষা করছিল। তারাও সেই উঁচু পাথরের রানা থেকে ঝপাং ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়ল—দেবুদারই পাশে সামনে, ফলে চারদিক থেকে জল ছিটকে ওর নাকে কানে মুখে এসে লাগল।

চারদিক থেকে। তবুও কিছু বললেন না দেবুদা। শান্তভাবেই—যেন কিছুই হয় নি, আর কেউ নেই কোথাও—এইভাবেই গা রগড়ে চান করতে লাগলেন।

ছেলেগুলোও খুব 'জো' পেয়ে গেল যাকে বলে। তারা ভাবলে ওদের দল ভারী দেখে দেবুদা ভয় পেয়ে গেছেন। তারা ওকে 'মেড়োভূত' 'জংলী' 'হাতী' 'জলহস্তী' এই সব বলে মুখে যেমন টিটকিরি দিতে লাগল, তেমনি চারিদিক থেকে জল ছেটাতে লাগল যে, তাদের পায়ের জল ওঁর মুখের মধ্যে এসে পড়ল বার বার।

এইবার দেবুদা এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। অত বড় সত্যিকার হাতীর মতো মানুষটা যে অত চট্‌-পট্‌ হাত-পা নাড়তে পারেন তা কে জানত? তিনি গা রগড়ানো শেষ করে গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে খপ ক'রে দুটো ছেলেকে টেনে তাদের মাথা দুটো নিজের বগলে চেপে ধরলেন। তারপর আর একটা ছেলেকে এক লাথিতে ঠেলে অগাধ জলে ফেলে দিয়ে নিজে পায়েরই এক অদ্ভুত কসরতে তীরবেগে সাঁতরে নদীর মাঝামাঝি পৌঁছে গেলেন এবং সেখানেই স্থিরভাবে ভাসতে লাগলেন যেন কিছুই হয় নি।

হ্যাঁ, আরও একটা কাজ করেছিলেন। সেটা বলা হয় নি। ঐ ছেলেগুলো বিশেষ সাঁতার-টাতার জানত না। ঐ ছেলেটা অগাধ জলে এসে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। উনি যেত যেতে সেই অবস্থাতেই তার চুলের মুঠি ধরে ডুবে যাওয়াটা বন্ধ করলেন। তবে সেইভাবেই ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তাকেও। নাকানি-চোবানি খাওয়া যাকে বলে তা তো খেলই, যতটা পারল পারল হাত-পা ছুঁড়ে দেবুদার কবল থেকে মুক্ত হবারও চেষ্টা করল খানিকটা। কিন্তু দেবুদা নির্বিকার—যেন কোথাও কোন গোলমাল কি অসুবিধে নেই। বেশীক্ষণ যোঝবার ক্ষমতা ওদের অবশ্য ছিল না। সকলেই বেশ কয়েক ঢোক জল খেয়ে ফেলেছে—বিশেষ যার, হাতের কাছে ছিল তাদের অবস্থা তো শোচনীয়—তিনজনেই ক্রমশঃ নেতিয়ে পড়ল। যথেষ্ট জব্দ হয়েছে বুঝে বগলের তলা থেকে সে দু'জনকে মুক্তি দিয়ে তিনজনকেই চুলের মুঠি ধরে ভাসিয়ে রেখে দেবুদা আবার সাঁতরে তীরে এসে পৌছলেন। তারপর, সেখানে পাথরের সিঁড়ির ওপর তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'হয়েছে? সাধ মিটেছে মজা করার? যাও, এবার উঠে বাড়ি যাও।' তাদের আর বেশী বলতে হ'ল না। তারা তখন পালাতে পারলে বাঁচে—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা তাদের। ভয়ে বুক ঢপ-ঢপ করছে তখনও। দম বন্ধ হয়ে এসেছিল—তার জের চলছে—তারা কোনমতে সেই ভিজে কাপড়েই উঠে পালাল।

দেবুদা কিন্তু আর সেদিকে চেয়েও দেখলেন না। তিনি একগলা জলে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে গায়ত্রী জপতে শুরু করে দিলেন।

ছোট্ট জিজ্ঞাসা

শ্রী অলোককুমার সেন

ছোট্ট খোকা প্রশ্ন করে—মাগো,
চাঁদ কি শুধুই পাথর দিয়ে ভরা?
চাঁদের বুড়ী চরকা কাটে না?
মা হেসে কন—বোকা ছেলে ওরে,
চাঁদ মামা আর চাঁদের বুড়ী যে লুকিয়ে অন্তরে,
যায় কি তাদের চেনা।"

মানি

শ্রী কার্তিক ঘোষ

এইটুকুনি ছোট্ট মেয়ে, সবাই ডাকে মানি···
একটুতে সে কি খুশি হয়—কী হাসি মুখখানি !
পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে তার ওঠে সে কোন্ ভোরে,
ঠিক যেন এক গিন্নী সেজে লাল ডুরেটি পরে
আসবে ছুটে তোমার কাছে, যে কাজই দাও তুমি···
কাজ যেন তার খেলার সাথী—খেলারই ঝুমঝুমি !
তোমার টেবিল গুছিয়ে দেবে—সাজিয়ে দেবে ফুল,
ঘর নিকিয়ে আবার দেখো ঝেড়েও দেবে ঝুল !
বিছনা তোমার করতে হবে একটু বলো ওকে—
তোমার জামা ময়লা হলেই ঠিক পড়ে ওর চোখে।
বিষ্টি হলেই তুমি তো বেশ আরাম করো খেয়ে ·
ওদের ঘরে জল পড়ে ভাই টালির ফুটো বেয়ে !
ওদের ঘরের বিছনা মেঝেয়, কাঁথায় আঁকা দুখ··
তবু মানির কাজল চোখে রাণীর মতন সুখ !
ও খায় শুধু শুকনো রুটি কখন যে কি দিয়ে—
আমরা কি ভাই কেউ দেখেছি একটু কাছে গিয়ে ?
পূজোর জন্যে ওর জামাটি কিনেছি কম দামী···
অথচ সব ফালতু কাজে খাটাই ওকে আমি।
ওর জন্যে কখনো কেউ ফুল আনিনি কিনে ··
অথচ সব বকুল ঝরা—আলোয় ভরা দিনে—
রোজ দেখি ভাই ছোট্ট ঘরে দুঃখিনী সেই মানি,
ভালবাসার ফুল দিয়ে সে ভরেছে ফুলদানি ॥

চেষ্টায় কি না হয়

শ্রী হিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

হ'বে নাক এমন কাজ
নাই পৃথিবীতে।
আজ না হয় দু'দিন পরে
নিতে পারবে জিতে।
মনে প্রাণে করলে চেষ্টা,
সফল হ'বে সে কাজ শেষটা ॥



লাল সবুজ

শ্রী ইন্দিরা দেবী

এই সেই মহাপ্রস্থানের পথ ধরে চলেছি আমরা।—বলেছিলেন স্বামী অসিতানন্দজী!

চোখ তুলে তাকালো কিশোর। আজ ক'দিন ধরে চলেছে তাদের পথচলা। সবার কাছে সে শুনেছিল আর বইতেও পড়েছিল উত্তরাখণ্ডের দৃশ্যের তুলনা নেই। আজ পথ চলতে চলতে সে-কথা কত খাঁটি তাই মনে হচ্ছিল। দু'পাশে আকাশছোঁয়া পাহাড়ের দেওয়াল, তারই একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী-ধারা। আর একপাশে এঁকে-বেঁকে যাওয়া পায়ে-চলা সরু পথ, অচল অনড় পাহাড়—কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মেঘ ও রৌদ্রের ছোঁয়া লেগে তার চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। গিরি-গোবর্ধনের দেশের মানুষ কিশোর—বিরাট বিশাল পাহাড় দেখতে দেখতে তার মনে জেগেছে বিরাটত্বের ছোঁয়া। বহু শতাব্দী আর যুগ পেরিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে পাণ্ডবদের সেই পাঁচ ভাই আর সঙ্গে দ্রৌপদী—তারই ছবি।

এমনি সময় কানে ভেসে এলো স্বামীজীর কথা। দেরাদুনে তাঁর সঙ্গে পরিচয়—নিছক বেড়াবার ঝোঁক নিয়ে কিশোর বেরিয়ে পড়েছিল এ হিমালয়-ভূমির উদ্দেশে।

শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে দেরাদুনের রাজপুর রোডের ধারে ঝক্‌ঝকে সাদা রঙের বাড়ি। দূর থেকে দেখেই মনে হয় জনতার কোলাহল থেকে

বাঁচবার আর গভীরভাবে নিজের মনের সঙ্গে কথা বলার এর চেয়ে ভালো পরিবেশ আর কিছু হতে পারে না। সেই আশ্রমে পরিচয় ঘটলো স্বামীজীর সঙ্গে। কিশোর দেবভূমি পরিক্রমা করবে জেনে স্বামীজীও তার সঙ্গী হলেন। সাধারণ যাত্রীরা রেলে চড়ে বাসে চেপে যেভাবে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে, এঁরা তাতে রাজী নন। তাই আগাগোড়া শুরু থেকে শেষ অবধি এঁরা চলবেন পায়ে হেঁটে।

দেহ যদিও বা ক্লান্ত হয়, মন ক্লান্তি মানে না। চোখের সামনে প্রতি বাঁক নিয়ে আসে অদেখা রূপের ভাণ্ডার। দেখতে দেখতে চোখ তৃপ্ত হয় না। কিশোরের মনে হয়, এ-চলার বিরাম না ঘটলেই যেন ভালো হয়।

স্বামীজীর বয়স হয়েছে কিন্তু তাঁর উৎসাহ যুবককেও হার মানায়। অনেকক্ষণ চলার পর দু'দণ্ড বিশ্রাম নেবার সময় তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা কিশোরকে বলেন। সেদিন কিন্তু পথ চলতে চলতেই বললেন: কিশোর, আমরা এবার ডানদিকের রাস্তা ধরবো। একটু কষ্ট হবে তোমার, কিন্তু তা হোক—

কিশোরের কিছুমাত্র আপত্তি নেই! অভ্যস্ত পথ ছেড়ে ডানদিকে মোড় নিলেন। দুর্গম পথ, মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের ঝোপ। বহুকাল এ-পথ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করেছে, তার এতটুকু আভাস মেলে না। অনেকখানি চড়াই পেরিয়ে দেখা গেল, খোলা প্রান্তর সবটাই পাথরে ঢাকা—তারই মাঝখানে কচি কচি সবুজ পাতা নিয়ে ছোট্ট একটি নাম-না-জানা গাছ। চারিদিকের রুক্ষতার সঙ্গে যেন বেমানান সবুজ। তখনও রৌদ্রের প্রখরতা লাগে নি, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। স্বামীজী বললেন: একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক—আর সেই অবসরে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে আর একটি কাহিনী তোমাকে উপহার দিই।

স্বামীজীর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে কিশোরের খুব ভালো লাগে, তাই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লো।

স্বামীজী শুরু করলেন: মাত্র ছ'মাস আগের কথা, তুমি তো জানো আমি প্রতি বছর বেরিয়ে পড়ি—হিমালয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করার জন্য। তখন শীতকাল, বরফ পড়তে সুরু করেছে, তারপর লড়াই চলেছে সীমান্তে, কাজেই দীর্ঘ পথযাত্রায় কারুর সাক্ষাত পেলাম না। মাথার উপর দিয়ে ভেসে আসে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাওয়া জঙ্গী বিমানের গর্জন। তুমি তো জানো

কিশোর, আমি এক পথে দু'বার চলি না পারতপক্ষে, তাই সেদিন চলতে চলতে দূর থেকে নজরে পড়লো একটা অভাবনীয় দৃশ্য—চারিদিক জমাট বরফের সমুদ্র, তার মাঝখানে একটা খাকি পোষাক-ঢাকা মূর্তি। লাঠি ঠুকে ঠুকে সন্তর্পণে এগোচ্ছিলাম, ঐ দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম। কাছে এসে দেখি জঙ্গী মানুষের মৃতদেহ। আর একটু দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম, উড়োজাহাজের ভাঙ্গা টুকরো। বুঝলাম, যে আকাশ বিধাতার আশীর্বাদ হয়ে ছড়িয়ে দেয় সূর্যের আলোক, যার ছোঁয়া জাগায় জীবনের রস—সেই আকাশের বুকেই ঘটেছে ওই সামরিক পুরুষের জীবনের পরিসমাপ্তি। এও বুঝলাম যে, এখানে সন্ধানীর দল পৌঁছতে বিলম্ব হবে, তাই দু'হাতে বরফ সরিয়ে দেহটি ঢেকে দিলাম বরফের তলায়, শীতল দেহ শীতলতর বরফে ঢাকা পড়ে গেল। যতক্ষণ দেহটি পরীক্ষা করছিলাম ততক্ষণ কোনো ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাইনি—শুধু মুখের দু'পাশ থেকে বেরিয়েছিল এক ঝলক টাটকা লাল রক্ত। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে, তারপর চোখে পড়লো রক্তস্নাত বরফের চাঁইয়ের পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছিল একটি ছোট্ট চারা—এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম বিধাতাপুরুষের বিচিত্র লীলা-বিলাস। লাল যেখানে এঁকে দিল জীবনের শেষ ফুরিয়ে যাওয়া, তারই পাশে সবুজ নিয়ে এলো নতুন জীবনের জয়বার্তা। সেদিনকার সেই চারাটি আজ দেখতে পাচ্ছ চোখের সামনে—সবুজে সবুজে ঢেকে গিয়েছে এর ছোট্ট ডালগুলো। পাতার কুঁড়িগুলো নিঃশেষে টেনে নিচ্ছে সূর্যের আলো, জীবনের রস, ঘোষণা করছে জীবনের জয়। মৃত্যুর পরপারে জীবনের সুরু, এই নিয়ে চলেছে মহাকালের আবর্ত। সেকথাটি জানাবার জন্য আজ পথ ছেড়ে তোমায় নিয়ে এসেছি এই বিপথে।

কিশোর বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্রীরামপুরের বুড়ো মানুষ

শ্রী নচিকেতা ভরদ্বাজ

শ্রীরামপুরে থাকত একটি বুড়ো মানুষ
বেজায় গরীব
থাকত না তার একটি পয়সা হাতে।
অথচ তার থাকত না কো হুশ
পেঁয়াজ এবং মধু কিনেই
হয়তো কখন তাতে
সকল পয়সা খরচ হত তার
খেয়ালী সেই বুড়ো লোকটি
শ্রীরামপুরে বাড়ী ছিল যার।

ন্যাড়া ও বেলতলা

শ্রী বীরু চট্টোপাধ্যায়

শোনরে ন্যাড়া, বেলতলাতে যাসনে ওরে যাসনে।
ন্যাড়া মাথা বেলের ঘায়ে বারোটা বাজাসনে।
যেতে পারিস বেলঘরিয়া অথবা বেলগ্রেডেতে
বেলডাঙা কি বেলউচিস্থান নবাববাড়ির গেট-এতে,
আয়ারল্যাণ্ডে যেতে পারিস বেলফাস্টেতে যাবি না
পেটের ব্যামো হলে পরেও বেল-পোড়াটি খাবি না।
বেলভেডিয়ার পাঠাগারে ইচ্ছে যদি পড়তে যা—
ডামবেল আর গদা নিয়ে ব্যায়াম কিছু করতে যা।
বেলেঘাটা বেলগাছিয়া যেথায় খুশী বাঁধবি ঘর
পর্টুগীজের সাথে গিয়ে বেলগাঁওতে লড়াই কর।
বেলেল্লাও সইবে যে তোর, 'বেল'-বাজানো সইবে না।
ক্যামবেলেতে গেলে পরে প্রাণ-পাখী আর রইবে না।
দোহাই তোরে জ্বর হলেও বেলেডোনা খাসনে
ন্যাড়া মাথা বেলের ঘায়ে বারোটা বাজাসনে।
'বেল পাকিলে কাকের কি!' ওসব কথা শুনবি না।
বেলচে দিয়ে কক্ষণো তুই কোন জিনিষ তুলবি না,
'বেলসেজারের স্বপ্ন' আর 'বেল-এলেটার' পড়িসনে
বেলেমাটির পুতুল-টুতুল জীবন থাকতে গড়িসনে।
এলে-বেলে কাজের পিছে অযথা আর যাসনে,
ন্যাড়া মাথা বেলের ঘায়ে বারোটা বাজাসনে।

শ্রী চণ্ডী সেনগুপ্ত

আই কাম। ভাই কাম
দাদা কিন্তু—'গো'
কবে ফিরে আসবে দাদা
"আই ডোণ্ট নো" !!

এখন দাদা অনেক দূরে
জাম্বো জেটে পাড়ি
আমার জন্যে আনবে টফি
ভায়ের জন্যে গাড়ি ॥



রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ

শ্রী প্রভাসরঞ্জন দে

অনেক দিন আগের কথা। শহরের কাছেই ছিল মস্ত এক পাহাড়। সেই পাহাড়ে ছিল পরীর দেশ। সেখানে বাস করত এক বুড়ো, সে প্রায়ই শহরে যেত আর নিয়ে আসত নানা রকমের খবর। বুড়োর বাড়ীর সামনেই ছিল একটা বড় ঘণ্টা। শহর থেকে ফিরে এসে সে সেই ঘণ্টা বাজাত আর সঙ্গে সঙ্গে পরীরা সেখানে এসে সেদিনের খবর জেনে নিত।

একদিন খুব ভোরে, তখনও পরীদের সবার ঘুম ভাঙ্গে নি, ঘণ্টা বেজে উঠল। পরীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তারা ছুটে এল বুড়োর বাড়ীতে, জানতে চাইল কি খবর।

বুড়ো যখন দেখল সবাই এসেছে তখন বলল—"আগামী কাল শহরের রাজপ্রাসাদে এক বিরাট ভোজসভা হবে। সেই ভোজসভায় যাবার জন্য রাজা সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ওখানে যাকে রাজকুমার পছন্দ করবে, তার সঙ্গে রাজা রাজকুমারের বিয়ে দিবেন।"

পরীরা খবর শুনে খুশী। সবাই ভাবতে লাগল কোন্ পোষাকটি পরে গেলে আরো সুন্দর দেখাবে। কেউ কেউ আবার নূতন পোষাক তৈরী করতে দিল। দর্জিদের ত কথাই নেই, রাত জেগে তৈরী করতে লাগল নূতন নূতন পোষাক, নানা রকমের ফুল দিয়ে তৈরী হতে লাগল সুন্দর সুন্দর ওড়না।

পরীর দেশের এক কোণে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে বাস করত লিলি নামে একটি পরী। সে ছিল খুব সুন্দরী। আর সব পরী তার কাছ থেকে সরে যেত, হিংসেতে কেউ তার সঙ্গে কথা বলত না। সে তার বাবার সঙ্গে মাঠে যেত আর সারাদিন মাঠে কাজ করে রাতে বাড়ী ফিরত।

রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণের কথা লিলি শুনেছিল। কিন্তু রাজবাড়ীতে যাবার কথা সে ভাবতেও পারে না। রাজবাড়ীতে যেতে হলে যে পোষাক চাই, সেই পোষাক সে কোথায় পাবে—সে যে খুব গরীব।

সেদিন বিকেলে সে বাড়ী ফিরছিল। একটা গাছের নীচ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেল কে যেন বলছে—"লিলি, দয়া করে আমাকে নীচে নামিয়ে দেবে?"

লিলি চারিদিকে তাকাতে লাগল, কোথাও কিছু দেখতে পেল না। হঠাৎ দেখলে গাছের ডালে ঝুলছে পরীর দেশের এক দর্জি। তার পা গাছের ডালে আর মাথাটা ঝুলছে নীচের দিকে।

লিলির মনে খুব কষ্ট হল, সে গাছে উঠে দর্জিকে নীচে নামিয়ে দিল।

লিলি দর্জিকে জিজ্ঞাসা করল—"তোমার এমন হল কেন?"

দর্জি বলল—"আজ রাজপ্রাসাদে পরীদের নিমন্ত্রণ সে কথা তুমি জান?"

"হ্যাঁ, আমি শুনেছি।"

"উমাকে তুমি চেন তো?"

"চিনব না কেন?"

"সেই উমা আমাকে একটা পোষাক তৈরী করে দিতে বলেছিল। গোলাপ ফুল দিয়ে একটা ওড়না তৈরী করার জন্য গোলাপ ফুল আনতে বাগানে গিয়েছিলাম। ফিরতে অনেক দেরী হয়ে গেল। দোকানে ফিরে শুনলুম উমা দোকানে এসেছিল কিন্তু আমার দেখা না পেয়ে রেগে গিয়েছে, অপর একজনকে পোষাক তৈরী করতে দিয়েছে?"

"তারপর—"

"তারপর উমা যখন দেখল আমি দোকানে বসে রয়েছি তখন আমাকে জোর করে ধরে এনে গাছে ঝুলিয়ে দিল। তবে সত্যি কথা বলতে কি এর জন্য আমার মনে কোন দুঃখ নেই।"

"বিনা অপরাধে শাস্তি পেলে তার জন্য মনে দুঃখ নেই!"

"আমার শুধু দুঃখ, কষ্ট করে আমি যে পোষাকটি তৈরী করলুম সেটি পরে কেউ রাজপ্রাসাদে যাবে না।"

"সে দুঃখ করে কি আর হবে! তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু আমি কি আর করতে পারি?"

"তুমি যদি রাজপ্রাসাদে যাও—"

"আমি! আমার কাছে ত টাকা নেই। তোমার পোষাকটির যে অনেক দাম হবে।"

"দামের জন্য ভাবনা কিসের? তোমার কাছ থেকে কোন দাম আমি চাই না।"

এই কথা শুনে লিলি দর্জিকে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে। বাবা শুনে খুব খুশী। মেয়ে রাজপ্রাসাদে যাবে—কত আনন্দের কথা!

তখন দর্জি লিলিকে নিয়ে তার দোকানে গেল। আকাশি রঙের সুন্দর পোষাকটি পরতে দিল। সুন্দরী লিলিকে আরো সুন্দর দেখাতে লাগল। দর্জির বউ রেশমের ফিতে দিয়ে লিলির চুল বেঁধে দিল, এনে দিল মণিমুক্তো লাগান একজোড়া জুতো। সবার শেষে গোলাপ ফুল দিয়ে তৈরী করা ওড়নাটি গায়ে দিল। তখন তাকে দেখলে চোখ ঝল্‌সে যায়।

দর্জি লিলিকে শহরে নিয়ে গেল, রাজপ্রাসাদের ফটক পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এল। বাড়ীতে লিলিকে দেখে পরীরা অবাক্ হয়ে গেল। সবার মুখে এক কথা—"যার দু'বেলা খাবার জোটে না সে এত দামী পোষাক পেল কোথা থেকে।"

তারপর—। রাজপুত্র ত এল—কাউকেই তার পছন্দ হয় না। হঠাৎ দেখতে পেল ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবার চেয়ে সুন্দরী পরী—লিলি। লিলির হাত ধরে রাজপুত্র রাজার কাছে গিয়ে বলল—"বাবা এই হবে আমার রাণী।"

অপর পরীরা মনের দুঃখে রাজবাড়ী থেকে একে একে চলে গেল। উমা বাড়ী এসে যখন শুনতে পেল লিলির সেই সুন্দর পোষাকটি তারই দর্জি তৈরী করে দিয়েছে, তখন তার মনে দুঃখ হতে লাগল।

রাজকুমারের সঙ্গে লিলির বিয়ে হয়ে গেল। তারা সুখে শান্তিতে সংসার করতে লাগল।

কু-ঝিক-ঝিক রেলের গাড়ী

শ্রী উৎপল হোম রায়

কু-ঝিক-ঝিক রেলের গাড়ী
এক দুই তিন নাম্‌তা—
ছাড়লো গাড়ী লাইন গিয়েছে
হাওড়া থেকে আমতা।
ছুটছে গাড়ী তাড়াতাড়ি
বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে
থামিয়ে গাড়ী গার্ড সাহেব
ছেলে বুড়োয় নিচ্ছে।

ছবির মতো যাচ্ছে সরে
তাল সুপুরির বাগটা
তাই না দেখে পাখির মতো
নাচছে নূপুর মনটা।
এমনি করে খেল্‌না গাড়ী
মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে
খেল্‌না গাড়ী চেপে নূপুর
দেদার মজা লুটছে।

চড়চড়ি

শ্রী নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

কটক থেকে ঘটক ঠাকুর এলেন ঘরে রাঁধতে—
খুব সকালে হেদোর ধারে যান যে গলা সাধতে।
'হৈ রামা হৈ' ভজন সেরে করতে বসেন রান্না,
রবিবারে মাছ-মাংস তিনি কভু খান্ না।
নিরামিষি রান্না হবে আজকে রবিবার যে,
পটল চিরে কোর্মা রাঁধার—যোগাড় করে তার সে।
যোগাড় হলে কোর্মা রাঁধার রান্না স্থরু করলে
প্রাতের ভজন হয় নি বলে আনন্দে গান ধরলে!
'হৈ রামা হৈ' রাগিণী—খেয়াল খুসী ছাড়লো,
পঞ্চমে তার উঠলো গলা—সপ্তমে তা বাড়লো।
কোর্মা তখন চড়চড়িয়ে জল শুকিয়ে পুড়ছে,
কর্তা এসে দেখে ঠাকুর তখনও গান জুড়ছে।
জোর গলাতে ডাকতে তখন—চক্ষু তাহার খুললো,
কোর্মা তখন চড়চড়ি যে—গাঁট্টা খেয়ে বুঝলো।

পিণ্টু

শ্রী অদ্বৈত মল্লিক

দুষ্টুমিতে এক নম্বর
আমার বাড়ীর পিণ্টু
এটা ভাঙ্গে, ওটা রাখে
কিছুই নাই কিন্তু

যখন যেটা দেখবে চোখে
সেটাই হবে চোখের আড়াল
পুকুরেতে ফেলবে বলে
হাতিয়ে নিল চোবের জাল
চোবের কথায় বাবা যখন—
ধরল কষে দুটি কান
রেগে আগুন পিণ্টু তখন
মনে মনে ভাঁজলো তান।

দুপুর বেলায় সবাই যখন
ঘুমিয়েছিল যে যার ঘরে
কাঁচি হাতে পিণ্টু তখন
ঘুরছে ফিরে চোবের তরে।
চোবের ঘরে পিণ্টু ঢোকে
আস্তে পায়ে চুপটি করে
সন্তর্পণে মুড়িয়ে দিল
চোবের টিকি কচাৎ করে।



ব্যোমব্রহ্মবাবু ও তরমুজ

শ্রী অজিতকৃষ্ণ বসু

আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার ব্যোমব্রহ্ম বটব্যাল ছিলেন ভীষণ দাপটী মানুষ, লোকে বলত মানুষ তো নয় বাঘ।

একবার তিনি বাজারে গেলেন শখ করে, হাতে একটি ঝুড়ি, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, গায়ে ফতুয়া। ঐ ঝুড়ি নিয়ে ভৃত্য কেনারাম সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, তাকে ধমক দিয়ে বাড়ীতে রেখে এসেছেন।

আলু পটল বেগুন মাছ মাংস কিচ্ছু কিনবেন না, কিনবেন শুধু ফল। গত রাত্রে একটি মাসিক পত্রিকায় 'স্বাস্থ্য ও স্বভাবের উপর ফল আহারের প্রভাব' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ে তিনি অভিভূত এবং অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ফলের প্রতি তাঁর কোনোদিন আসক্তি ছিল না; ভক্ত ছিলেন তিনি মাছ-মাংস-ডিমের। ফল খাওয়াটা যে জীবনে কত বড় জিনিস, এ বিষয়ে তিনি কখনো ভেবে দেখেন নি। লেখক ভদ্রলোক তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছিলেন: "ফল আহারে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, রসনা তৃপ্ত হয়, রক্ত নির্মল হয়, দেহমন স্নিগ্ধ হয়, শক্তি ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়, ব্যাধির প্রকোপ কমিয়া যায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। বিভিন্ন মরশুম, আর্থিক সামর্থ্য, রুচি প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফল খাওয়া যাইতে পারে, যথা আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল, খেজুর, পেঁপে, কমলালেবু, আপেল, নাসপাতি, আনারস, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি।"

ইত্যাদি-র ঠিক আগেই তরমুজ, তাই তরমুজ নামটা মনে গেঁথে গিয়েছিল ব্যোমব্রহ্মবাবুর। প্রবন্ধের শেষ দিকে লেখক লিখেছিলেল, "ফল যথাসম্ভব টাট্‌কা কিনিবেন এবং টাট্‌কা আহার করিবেন। অনেকে রেফ্রিজেটারের ভিতরে ফল জিয়াইয়া রাখেন, কিন্তু ঐরূপ জিয়াইয়া রাখা ফলের চাইতে টাটকা ফলের পুষ্টিকারিতা অনেক বেশী। যে ফল গাছে থাকিতে থাকতেই পাকিয়াছে, তাহার তুলনা নাই; সেরূপ 'আসল পাকা' ফল পাইলে 'নকল পাকা' অর্থাৎ কৃত্রিম রূপে পাকানো ফল খাইবেন না।"

বাজারে ঢুকেই ব্যোমব্রহ্মবাবু চলে গেলেন যেদিকে সারি সারি ফলের দোকান। দেখলেন দোকানগুলো ছাড়িয়ে এক জায়গায় গ্রামাঞ্চল থেকে আসা এক তরমুজওয়ালা সামনে ছোট, মাঝারি আর বড় নানা সাইজের তরমুজ

ছড়িয়ে বসে আছে। লোকটা শিখে ফেলেছে মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাকাটা বিক্রির ভালো উপায় নয়, তাই মুখে মুখে সুর ক'রে আওড়াচ্ছে তরমুজী ছড়া :

"লে যান বাবু ফলের রাজা।
খেলে পরে পাবেন মজা।
ফলের নাম তরমুজ,
ভেতরে লাল, বাইরে সবুজ।
কোথায় লাগে মাখন-ছানা ?
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।
যেমন মিঠা, তেমনি নরম,
হবেন ঠাণ্ডা, যাবে গরম।"

তরমুজওয়ালার ছড়া-গান শুনে ঐ দিকেই আকৃষ্ট হয়ে চলে গেলেন ব্যোমব্রহ্মবাবু। ভাবলেন অন্য সব ফল তো আর এক্ষুণি হুড়হুড় করে পালিয়ে যাচ্ছে না, প্রথমে তরমুজ দিয়ে শুরু করলে ক্ষতি কি ? তরমুজওয়ালার সামনে গিয়ে শুধালেন, "কি দাম তরমুজের ?" তরমুজওয়ালা বলল, "কোন্‌টা লেবেন বেছে ল্যান আগে, তবে তো দাম বলব।"

শুনে প্রথমটা চটে উঠলেন ব্যোমব্রহ্মবাবু। এরকম সুরে কথা শুনতে তিনি অভ্যস্ত নন। তাঁর মনে হল লোকটা বুঝি ইঙ্গিতে তাঁকে বোকা বলছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখলেন লোকটা ঠিকই বলেছে, ছোট বড় সব তরমুজের তো আর একই দাম হতে পারে না। তাঁর নিজেরই এটা বোঝা উচিত ছিল। তারপর ভাবলেন ওর ওপর চটবার তাঁর কি অধিকার আছে ? তিনি স্বাধীন ভারতের নাগরিক, তরমুজওয়ালাও তাই। অবশ্য তিনি এম-এ, বি-টি পাশ, আর তরমুজওয়ালার হয়তো পাঠশালার বিদ্যেও নেই ; কিন্তু তরমুজওয়ালা স্বাধীন ব্যবসা করছে, আর তিনি ডাকসাইটে দাপটী হেডমাস্টার হলেও চাকুরে, অর্থাৎ এক হিসেবে গোলাম, স্কুলের সেক্রেটারি হারাণবাবুর মত না নিয়ে স্কুল সম্বন্ধে কোন রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এই তরমুজওয়ালা কারো হুকুমের চাকর নয়, কারো মতামতের ধার ধারে না। নিজের ইচ্ছে আর সুবিধে মতো তরমুজ বিক্রি করে। অতএব এই তরমুজ-ওয়ালাকে অমর্যাদা বা তুচ্ছ করার কোন অধিকার তাঁর নেই। স্কুলে তিনি ছেলেদের প্রবন্ধ লিখিয়েছেন 'শ্রমের মর্যাদা' সম্বন্ধে। তাই ভাবলেন এই তরমুজ-ওয়ালাকে যদি তার শ্রমের মর্যাদা না দিই, যদি ছোটলোক ভেবে তাকে তুই-

তুমি করি, তাহলে আমার মতো ভণ্ড, কপটাচারী কে ? একে শ্রমের মর্যাদা দিয়ে 'আপনি' বলাই আমার কর্তব্য। মনে মনে এই রকম ভেবে একটা বেশ বড় সাইজের তরমুজ পছন্দ করলেন ব্যোমব্রহ্মবাবু।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে পড়ে গেল মাসিক পত্রিকায় পড়া প্রবন্ধের সেই অংশটি: "অনেকে রেফ্রিজেটারের ভিতরে ফল জিয়াইয়া রাখেন। কিন্তু ঐরূপ জিয়াইয়া রাখা ফলের চাইতে টাট্‌কা ফলের পুষ্টিকারিতা অনেক বেশী।"

ব্যোমব্রহ্মবাবু বললেন, "দেখুন, আপনার এই তরমুজগুলো যথাসম্ভব টাট্‌কা তো ? মানে, রেফ্রিজেটারে জিইয়ে রাখা নয় তো?" তরমুজওয়ালা বাজারের খদ্দেরদের মুখে তুমি আর তুই সম্বোধন শুনেই অভ্যস্ত, 'আপনি' শুনে সে প্রথমটা বেশ হক্‌চকিযে গেল। তারপরই ভেবে নিল ব্যোমব্রহ্মবাবু তেমন সম্ভ্রান্ত পর্যায়ের লোক নন, প্রায় তারই সমান পর্যায়ের, তা না হলে তাকে 'আপনি' বলছেন কেন ? সে একটু তাচ্ছিল্যভরেই বলল, "না গো মশায়। তরমুজ কি কই মাছ না মাগুর, যে জিইয়ে রাখব ? আর ওসব ফেজিটর মেজিটর আমি বুঝিনে বাপু।"

বাঘা হেডমাস্টার বৈষ্ণব বিনয় ভুলে আবার চটে উঠলেন। লোকটার বে-আদবী তো কম নয়, তরমুজ যে কই বা মাগুর মাছ নয় সে কথা তাকে বোঝাতে চাইছে! আবার শ্রমের মর্যাদার কথা ভেবে মেজাজটা সামলে নিয়ে বললেন, "ফেজিটার নয়, রেফ্রিজেটার। এ হলো এক রকমের আলমারি। ভেতরটা ঠাণ্ডা রেখে এই আলমারির ভেতর—"

তরমুজওয়ালা বলল, "না গো মশায়। আলমারির ভেতর আমি তরমুজ রাখি নে। মাথা তো আমার খারাপ হয় নি।" বলে এমন ভাব দেখাল যেন ব্যোমব্রহ্মবাবুরই মাথা খারাপ হয়েছে।

ব্যোমব্রহ্মবাবু আবার চটে আবার সামলে নিলেন। ভেবে দেখলেন দোষটা তাঁরই; রেফ্রিজেটারের দাম অন্ততঃ হাজার খানেক টাকা, তরমুজ-ওয়ালা অত টাকা দিয়ে ও জিনিস কিনবে কি করে ? নিজের ভুল শুধরে নিয়ে তিনি বললেন, "তবে কি এ তরমুজ কোল্ড স্টোরেজের ? যাকে বলে ঠাণ্ডা-গুদোম ?"

তরমুজওয়ালা একটু অধৈর্য হয়েই বলে উঠলো, "কি যে বলেন মশায়, তরমুজ কি আলু না ডিম যে ঠাণ্ডা ঘরে থাকবে ? ক্ষেতের তরমুজ জলজ্যান্ত তুলে আনা, বলে কিনা ফেজিটার, ঠাণ্ডা গুদোম, হ্যানো, ত্যানো।"

ব্যোমব্রহ্মবাবু আবার মেজাজ সামলে নিয়ে তাঁর পছন্দ করা তরমুজটি দেখিয়ে বললেন : "এটির দাম কত নেবেন ?"

"এক টাকা।"

ব্যোমব্রহ্মবাবুর মনে পড়ে গেল তাঁর সামনে এক ভদ্রলোক এক চীনাম্যান ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তিনগজ কাপড় কিনেছিলেন। ফেরিওয়ালা দর হেঁকেছিল ছ'টাকা গজ, ভদ্রলোক বলেছিলেন দু'টাকা। শুনে চমকে উঠে ব্যোমব্রহ্মবাবু ভেবেছিলেন ফেরিওয়ালা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে। কিন্তু না, সে পাঁচ টাকায় নামল, তারপর চার টাকায়, তারপর তিন এবং আড়াই টাকায় এবং শেষ পর্যন্ত ঐ দু'টাকা দরেই কাপড় বেচে গেল। সেই থেকে ব্যোমব্রহ্মবাবু বুঝে নিয়েছেন বিক্রেতা যে দাম চাইবে, ক্রেতা বলবে তার তিন ভাগের এক ভাগ। এক টাকাকে তিন দিয়ে ভাগ করে ব্যোমব্রহ্মবাবু দেখলেন তাতে ভগ্নাংশ হয়। তার সঙ্গে কিছু যোগ দিয়ে তিনি বললেন, "ছ'আনা পয়সা দেব।" বলে তরমুজটার দিকে হাত বাড়ালেন।

তরমুজওয়ালা ব্যোমব্রহ্মবাবুর দিকে দু'হাত নাড়িয়ে দিয়ে বলল, "যাও যাও মশায়, তোমার আর তরমুজ খেয়ে কাজ নেই।"

এতক্ষণের পর পর জমানো রাগ এবার একসঙ্গে ফেটে পড়ল ব্যোমব্রহ্মবাবুর। তিনি বললেন, "তাই নাকি ? তবে আপনিই খান।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতে তরমুজটা তুলে নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ছুঁড়ে মারলেন তরমুজওয়ালার মাথায়। ডন কুস্তি করা শক্ত জোয়ান ব্যোমব্রহ্মবাবু, তার ওপর ক্ষেপে গেছেন। তাঁর হাতের তরমুজী মারের ধাক্কা সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল তরমুজওয়ালা, আর তরমুজটাও ফেটে গিয়ে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল। ব্যোমব্রহ্মবাবু তখন রেগে টং, শুরু হয়েছে তাঁর বাঘা হেডমাস্টারী মেজাজ। ভিড়ের ভেতর অনেকেই চেনেন, সমীহ করেন, ভালোও বাসেন বোমব্রহ্মবাবুকে। তাঁরা তরমুজওয়ালাকে ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন, "তোমার [illegible] তো কম নয় হে বাপু! কাকে কি বলতে গেছ ? মানুষ চেনো না তুমি ?"

ব্যোমব্রহ্মবাবু যে তার সম পর্যায়ের লোক নন, সেটা এবার বুঝতে পেরে তরমুজওয়ালা মাথার ব্যথা আর তরমুজের শোক ভুলে গিয়ে ব্যোমব্রহ্মবাবুর পায়ে হাত দিয়ে মাফ চাইতে লাগল।

নিজের হঠাৎ রাগের জন্য অনুতপ্ত ব্যোমব্রহ্মবাবু ক্ষমায় গলে জল হয়ে

বললেন, "অপরাধ তোমার নয় হে বাপু, অপরাধ আমারই। কথায় বলে ক্রোধ চণ্ডাল। সেই চণ্ডালের পাল্লায় পড়েছিলাম আমি। কিছু মনে কোরো না। আমায় তুমি ক্ষমা করো। এই নাও।"

বলে জোর করেই দুটি টাকা গুঁজে দিলেন তরমুজওয়ালার হাতে—এক টাকা তরমুজের দাম, আরেক টাকা ওর মাথায় যে তরমুজ ফাটিয়েছিলেম তার দাম।

ছুটির চিঠি

শ্রী শান্তশীল দাশ

সাদা সাদা মেঘগুলো আকাশেতে ভাসছে,
কোথা থেকে দলে দলে উড়ে উড়ে আসছে!
নীল আকাশের গায়ে ডানাগুলো মেলছে,
খুশি মতো এলোমেলো কত খেলা খেলছে—
কী ভালো যে লাগছে!
আকাশের পানে চেয়ে মনে শুধু জাগছে:
পেয়েছে ছুটির চিঠি ওরা বুঝি, তাই আজ
খেলা করে খুশি খুশি, হাতে নেই কোন কাজ।

কোথা থেকে এই চিঠি পেল তারা, দিলো কে?
কে যেন জানালো কানে: শরৎ ওই এলো যে।
সেই চিঠি পেয়ে তারা কী যে খুশি! চারিধার
ঘুরে ফেরে এলোমেলো আকাশেতে কী বাহার!
কত ছবি দিনে রাতে আঁকে ওই নীলিমায়
সাদা সাদা মেঘগুলো—কত, সে কি গোনা যায়!
সে-ছবির শেষ নেই;
খেয়ালী আপন মনে আঁকছে তো আঁকছেই

খাই খাই ছড়া

শ্রী সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

দিনরাত ভেবে ভেবে মশগুল ভাই রে,
ছনিয়াটা কেন করে শুধু খাই খাই রে।
সাহারার মরুভূমি নয় কামস্কাটকা,
যেখানেই মারো ঢু ঐ চলে ফাটকা।
জাপান কি গ্রীনল্যাণ্ড দক্ষিণ মেরুতে,
আরো চলে খাই খাই বর্মা ও পেরুতে।
লামাদের তিব্বতে জুলুদের আড্ডায়,
দিনরাত খাওয়া নিয়ে পড়ে লোকে গাড্ডায়।
কেউ মরে বেশি খেয়ে, কেউ মরে শুকিয়ে,
গপাগপ খায় কেউ আড়ালেতে লুকিয়ে।
কেউ খায় শাক পাতা, কেউ খায় মৎস্য,
ভিটামিন খাবে বলে গেলে ছাগ-বৎস্য।
খাই খাই করে তারা সুরু করে যুদ্ধ,
কাটাকাটি করে মরে বেমালুম বুদ্ধ।

লিমেরিক

শ্রী তারা মুখোপাধ্যায়

যদি যাও কলকাতা আষাঢ়ের বিশে
তবে ওহে বর্ষায় পাবে নাকো দিশে!
সারাদিন সারারাত
হয় শুনি বারিপাত
ডুবে যায় ফুটপাথ—
জলে যাবে মিশে।

এক থেকে চার

শ্রী সুনীতি মুখোপাধ্যায়

তিনু বলে দাদাকে,
তিন ফুটে গজ,
ক'ফুট যোগাড় হলে
হবো দিগ্‌গজ?
এক পো ছুধে পাঁচ পো পানি,
ছুধ নিবে গো মা-ঠাকুরাণী?
যা তা নয় মা, গঙ্গাজল,
চুমুক দিলেই পুণ্যি ফল॥

শেয়ানে শেয়ানে

শ্রী জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ধর্মপ্রচারক যারা তারা একটু বেশী কথা বলে থাকেন। কথা বেচে খাওয়াই তাদের পেশা। আমি একজন ধর্মপ্রচারককে জানি যিনি কথা বলতেন খুবই কম। বরং বলা চলে কথা বলতে একেবারেই নারাজ ছিলেন, তিনি মুখ খুলতেই চাইতেন না যেন। প্রতি রবিবার সকালে তিনি গীর্জার বেদীর উপর উঠে দাঁড়াতেন ভগবানের বাণী শ্রোতাদের মধ্যে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে—চোখে আঁটতেন কালো ফ্রেমের ঘোলাটে কাচের চশমা—তারপর বাইবেলখানা খুলে ধরে সামনের দিকে চাইতেন ভাবগম্ভীর উদাস চোখে। শ্রোতারা ভগবানের পবিত্র বাণী শোনার আশায় উন্মুখ অধীর হয়ে থাকত।

বলতেন তিনি—'সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, সুপ্রভাত! আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই! প্রভাতের সোনার আলোয় সমুদ্ভাসিত চারিদিক। সে ত পরম করুণাময়েরই আশীর্বাদ। আমার সামনে যারা বসে আছে তাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখে আমার মন নিরতিশয় আনন্দে ভরে উঠছে। কিন্তু আজকে আমি কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে সম্বন্ধে অনেকেরই কোন ধারণা আছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

ধর্মযাজকের বাণী শুনতে যারা গীর্জায় যায় তাদের কেমন একটা বদ অভ্যাস —প্রত্যেক কথার টকাস্ টকাস্ উত্তর দেওয়া। ধর্মযাজকের কথা শোনা মাত্র শ্রোতারা সমস্বরে বলে উঠল—'হ্যাঁ, শ্রদ্ধাভাজন, আজকে আপনি যে বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন আমরা তার কিছুই জানি না।'

একথা শোনামাত্র ধর্মযাজক চোখ থেকে চশমা খুলে খাপে ভরে ফেললেন, সামনের সমবেত জনতার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ক্ষুব্ধ গভীর হতাশায় বললেন—'তোমাদের কাছে অহেতুক বাক্য ব্যয় করা বৃথা। আমি কি বলতে চাই সে বিষয়ে যখন কোনই ধারণা তোমাদের নেই তখন আমার পক্ষে কিছু বলা পণ্ডশ্রম মাত্র।'

এই বলে সশব্দে বই বন্ধ করে, বেদী থেকে নেমে যেন গভীর হতাশা-ক্ষুব্ধ মন নিয়ে তিনি দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হতেন কক্ষ থেকে। বিভ্রান্ত শ্রোতারা তাঁর গমনপথের দিকে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত।

পরের রবিবারে আবার যথারীতি শ্রোতারা এল গীর্জায়। আজ ধর্মযাজকের প্রশ্নের উত্তরে কি বলতে হবে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে ঠিক করে নিল তারা।

ধর্মযাজক বেদীর উপর উঠে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ হতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'সমবেত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আজ অতি চমৎকার ঝলমলে দিন। আজকের এই সুন্দর দিনটিতে আমি তোমাদের কি বলব জান কি?'

শ্রোতৃমণ্ডলী সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—'জানি, জানি প্রভু।'

একথা শোনা মাত্র ধর্মযাজক সশব্দে বই বন্ধ করে ফেললেন। বললেন—'আমি কি বলব তোমরা সবাই যখন তা' জান তখন সেকথার পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? বৃথা বাক্যব্যয়ে আয়ু ক্ষয় হয়।'

একথা বলেই তিনি বেদী থেকে অবতরণ করে দ্রুতপায়ে বাইরে এসে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

বিস্মিত, বিমূঢ় শ্রোতৃমণ্ডলী এইভাবে প্রতারিত হয়ে আবার নিজেদের মধ্যে গভীর শলাপরামর্শ করতে বসল। আচ্ছা, আগামী রবিবার দেখা যাবে। বার বার বোকা বানিয়ে চলে যাওয়া চলবে না।

আগামী রবিবার ধর্মানুষ্ঠান সুরু হলে সবাই মনে মনে তালিম দিতে লাগল আজ কি বলতে হবে। আজ আর কোন মতেই প্রতারিত হবে না তারা। সবদিক আঁটসাট বেঁধে আজ অগ্রসর হবে তারা।

ধর্মযাজক সামনে দূরে আশে পাশে বসা শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। ভাবঘন উদাস সে-দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি যেন ঘরের ছোট্ট গণ্ডী ছাড়িয়ে দূর দিগন্তে দিশাহারা। তারপর চশমাটা পকেট থেকে বের করে ধীরে ধীরে মুছে চোখে পরে নিলেন। আর একবার তিনি নিঃশব্দে তাকালেন চারিদিকে। তারপর সুরু করলেন—'আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, গত রবিবারে মিলিত হবার পর চিন্তা করার প্রচুর সময় পেয়েছ তোমরা। আজ আমি কি বিষয়ে আলোচনা করব সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কি তোমাদের?'

একথা বলামাত্রই শ্রোতৃমণ্ডলীর অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'জানি, প্রভু।'

তারা বসতেই বাকি অর্ধেক বলল—'মান্যবর, আমরা কিছুই জানি না।'

সঙ্গে সঙ্গে হাতের বই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি চোখ থেকে চশমা

খুলে পকেটে রাখলেন। বললেন—'তোমাদের মধ্যে অর্ধেক জান আর বাকি অর্ধেক জান না আমি কিঁ বলতে চাই। কাজেই যারা জান তারা বাকি অর্ধেককে যারা জানে না আমার বক্তব্য তাদের বুঝিয়ে দাও। তাতে আমার শ্রমের যথেষ্ট লাঘব হবে। তাহলে আমি বহুমূল্য সময় বৃথা অপচয় না করে বিষয়ান্তরে ও ভগবদ্ চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারব।'

ধর্মপ্রচারক হতবুদ্ধি শ্রোতৃমণ্ডলীকে আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয়ের সুযোগ না দিয়ে গ্যাট্ গ্যাট্ করে বের হয়ে গেলেন ভজন-কক্ষ থেকে।

গল্প চলে সাঁঝমহলে

শ্রী ধূর্জটিপ্রসাদ দত্ত

সাঁঝমহলে সলতে জ্বলে
টিম টিমা টিম
রাতের পিদিম
গল্প বলে গল্প বলে।
গল্প চলে গল্প চলে
আকাশ টলে বাতাস টলে,
থোকা থোকা মাণিক ঝরে
আলো নড়ে ছায়া নড়ে,
খুকুর চোখের পাতা নড়ে
পাতা পড়ে ঘুমের ভরে,

ভুঁইচাঁপায়
গড়ায় হিম
ঘুমিয়ে যায়
রাতপিদিম।
খুকুর ঠোঁটে আলতো হাসি
লবংলতা
তার যে মিতা
সঙ্গিনী সেই ঘুমতরাসী।
লতায় ফুল
ঘুমনিতুল
এমনি সাঁঝ
কিসের ভুল!

সাজাসাজি

শ্রী সঞ্জিত সাহা

হাঁদারাম বলে ঠিক
সোজা সেজে রাজা রে
বিলকুল চলে যাব
ফুচকার বাজারে।

আদারাম বলে, শোন
এমন রাজা হাজারে
সেজে এলে প্রজাজোট
বলবে, ভাড়া রে।

চিড়িয়াখানা

শ্রী সরলকুমার রায়চৌধুরী

মাপিন যাবে আমার সাথে চিড়িয়াখানায় আজ,
তোমরা যদি দেখবে এসো ফেলে সকল কাজ।
প্রথম দেখ জেব্রাগুলি গায়ে দাগ কাটা
দেখলে পরে মজাই লাগে যেন জার্সি আঁটা।
এর পরেতে জিরাফ ভায়া গলা বাড়িয়ে আছে
ভয় পেয়ো না কামড়াবে না যাও না তার কাছে।
বনমানুষের কাণ্ড দেখ চেয়ারটিতে বসে
চা খাচ্ছে কাপে করে, সিগরেট টানে কষে।
হরেক রকম হরিণ দেখ শিংএর বাহার কত
নানান পাখী ভাসছে জলে যায় না গোনা অত।
বাঘ সিংহের খাঁচার কাছে গন্ধ যে খুব পচা
কাছে গেলেই করবে সাবাড় মাংস যে খায় কাঁচা॥
এবার এসো সবাই মিলে উঠি হাতীর পিঠে,
আইস্‌ক্রিম খাও না সবে লাগবে ভারি মিঠে।
তাড়াতাড়ি চল এ[illegible]র অনেক কিছু আছে
দেখবে যদি ভাল করে এস আমার কাছে।
অত জিনিষ এই পাতাতে যায় না কভু লেখা
এমনি করেই মোদের হ'ল চিড়িয়াখানা দেখা।

লিমেরিক

শ্রী গোবিন্দ গোস্বামী

বীরের মতো বীর ছিলেন
শেওড়াফুলির সদাশিব
চোর-ডাকাত ধরতে খুনী
হলেন আবার ডিটেক্‌টিভ!

রাত-দুপুরে ডাকলে কেউ
জবাব আসে বড়োই ক্ষীণ
কাঁপতে কাঁপতে বলেন শুধু:
'থানায় গিয়ে খবর দিন!'

লবণ

শ্রী রবীন্দ্রকুমার বসু



তুরস্কের রাজা। তিনটি ছেলে তাঁর। একদিন রাজা হঠাৎ তাদের কাছে ডাকলেন। রাজা জানতে চাইলেন, তাদের মধ্যে কে কতখানি তাঁকে ভালবাসে। বড় ছেলে বললে, 'বাবা, আমি আপনাকে মহামূল্যবান রত্নের চেয়ে ভালোবাসি।' এরপর মেজ ছেলে জোর গলায় বললে, 'বাবা, আমি আপনাকে মধুর মতোই ভালোবাসি।' ছোট ছেলে বললে,—'বাবা, আপনাকে আমি নূনের মতোই ভালোবাসি।' ছোট ছেলের কথা শুনে রাজা রেগে গেলেন। বললেন, 'এই ছেলের মুখ আমি দেখতে চাইনে। তোমরা ওর শিরশ্ছেদ করো।'

রাজার আদেশ। ঘাতকেরা ছোট ছেলেকে নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে! বললে, 'রাজকুমার তোমার ওপর আমাদের মায়া পড়ে গেছে। তোমাকে আমরা মারতে পারবো না। গায়ের জামাটা খুলে আমাদের দাও। একটা খরগোশ কেটে তার রক্ত মাখিয়ে জামাটা তোমার বাবাকে দেখাবো। উনি বিশ্বাস করবেন—আমরা সত্যি তোমাকে কেটে ফেলেছি। তুমি পালাও।'

রাজপুত্র পালালো। অবশেষে ভিন্‌দেশে পৌছলো। সে দেশটাও আর একটা রাজার দেশ। ছেলেটি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লো একটা বাড়ীর সামনে। এই বাড়ীতে থাকে একটি বৃদ্ধা। ছেলেটি বুড়ীকে বললে, 'আমি এদেশে নতুন এসেছি। আমার মা-বাবা নেই। আমায় যদি দয়া ক'রে আশ্রয় দেন!' বুড়ীর ছেলে মেয়ে ছিল না। বললো—'বেশ, এখানে থাকো।'

দিন যায়। দেশের রাজা একদিন মারা গেলেন। তারপর একদিন সকালে বিস্তর লোক এসে জড়ো হ'ল একটা বিস্তীর্ণ স্থানে। আজ এখানে নতুন রাজা মনোনীত করা হবে। অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে সেখানে, রাজকুমারও।

এ দেশে রাজা পছন্দ করবার এই একটা রীতি: একটা খাঁচার পাখীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আকাশে বারকয়েক ঘুরে পাখী নামে নীচে। যার মাথার ওপর বসে, তাকেই তারা নতুন রাজা বলে মেনে নেয়।

রাজকর্মচারীরা খাঁচা থেকে পাখীটাকে উড়িয়ে দিলে। পাখী উড়ে যায় আকাশে। আকাশে ঘুরতে ঘুরতে নীচে নেমে এসে বসে রাজকুমারের

মাথায়। শুধু একবার নয়। তিনবার এমনি ঘটলো। তিনবারই পাখীটা উড়তে উড়তে এসে বসলো সেই ছেলেটির মাথার ওপর। রাজ্যের লোকেরা ঐ ছেলেটিকেই নতুন রাজা বলেই মেনে নিলে।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। নতুন রাজা তার বাবাকে নিমন্ত্রণ করতে একদিন লোক পাঠালে। পাচককে ডেকে বলে দিল 'যা কিছু রান্না করবে। কিছুতেই নুন দিও না।' রাজার বাবা এলেন মন্ত্রী সভাসদদের নিয়ে। নিজের ছেলেকে চিনতে পারলেন না। এখন তিনি অতি বৃদ্ধ। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ। ছোট ছেলেও কিছু বললো না।

সবাই খেতে বসেছেন একসঙ্গে। খাদ্য মুখে দিয়ে বাবা মুখ বিকৃত করেন। স্বাদ নেই। সবই নুন ছাড়া রান্না। একী!···বাবা তাঁর সভাসদদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কেমন খাওয়া-দাওয়া করলে?' তারা বললে, 'মহারাজ, খুবই আদর-যত্নে আছি। কিন্তু খাবার সবই লবণহীন।' রাজা বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও তরকারীতে নুন নেই।'

পরদিন বাবা আর ছেলে আহারে বসেছেন। বাবা বললেন ছেলেকে, 'তোমার রাজ্যে কি লবণ নেই?' ছেলে বললে, 'লবণ নেই মানে? প্রচুর লবণ আছে আমার রাজ্যে।' বাবা বললে 'তবে তরকারীপাতিতে নুন নেই কেন?' ছেলে বললে, 'আমি আদেশ দিয়েছি—আপনি লবণ ভালবাসেন না ব'লে আপনাদের কোন খাবারে যেন নুন দেওয়া না হয়।' বাবা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কী? নূন ছাড়া মানুষ কি তরকারী মুখে দিতে পারে? কে তোমাকে বললে লবণ আমি ভালোবাসি না।' ছেলে বললে, 'মহারাজ, একদিন যখন আপনার ছোট ছেলে আপনাকে বলেছিল—সে নূনের মতোই আপনাকে ভালোবাসে, তখন আপনি কি তাকে ঘাতকদের হাতে তুলে দেন নি?' মহারাজ বিস্মিত হলেন। বললেন—'সে কথা কি করে জানলে তুমি?' ছেলে বললে, 'মহারাজ, আপনার দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট কমে গেছে। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না। আমি আপনার সেই ছোট ছেলে।' মহারাজ তখন ছেলেকে বুকে টেনে নিলেন। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন—'তাই ভাবছিলুম, গলার স্বরটা বড় যেন চেনাচেনা!'

সাহসে সুদৃঢ় মন

শ্রী শম্ভু রক্ষিত

স্বামীজী চলেন পথে, স্থান বেনারস—
হঠাৎ বানরদল পিছে তাড়া করে।
কামড়াতে আসে। হারায় সাহস—
স্বামীজী ছোটেন বেগে বাঁচবার তরে
পেছনে বানরদলে প্রায় ধরে ধরে।
হাঁক দিয়ে বলে ওঠে একজন সাধু—
'ওদের দাঁড়াও রুখে!' ঘটে গেল যাদু
রুখে দাঁড়াবার ফলে—বানরেরা ডরে
পথিকের তেজ দেখে পলায় তখন।
স্বামীজী বোঝেন—বৃথা ভয়ে পলায়ন
জীবনে সাহস চাই, চাই দৃঢ় মন
অটল বটের মত দাঁড়াতে যে পারে
কারো কাছে সে তো কভু সহজে না হারে-
দৃঢ়চেতা হলে জয় হয় বারে বারে।

আগে ভারতীয় আমি

শ্রী সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

আগে ভারতীয় আমি।—
হিন্দু কি মুসলমান,
বৌদ্ধ পার্শি জৈন কি খৃষ্টান,
বিহারী বাঙালী ওড়িয়া,
মারাঠী জাঠ কি অহমিয়া,
পাহাড়ীয়া কি সমতলী,
তামিলী কানাড়ি কেরলী
বিচার করবো না কখনই,
মোর পরিচয়
শুধু যেন ভারতীয় হয়।
সর্ব ভারতীয়ে নমামি—নমামি।

ভারতের সাগরে

বিশ্বপ্রিয়

ভারতের সাগরে ঃ
যত বলি,—'ঠাঁই নাই
দূর হটো—ভাগো রে।'
ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়—
তবু দেখি ঘুর ঘুর,
করে এসে—আশে পাশে
যত ব্যাটা হা-ঘরে!
আমি রই জেগে তাই,
তোমরাও জাগো রে॥

ম্যাজিসিয়ান

শ্রী শিশিরকুমার মজুমদার



আমাদের বাড়ির উল্টো দিকের বাড়িটাতে নতুন ভাড়াটে এল। মা, বাবা, আর ভাই বোন। দু' রিক্সা মালের সাথে এল একটা বড় কালো কাঠের বাক্স। আমি অবাক্ হলাম ওটার ভিতরে কি আছে ভেবে! সন্ধ্যেবেলা বাবার কাছে পড়া করছি এমন সময় সেই ভদ্রলোক এলেন। বাবা তাঁকে বসালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোক আমার বাবাকে দাদা বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন। বললেন,—জানেন দাদা, আমি চাকরি-বাকরি করি না। আমার পেশা ম্যাজিক দেখান। মেলায় মেলায় ঘুরে ম্যাজিক দেখাই, ওতেই সংসার চলে। এ কাজে আমাকে বেশীর ভাগ সময়ই বিদেশে-বিভুঁয়ে কাটাতে হয়, আপনার বৌমা ছোট ছেলেটাকে নিয়ে একলা থাকেন, ওদের তখন একটু দেখাশুনা করবেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—খোকা, তোমার নাম কি? কোন্ ক্লাসে পড়? আমার উত্তর শুনে বললেন,—আরে, তুমি তো আমাদের মণ্টুর সাথে এক ক্লাসেই পড়। এ ভালই হল, ওকেও তোমাদের স্কুলে ভর্তি করে দেব। তোমরা এক সাথেই স্কুলে যাওয়া আসা করতে পারবে।—মণ্টু যে ওর ছেলের নাম তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও আমার বন্ধু হবে আমিও খুব ম্যাজিক দেখতে পাব।

উনি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই হঠাৎ তাঁর হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—বলতো আমার হাতে কি? আমি বললাম,—ও তো একটা আট আনি!—কই, কই?—বলে হাতটা ঝাঁকানি দিতেই দেখলাম ওর হাতে ধরা একটা হলদে কাগজের ফুল।—কি দেখছ, বল বল? আমি হেসে বললাম,—ওতো একটা কাগজের ফুল।

—ভুল ভুল,—বলে হাত ঝাড়া দিতেই ফুলটা রুমাল হয়ে গেল।

চা খেয়ে যাবার সময় উনি বাবাকে বললেন,—কই দাদা, এত কথা হল আপনি তো একবার আমার নামটাও জিজ্ঞাসা করলেন না? আমার নাম

গণেশ সেন, মানে দ্যা গ্রেট ম্যাজিসিয়ান গসেন। কথার শেষে হো হো করে হেসে উনি চলে গেলেন।

মণ্টুর সাথে আমার খুব ভাব হল। স্কুলে এক সাথেই আমরা যাই। ওদের বাড়ির সবার সাথেও আমাদের খুব ভাব হল। মণ্টুর মা হলেন আমার কাকীমা, ওর দিদি আমারও দিদি। মণ্টুর বাবাকে আমি গসেন কাকা বলে ডাকি! একদিন মণ্টু বলল,—ওর বাবার মত নাকি এত বড় ম্যাজিসিয়ান আর নেই! উনি লোকের জিভ কেটে জোড়া লাগাতে পারেন; করাত দিয়ে একজন মেয়েকে কেটে দু'টুকরো করে এক মিনিটেই জোড়া দেন; অন্ধকারে ভূত নাচান; মন্ত্র পড়ে শূন্যে লোক ভাসিয়ে রাখেন; চোখের সামনে থেকে নিমেষে একজনকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেন। একদিন তোকে বাবার খেলা দেখাব তবে বুঝবি! শুনে আমার আর সময় কাটে না। কবে যে আমি অমন ম্যাজিক দেখতে পাব তাই হল চিন্তা।

গসেন কাকা একদিন তার সেই বড় কালো বাক্সটা নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। সঙ্গে নিলেন মিনু দিদিকে।

মণ্টু বলল,—বাবা গেছেন মেলাতে খেলা দেখাতে। দু'দিন পরে ফিরবেন।

মিনু দিদি কিন্তু আমাকে বলতো—ম্যাজিক আমার মোটেই ভাল লাগে না। বাবা কেন যে অন্য কিছু করেন না! ওতে আমার পড়াশুনা নষ্ট হয়।

আমি অবাক্ হলাম একথা শুনে। বললাম,—তুমি অমন কথা বলছ! তোমার বাবা না পৃথিবীর সব থেকে বড় ম্যাজিসিয়ান!

—ছাই,—বলে মিনু দিদি আমার কাছ থেকে চলে গেল। আমার কিন্তু ভীষণ রাগ হল। জিভ কাটা, করাতে মেয়ে কাটা, মানুষ ভাসান, চোখের সামনে থেকে শূন্যে উড়িয়ে দেওয়া, এসব খেলা যে দেখাতে পারে তাকে কি ছাই বলা উচিত! আর সে যখন কিনা মিনু দিদির নিজেরই বাবা!

কাকীমা একদিন মায়ের কাছে দুপুরে এসে দুঃখ করে বললেন,—জানেন দিদি, মিনুর বাবা স্বদেশী করে জেল খেটে সাহেব কোম্পানীর চাকরি খুইয়ে শেষে এই স্বরু করেছেন। মুশকিল হয়েছে মেয়েটাকে নিয়ে। ও এ সবের মধ্যে থাকতে চায় না, বলে তাতে পড়াশুনার ক্ষতি হয়। এই দেখুন না নতুন পাড়ায় এলাম এখানেও মেয়েটাকে ইস্কুলে ভর্তি করলেন না। এদিকে মেয়ে তো কান্নাকাটি করে। আমি যে কি করি!

মা জিজ্ঞাসা করলেন,—মেয়েও কি বাপের সাথে ম্যাজিক দেখায় নাকি ?

—তবে আর বলছি কি দিদি!—বললেন কাকীমা,—ওই মেয়েকেই তো তার বাপ কেটে দু'খানা করছেন রাত দিন! কখনও তার জিভ কাটছেন, কখনও ঝুড়ির মধ্যে ভরে শূন্যে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মেয়ের আর এ সব ভাল লাগছে না। ও কান্নাকাটি করে, বলে এমন করলে পড়াশুনা আর হবে না।

—তা না হয় অন্য কাউকে রাখতে বলুন আপনি।—মা বললেন,—মেয়ের যখন পড়ার এত শখ ওকে না হয় পড়তেই দিন।

—এ নিয়ে ওর বাপকে আমি যদি কিছু বলি তবেই অনর্থ ঘটে। মেয়েকে উনি বকাঝকা করেন। যদি বলি একটা লোক রাখতে তো উনি বলবেন, লোক রাখলে তাকে মাস-মাহিনা দিতে হবে, রোজগারের যা অবস্থা তাতে তা সম্ভব নয়।—বললেন কাকীমা।

সেদিন বিকালে একটা সাইকেল রিক্সা এসে থামল মণ্টুদের বাড়ির সামনে, মণ্টু ছুটে এসে বলল,—এই তপু, বাবা রিক্সা পাঠিয়েছেন, চল ম্যাজিক দেখতে ? আমি আর মা যাচ্ছি।

মাকে বলে আমি গিয়ে রিক্সায় উঠলাম। রিক্সা আমাদের একটা মেলার সামনে নামিয়ে দিল। চারিদিকে আলো জলছে, ভীষণ ভীড়, ও বলল,—এটা চণ্ডীতলার মেলা। আমরা গসেন কাকার তাঁবুর দিকে এগোলাম। ছোট তাঁবু। সামনে একটা ছেলে ভালুকের মুখোশ পড়ে নাচছিল। তাঁবুর গায়ে বড় বড় করে লেখা,—দি গ্রেট ম্যাজিসিয়ান গসেন।

আসুন দেখুন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! শূন্যে ভাসমান কন্যা, কাটা জিভ জোড়া, করাতে জীবন্ত কন্যা দুই খণ্ড, আবার নিমেষে জোড়া!—একটা লোক বাক্সের সামনে বসে মাইক হাতে নিয়ে চেঁচাচ্ছে,—আসুন দেখুন আজব ভেল্কী, মাত্র উনিশ পয়সা।

আমরা ভিতরে ঢুকে সামনের চেয়ারে বসে পড়লাম। তারপর আলো নিভে গিয়ে সামনের পর্দা সরে গেল। পরীর মত পোষাক পরে সামনে এসে দাঁড়াল মিনু দিদি, তারপর সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড গসেন কাকা এক এক করে দেখালেন। দু'জন মানুষ যখন সত্যিই মিনু দিদিকে একটা প্রকাণ্ড করাত দিয়ে কাটতে সুরু করল, আমি ভয়ে চোখ বুজলাম। মণ্টু আমার কানে কানে বলল,—সব ফাঁকি বুঝলি। ও খেলা আমিও দেখাতে পারি!

খেলায় শেষে গসেন কাকা আমাদের সাজঘরে ডেকে পাঠালেন। ডিমু

আলুর চপ আর চা খেতে দিলেন। আমি খেতে খেতে বললাম,—মিনু দিদি, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে, ঠিক যেন পরী।

মিনু দিদি রাগে ফেটে পড়ে বলল,—দেখতে পরীর মত না ছাই! রং মেখে সং সাজতে আর আমি পারব না!

গসেন কাকা ব্যস্ত হয়ে বললেন,—আচ্ছা আচ্ছা, আর তোমাকে সং সাজতে হবে না। এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, ওদিকে শেষ শোয়ের ঘণ্টা বাজল বলে।

বাইরে তখুনি মাইক হাতে লোকটা চেঁচাতে সুরু করল,—আজব ভেল্কী, তুনিয়ার সেরা, উনিশ পয়সা, আসুন দেখুন আজব কাণ্ড।

গসেন কাকা মিনু দিদির পিঠে হাত রেখে করুণ ভাবে বললেন, —তোর তুঃখ আমি বুঝিরে মা। কিন্তু কি করব বল? এই যে এত আলো, এত চিৎকার, এত পরিশ্রম, তবু সারাদিনে টিকিট বিক্রি হয়েছে মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকার! সবাইকে দিয়ে-থুয়ে আমার থাকবে কি বল? যদি আবার একটা এ্যাসিস্টেণ্ট রাখতে হয় তবে যে মা, ঘরে একটা পয়সাও নিয়ে যেতে পারব না! —বুঝিস না কেন তুই!

একথা শুনে মিনুদিদি চোখ মুছে চায়ের ঠাণ্ডা ভাঁড়টা হাতে তুলে নিল। কাকীমা বললেন,—তা বাপু, তোমার ঐ পীরপুরের মেলা হয়ে গেলে মেয়েকে আর আমি এসব করতে দেব না। ওর পড়াশুনার বড় সখ, ও পড়বে।

—নিশ্চয়ই।—বললেন গসেন কাকা,—শুনেছি পীরপুরের মেলা নাকি বেশ জমজমাটি হয়। ওখানে এক মাস তাঁবু ফেলে থাকলে হাজার তিনেক টাকা কামাতে পারব। তারপর মায়ের একদম ছুটি। কথা দিচ্ছি। দ্যা গ্রেট ম্যাজিসিয়ান গসেনের কথার আর নড়চড় হবে না। তুই স্কুলে পড়বি।

ক'দিন পরে গসেন কাকা সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে এলেন। বললেন, —দাদা, মেয়েটাকে তো এবার স্কুলে ভর্তি করতে হয়। বাবা বললেন,—বেশ তো, ওকে মনোরমা গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দিন।

কিন্তু দাদা একটু মুস্কিল আছে যে! বলে মাথা চুলকালেন গসেন কাকা, —মানে,—ওর আগের স্কুলের মাইনা বাকী পড়াতে নাম কাটা গেছিল। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তাই পাওয়া যাবে না। ওকে নতুন করে ভর্তি হতে হবে।

বাবা বললেন,—তাতে কি, পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হোক! আমি স্কুলের সেক্রেটারীকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

খাওয়া-নাওয়া ভুলে গেল মিনু দিদি, স্কুলে ভর্তির পরীক্ষার জন্য বই-পত্র নিয়ে পড়াশুনা সুরু করল। যখনই আমি ওদের বাড়ি যাই, দেখি মিনু দিদি বসে পড়ছে!

এর মধ্যে গসেন কাকা আরও ক'বার তাঁর কালো বাক্স নিয়ে বাইরে গেলেন। মিনু দিদিকে সঙ্গে নিলেন না কোন বার। কিন্তু মুখ কাল করে বাড়িতে ফিরলেন। মণ্টু বলল,—কোন মেলাতেই নাকি ওর বাবার খেলা দেখতে তেমন কেউ আসে নি।

মিনু দিদি ক্লাস নাইনে ভর্তি হল। প্রথম দিন স্কুলে যাবার আগে আমার বাবা আর মাকে প্রণাম করে গেল। বাবা বললেন,—বইপত্র যা লাগে আমাকে বলবে তুমি, আমি কিনে দেব।

গসেন কাকা সেদিন রাত্রেও আমাদের বাড়িতে এলেন। বললেন,—দাদা, ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে এখন বড় চিন্তা হচ্ছে!

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে শুনি?

—জানেন তো গত ক'টা শোতে কিছুই রোজগার হয় নি। আজ আবার ঘরের সব কটা টাকা খরচ করে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করলাম। এখন বোধ হয় না খেয়ে মরতে হবে সবাইকে।

বাবা বললেন,—পীরপুরের মেলা তো এসে গিয়েছে। ওখানে নিশ্চয়ই আপনার অনেক লাভ হবে। চিন্তা করবেন না।

—চিন্তা কি সাধে হ' দাদা! ঐ পীরপুরের মেলাও আর এক চিন্তার কারণ হয়েছে। মেয়েটা কি আর আমার সাথে যাবে ওখানে! অথচ ওকে না হলে আমার খেলাগুলো তেমন জমে না। এদিকে নতুন লোক যে রাখব তারই বা টাকা কোথায়। ভাবছি মেয়েটিকেই নিয়ে যাব সঙ্গে।

বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন,—না না, অমন কাজও করবেন না। মেয়ে আপনার খুব ভাল পড়াশুনায়। ওর আখের নষ্ট করবেন না।

—কিন্তু আমি কি করি বলুন তো?

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে গসেন কাকা চলে গেলেন।

পীরপুরের মেলা আমাদের এদিকের খুব বড় মেলা। সেখানে নাকি এক মাস ধরে কত কি হয়। গসেন কাকার তাঁবু ওখানে পড়লে এবারে সে মেলা আমি দেখতে পাব। সে আনন্দেই আমি ছটফট করছিলাম, দিন গুণছিলাম।

একদিন সকালবেলা আবার দু'খানা সাইকেল রিক্সা এসে থামল মণ্টুদের বাড়ির সামনে।

গসেন কাকার সেই কালো বাক্সটা এলো বাইরে। আমিও গিয়ে হাজির হলাম ওদের বাড়িতে। গসেন কাকা তখন কোট প্যাণ্ট পরে যাবার জন্ম তৈরী। বললেন,—এই যে তপুবাবু এসে গিয়েছ,—আমি একদিন তোমাদের সবাইকে মেলা দেখাতে নিয়ে যাব। দেখবে এবারে আমি কত নতুন ম্যাজিক দেখাই।

গসেন কাকা বাইরে চলে গেলেন। আমি ভিতরে ঢুকে থমকে গেলাম। জানালার ধারে বসে মিনু দিদি কাঁদছে। কাকীমা বলছেন,—কি করবি মা বল? যা ভাগ্য করে এসেছিস! নে চোখ মোছ, দুর্গা দুর্গা বলে রওনা দে। তোর বইপত্র সব আমি গুছিয়ে দিয়েছি। সময় পেলে ওখানে নিজেই পড়িস। দেখতে দেখতে এক মাস কেটে যাবে।

ওরা চলে যাবার পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে মণ্টু বলল,—আমি আর পীরপুরের মেলায় যাব না রে তপু। তুই একলা যাস। ম্যাজিক না ছাই, সব ফাঁকির খেলা। বাবা যে কেন অন্ত কিছু করেন না! জানিস দিদি আগের স্কুলে ফার্স্ট হত! বাবা এমন করলে দিদি কি আর ফার্স্ট হতে পারবে?

আমি বললাম,—গসেন কাকা এবারে আরও অনেক নতুন খেলা দেখাবেন বলেছেন।

—ও সব খেলা যে কেউ করতে পারে। ম্যাজিক মানে তো মিথ্যা, একদম ফাঁকি। ও তুই দেখ্ গে যা।

ক'দিন পরেই রাতে একটা ট্যাক্সি এসে থামল মণ্টুদের বাড়ির সামনে। গসেন কাকা বাইরে থেকে বাবার নাম ধরে ডাকলেন। বাবা উঠে জানালার কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কি সব কথা বললেন। তারপর জামা গায় দিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

ভোরবেলা মায়ের কাছে শুনলাম মিনু দিদির নাকি খুব অসুখ। তাই গসেন কাকা পীরপুরের খেলা বন্ধ রেখে ওকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। মণ্টুদের বাড়িতে গিয়ে দেখি কাকীমা মিনু দিদির মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন। লাল লাল চোখ মেলে মিনু দিদি আমাকে দেখেই জড়ান গলায় বলল,—আমি ইচ্ছা করে ভুল করি নি বাবা, ইচ্ছা করে করি নি। আমাকে মের না, আমাকে মের না। —তারপর ঘরের কোণার দিকে তাকিয়ে বলল,—হুউস্, আমি উড়ে গেছি

শূন্যে! আর আমাকে ধরতে পারবে না। গসেন সাহেবের বড় ম্যাজিক উনিশ পয়সা—মাত্র উনিশ পয়সা।—মের না বাবা, মের না। আর ভুল করব না। হুউস্,—ভ্যানিস্ ভ্যানিস্, দ্যা গ্রেট ম্যাজিসিয়ান গসেনের খেলা—হুউস্!

কাকীমা কান্নাভরা গলায় বললেন,—একটু চুপ কর—একটু চুপ কর মা।

তেমনি করেই তাকিয়ে থেকে মিনু দিদি আবার বলল,—একটু ভুল করেছি তার জন্য এমন করে মারলে বাবা? মের না বাবা, মের না। আর ভুল করব না। —থাম মা থাম দোহাই তোর।—কেঁদে উঠে বললেন কাকীমা।

বাইরে গসেন কাকার গলা শোনা গেল,—ওরে মণ্টু, ডাক্তারবাবু এসেছেন তোর মাকে বল।

ভাল করে মিনু দিদিকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তারবাবু। গসেন কাকা জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? উনি গম্ভীরভাবে বললেন, —চলুন বাইরে চলুন। ওরা চলে যেতেই মিনু দিদি আবার বকতে আরম্ভ করল। চুপি চুপি চলে এলাম ওখান থেকে। আসার সময় দেখলাম বাইরের বারান্দায় গসেন কাকার সেই কালো বাক্সটা হাঁ করে খোলা পড়ে আছে।

রাত্রিবেলা মা আমাকে বললে,—মণ্টুকে ডেকে নিয়ে এস তপু। তুমি আর মণ্টু এখন কয়েকদিন এ বাড়িতেই একসাথে থাকবে। ও বাড়িতে বেশী যাবে না। মিনুর এখন অমন অবস্থা! গিয়ে গোলমাল করবে না।

মণ্টু এসে চুপচাপ খাওয়া-দাওয়া করে বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়ল। বাবা তখনও ও-বাড়ি থেকে ফেরেন নি। আমার ঘুম আসছিল না। কেন যেন বারবার মিনু দিদির সেই অদ্ভুত কথাগুলোই মনে হচ্ছিল!—ভ্যানিস! ভ্যানিস! গসেন কাকা ঐ খেলাটা দেখিয়েই তো হাততালি পান সব থেকে বেশী! তবে কি ঐ খেলাটা দেখাবার সময়েই ভুল করেছিল মিনু দিদি!

মণ্টু বোধহয় ওদিকে চুপিচুপি কাঁদছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও কাঁদছে ওর দিদির জন্য। কেন যে গসেন কাকা ভ্যানিস করার খেলাটা দেখাতে গেলেন।

মাঝ রাতে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় উঠে বসলাম। বাবা তখনও ফেরেন নি ও-বাড়ি থেকে। গসেন কাকার গলা শোনা গেল। তিনি চেঁচাচ্ছিলেন—আর আমি তোকে মারব না মা। আমি তো তেমন ম্যাজিসিয়ান নই, ওমা যাসনে মা—মা রে…

মন্টু কাঁদতে লাগল। আমার মনে হল—ছাই ম্যাজিসিয়ান গসেন কাকা! উনি যে খেলা দেখান তা ম্যাজিক না ছাই, একদম ফাঁকির খেলা! আমারও চোখে জল এসে গেল।

বুড়োর সংসার

শ্রী সুপ্রভাত চৌধুরী

এক বুড়ো থুড়থুড়ে বাড়ী তার ট্যাংরা
বুড়ি তার গুড়গুড়ে হাতে তার খ্যাংরা,
মেয়ে তার করে নাচ
বড় ছেলে রকবাজ,
ছোটো মেয়ে ট্যারা তার এক ঠ্যাং ল্যাংড়া।
বুড়োটার মেজো ছেলে ঠকবাজ ঠ্যাংড়া,
সেজটা গিয়েছে জেলে গাঁটকাটা চ্যাংড়া।
তবু বুড়ো খাসা আছে, ঝাঁটা খায় নিত্য,
সংসার তার কাছে নেহাতই অনিত্য।
অবিরাম খায় গাঁজা
ভাবে সে রাজার রাজা,
দেখেশুনে বুড়িটার জ্বলে যায় পিত্ত।

হারিয়ে যাওয়া

শ্রী তপনকুমার চৌধুরী

—'হারিয়ে যাবো'—বললে খুকু
আকাশ বললে—'বেশ,
সত্যি যদি হয় হারাতে
এই আকাশের দেশ।'
অমনি নদী সামনে এসে
বললে হঠাৎ হেসে—
"যাও হারিয়ে আমার সাথে
কুলকুলিয়ে ভেসে।'

পাহাড় বললে—'আমার চূড়োয়
হারাতে নেই মানা—
তোমার মতো হারিয়ে যাওয়া
সঙ্গী পাবে নানা।'
গালেতে হাত ভাবলে খুকু
কোথায় হারায় শেষে…
ভাবতে ভাবতে মায়ের কোলে
হারায় ঘুমের দেশে॥

আপদ্ ধর্ম্ম

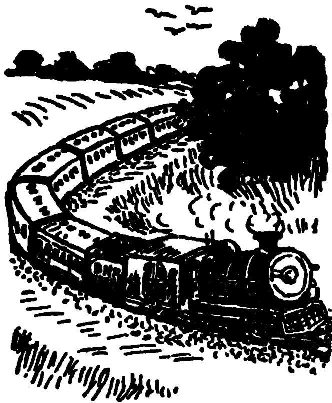
শ্রী জয়ন্ত দাশগুপ্ত

কষতে ধমক গয়লাকে "দুধে মেশাস্ জল"
বেয়াদপির মুচকি হাসি, পেলাম প্রতিফল,
"আসল হিসেব বাবুদের সব হচ্ছে ঠিকে ভুল
খাবার দুধ বললে খাঁটি বিলকুল তা গুল!
উপচে পড়ে খাঁটি দুধ মাটিতে তা খায়
বাঁটটা চোষার সুযোগ পেলে বাছুর কিছু খায়;
কম বা বেশী যা হ'ক কিছু জলটা দিতেই হয়
বাপ-পিতোমোর শিক্ষে এটা ধর্ম্ম এরেই কয়,
নিত্যি ঘরে যে দুধ খাবে তাতেও মেশায় জল
জোগান দিতে জল মেশাবে সেও তো কর্ম্মফল!
ধর্ম্ম তুলে মাথায় রেখে করছি সেরেফ কর্ম্ম
জোগান দুধে জল মিশিয়ে রাখছি আপদ্ ধর্ম্ম ॥"

বহুরূপী

শ্রী নয়নকুমার রায়

হঠাৎ সেদিন বাঘ বাবাজী হাজির ঘোষের বাড়ী
চক্ষু সবার চড়কগাছ বন্ধ প্রায় নাড়ি।
প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলো খাটের নীচে
চেঁচিয়ে বলে ভীম পহলবান 'বাঘ লেগেছে পিছে।'
যে যেদিকে দৌড়ে পালায় বিপদ দেখে গুপী
বলছে 'আমি বাঘ নইকো গাঁয়ের বহুরূপী।
বেরিয়ে এসো পহলবন ভয় পেয়েছো সে কি?
বনের বাঘ নইকো আমি সঙ সাজা এক মেকী।'



লাল নিশান

শ্রী নীহাররঞ্জন গুপ্ত

॥ ১ ॥

সুখলাল আর কি করে আসার সময় ছেলেটাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলো।

কার কাছেই বা ছেলেটাকে ফেলে রেখে আসে। আপনার জন বলতে ত আর কেউই ছিল না—মহল্লার পাড়া-প্রতিবেশীরা তারাও বললে, ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও সুখলাল ভেইয়া বাচ্চা ছেলে—

কথাটা তারা মিথ্যা বলে নি।

আট বছরের ছেলে লাল্লু—আট বছরও পুরো হয় নি—

রোগা ডিগ্‌ডিগে চেহারা—এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ—পরণে একটা হ্যাফ প্যাণ্ট—গায়ে কুর্তা—তাও সব সময় গায়ে কুর্তাটা রাখে না। গলায় কালো কারের সঙ্গে একটা তামার মাদুলি।

কাচ্চা-বাচ্চা আর হবে না হবে না করতে করতে বুড়ো বয়সে ঐ ছেলে হয়েছিল এবং ছেলে হবার পর থেকেই ওর মা—সুখলালের বৌ সুরতিয়া কি সব রোগে ভুগছিল। বেশীর ভাগ দিনও সুরতিয়া বিছানাতেই পড়ে থাকত—আর পাঁচ-ছয় বছর বয়স হবার পর থেকে লাল্লু আপন মনে মহল্লার মধ্যে ঘুরে বেড়াতো হাতে একটা বাঁশের কঞ্চির মাথায় একটুকরো লাল কাপড় বেঁধে।

বাপ সুখলাল বলেছিল, জানতি হো বেটা—হাম যব্ লাল নিশান উড়াতা মেল ট্রেন—পাসিঞ্জার ট্রেন—গুড্‌স ট্রেন সব রুখ যাতা—।

তোমাহারা হাতসে লাল নিশান দেখানেসে কোই গাড়ি নেহি জায়গা বাবুজী—?

নেহি—হুকুম নেহি হ্যায় যানে কো—

উসকে বাদ কেয়া হোতা বাবুজী?

ফির সবুজ নিশান দেনেসে গাড়ি চলেগি।

হামভি গাড়ি রুখেগা।

জরুর তুমভি হামারা মাফিক পয়েণ্টস্‌-ম্যান যব হোগা তোমাহারা সবুজ আউর লাল নিশান দেখনেসে গাড়ি চলেগি—রুখ যায়গি।

হামকো একঠো লাল নিশান আউর একঠো সবুজ দেওগে বাবুজী—

লাল্লুর বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর—স্থখলাল একটা কঞ্চির মাথায় একটা লাল কাপড়ের টুক্‌রো ও অন্য একটা কঞ্চির মাথায় সবুজ কাপড়ের টুকরো বেঁধে ছেলের হাতে দিয়ে বলেছিল, লো তুমহারা সবুজ আউর লাল নিশান বেটা।

সেই লাল আর সবুজ নিশান দুটো নিয়েই লাল্লু ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতো মহল্লার মধ্যে।

প্রতাপগড় স্টেশন ছাড়িয়ে মাইল দশেক দূরে ছোট একটা গুম্‌টি ঘর একটা সড়ক লাইনের এপাশ থেকে ওপাশে যেন ডিঙ্গিয়ে চলে গিয়েছে—দুটো ভাঙ্গা নড়বড়ে লোহার গেট লাইনের দু'দিকে। ট্রেন আসার সময় হলে সব সময় স্থখলাল গেট দুটো বন্ধও করতো না—কেবল লাল বা সবুজ নিশান উড়িয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন ড্রাইভারকে সংকেত জানাত।

ছোট একটা জানালা আর ছোট নীচু একটা দরজা গুম্‌টি ঘরটার। সেই দরজা দিয়ে ঢুকতে হলে মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়।

লাল্লুর যখন ছয় বৎসর বয়েস স্থখলাল মাস দুয়েকের জন্য লাল্লু আর তার মাকে এনে ঐ গুম্‌টি ঘরে রেখেছিল—নতুন জায়গায়—খোলা জায়গায় এলে যদি স্থরতিয়ার রুগ্ন স্বাস্থ্যটা ফেরে। কিন্তু কোন উপকার তেমন বিশেষ হয় নি তাই আবার তাদের বেনারসে দেশে রেখে এসেছিল।

লোকমুখে স্থরতিয়ার অস্থখের বাড়াবাড়ির সংবাদ পেয়ে স্থখলাল গিয়েছিল দশ দিনের ছুটিতে দেশে বেনারসে—কিন্তু স্থরতিয়ার সে অস্থখ আর সারল না—বারদিনের দিন সে মারা গেল।

মা-মরা ছেলেটাকে কার কাছেই বা রেখে যায়—স্থখলাল লাল্লুকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলো।

লাল্লু ঐ জায়গায় এসে খুশিই হয়।

কঞ্চির ডগায় একটা সবুজ কাপড়ের টুকরো বাঁধা নিশানটা হাতে সেও তার বাপের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের শব্দ পেলেই লাইনের ধারে এসে দাঁড়ায়।

বাপ সবুজ ফ্ল্যাগটা হাতে ধরে দোলাতে থাকে, পাশে দাঁড়িয়ে লাল্লুও তার সবুজ রংঙের কাপড়ের টুক্‌রো বাঁধা কঞ্চিটা দোলাতে থাকে।

ট্রেনগুলো লাইনের উপর দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দ তুলে চলে যায়।

যতদূর দৃষ্টি চলে ইস্পাতের জোড়া রেল লাইন পাশাপাশি চলে গিয়েছে।

লাল্লু জিজ্ঞাসা করে, আহা বাবুজী—এ দো লাইন কিধার গিয়া—?

সুখলাল বলে, একঠো হামারা দেশ বেনারস ছোড়কে মোগলসরাই গিয়া আর উসকো বাদ গয়া জেলা—সিধা—হাওড়া টিশন—কলকাত্তা, আর দোসরা লাইন লক্ষ্ণৌ হোকে—আউর বহুৎ দূর বেটা।



আসলে সুখলাল নিজেই জানত না—লক্ষ্ণৌ তারপর কোন্ স্টেশন।

লাইনটা সত্যি-সত্যিই কতদূর পর্যন্ত গিয়াছে।

অতটুকু—আট বছরের ছেলের কৌতূহলের যেন অন্ত নেই।

বাপকে কেবলই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়।

তুমকো ঐ সবুজ আর লাল নিশান কৌন দিয়া বাবুজী—?

সরকার নে দিয়া বেটা।

সরকার কো বলো না বাবুজী—হামকো ভি দোঠো নিশান তোমাহারা মাফিক দিয়া করে—

বাচ্চা লোককো ত দেতা নেহি বেটা।

কিউ বাবুজী—হামভিত উড়ানে সেকতা—?

ঠিক হ্যায় বেটা—সরকার বাহাদুর কভি ইধার আনেসে হাম বোলে গা—।

বাপ ছেলেতে ঐ সব কথা হয়।

অবসর সময়ে সুখলাল রান্না-বান্না করে এবং খাওয়া-দাওয়ার পর সুর করে দরজার সামনে বসে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে।

ছেলে কিন্তু এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সবুজ কাপড়ের টুক্‌রো বাঁধা কঞ্চিটা হাতে করে।

লাইনের দু'পাশে কাশের বন—

বাতাসে দোলে আর দোলে।

একটা কুলগাছ—কুলের সময় অজস্র কুল ধরে গাছটায়, আর আছে একটা পলাশ ফুলের গাছ—দু'দিকে মাঠ ধূ-ধূ করে—আশে পাশে কোথায়ও কোন জনমানবের বসতি নেই বটে তবে মধ্যে মধ্যে দূর গাঁও থেকে মহিষ গরু ছাগল চরাতে আসে সেই মাঠে দেহাতীরা।

মধ্যে মধ্যে দু'একটা লরী, যাত্রী ভর্তি প্রাইভেট বাস ও এমনি মোটর গাড়িও—লাইন ক্রস করে চলে যায়, সে সবের দিকে লাল্লুর তেমন কোন আকর্ষণ নেই—।

তার যত আকর্ষণ যে সব ট্রেনগুলো এদিক থেকে ওদিক যাতায়াত করে ঐ জোড়া লাইন দিয়ে সেই ট্রেনগুলোরই প্রতি।

সুখলাল বার বার করে ছেলেকে সাবধান করে দিয়েছিল, দেখো বেটা লাল নিশান কখনো উড়িয়ো না।

লাল নিশান দেখলে ট্রেন থেমে যায়—তাই না বাবুজী ?

হ্যাঁ বেটা—ঝুট মুট্ ট্রেন রুখলে সরকার গোঁসা করবে—হামার নোকরি ভি খতম হয়ে যাবে।

লাল্লু ঘাড় হেলিয়ে বলেছে, আচ্ছা—উড়াবো না কখনো লাল নিশান।

॥ ২ ॥

কোথায় কোথায় যে লাইনের ওদিকে ঘোরে লাল্লু—সুখলাল তার দেখাই পায় না—কিন্তু আশ্চর্য ট্রেনের শব্দ শুনলেই সে সবুজ নিশান হাতে ছুটে এসে বাপের পাশে ঠিক দাঁড়ায়।

ঐ লাইনে ট্রেনের অনেক গার্ড ও ড্রাইভারের ব্যাপারটা জানা হয়ে গিয়েছে —সুখলালের পাশে এখন ঐ ছোট্ট ছেলেটাকে কঞ্চির মাথায় সবুজ কাপড়ের টুক্‌রোটা দোলাতে দেখলেই পাশ দিয়ে যাবার সময় লাল্লুর দিকে চেয়ে হাসে।

হাত নাড়ে।

এক মাথা কোঁকড়া চুল—একটা হাফ প্যান্ট পরা—খালি গা—গলায় কালো কারের সঙ্গে বাঁধা একটা বড় তামার মাদুলি—হাতে সবুজ কাপড়ের টুক্‌রো বাঁধা কঞ্চিটা ছেলেটাকে যেন ঐ লাইনের সব ড্রাইভার ও গার্ডই ভালবেসে ফেলেছে।

ইস্পাতের ঐ জোড়া লাইনের তলায় যে চওড়া চওড়া কাঠের স্লিপারগুলো

—এবং তার মধ্যে বড় বড় পাথরগুলো তার উপর দিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে ফেলে হাঁটা লাল্লুর আর একটা নেশা।

দুপুরবেলা যখন চারিদিক নিঝুম হয়ে আসে ঐ স্লিপারগুলোর উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে হাঁটতে লাল্লু কখনো এদিকে কখনো ওদিকে অনেক দূর চলে যায়।

টেলিগ্রাফের তারের পোস্টগুলো গুণতে গুণতে যায়, এক, দো, তিন, চার—

কোন কোন দিন লাল্লু ত্রিশ চল্লিশটা পোস্ট পার হয়ে যায়।

সুখলাল ব্যাপারটা একদিন জানতে পেরে বলে ছেলেকে, খুব দূর যেও না বেটা—

কিউ বাবুজী?

কখন কোন দিক থেকে হঠাৎ গাড়ি এসে পড়বে কিছু ঠিক আছে কি—সর্বনাশ হয়ে যাবে কখন।

কেন আমার হাতে ত নিশান থাকে?

ওতো সবুজ নিশান—।

তবে লাল নিশানটা নিয়ে যাবো—।

নেহি নেহি বেটা—লাল নিশান মাত্ দেখাও।

ছেলেটা এমন সরল, এমন বোকা কোন দিন হয়ত একটা বিপদ ঘটিয়ে বসবে—সুখলালের সে জন্য চিন্তাও কম নয়। স্লিপারের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হয়ত একটা পাখী চোখে পড়ে লাল্লুর—টেলিগ্রাফের তারে বসে আপন মনে লেজ দোলাচ্ছে—লাল্লু দাঁড়িয়ে পড়ে—পাখীটার দিকে চেয়ে থাকে।

পাখীটার সঙ্গে কথা বলে—আরে এ চিড়িয়া, বৈঠকে ইহা কেয়া করতা হ্যায় রে?

পাখীটা ঘাড় ফিরিয়ে হয়ত দেখে লাল্লুকে তারপর ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে যায় ডানা দুটো মেলে দিয়ে—।

এমনি এক শীতের দুপুরে—

লাল্লু হাঁটতে হাঁটতে চলেছে স্লিপারের উপরে পা ফেলে ফেলে—হঠাৎ ক্যালভার্টটার নীচে তার নজর পড়লো। জল নেই—শুকনো খট্‌খটে মাটি।

আশে-পাশে কিছু রাণা গাছের ঝোপ, সেই ঝোপের সামনে বসে বিরাট চেহারার একটা লোক ছিঁড়ে ছিঁড়ে চাপাটি খাচ্ছে।

ইয়া গোঁফ—মাথায় একটা পাগড়ি—পরণে একটা প্যান্ট—গায়ে কালো একটা কোট—পাশে একটা বন্দুক পড়ে আছে মাটিতে।

লোকটা আপন মনে খেয়ে চলেছে, কোনদিকে নজর নেই।

কৌতূহল ভরে অনেকক্ষণ ধরে লোকটাকে দেখলো লাল্লু, তারপর লাইন থেকে ঢালু পাড় দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে ঝোপটার দিকে এগিয়ে চললো।

ঝোপের কাছাকাছি আসতেই তারই পায়ের শব্দে বোধ হয় লোকটা খানা ফেলে চট্ করে বন্দুকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

তাকাতেই লাল্লুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো।

লোকটার হাতে ধরা বন্দুক—সে পরম বিস্ময়ে যেন লাল্লুর দিকে চেয়ে থাকে।

কে লোকটা লাল্লু ভাবে।

এতটুকু তার ভয় করে না।

জিজ্ঞাসা করে, কৌন হ্যায় তুম্—?

লোকটা পাল্টা প্রশ্ন করে, তুম্—কৌন হো?

ম্যায় তো লাল্লু—।

লাল্লু—?

জী হাঁ—সুখলালকে বেটা—।

সুখলাল?

হ্যাঁ—তাকে জানো না—সবুজ নিশান উড়িয়ে দিলে তার গাড়ি যায়—তুম কৌন হো জী—কেয়া নাম তুমহারা—?

হামার নাম?

হ্যাঁ—।

হামারা নাম শুনকে কেয়া করো গে বেটা—?

বোলো না কেয়া নাম তুমহারা! আমার নাম ত আমি বললাম, তোমার নাম কি?

মানসিং—।

মানসিং!

হ্যাঁ—শুনা কভি হামারা নাম?

নেহিতো—?

কভি শুনা নেহি?

নেহি। তা তুমি কোথায় থাকো ?

এইখানেই—।

এইখানেই, এখানেত ঘর বাড়ি কিছু নেই।

মানসিং হাসলো, বললে, তাতে কি—এইখানেই থাকি।

তোমাকে ত আগে দেখি নি কখনো ?



কাল রাত্রে যে এসেছি—দেখবে কি করে ?

তুমিও বুঝি নিশান ওড়াও— ?

না।

তবে ?

বন্দুক চালাই—।

ঐ বন্দুক ?

হ্যাঁ—

ওতে গুলি আছে ?

হ্যাঁ—

বাচ্চা ছেলেটাকে মানসিংয়ের সত্যিই ভারী ভাল লেগে যায়।

আও না—বৈঠো ইধার—খাওতো চাপাটি।

নেহি—।

কিউ ?

আমি খেয়েছি বাবুজীর সঙ্গে—।

আচ্ছা লাল্লু—

জী।

এখানে পানি কোথায় মিলবে বলতে পার ?

হ্যাঁ—একটু আগেই ত একটা ছোট পুকুর আছে—তোমায় তিয়াস লেগেছে বুঝি মানসিং ?

হ্যাঁ—বহুৎ তিয়াস লেগেছে—এই বোতলটায় একটু পানি ভরে এনে দিতে পারো লাল্লু ?

কেন পারবো না, দাও এক দৌড়ে গিয়ে আমি পানি নিয়ে আসছি—

লাল্লু বোতলটা নিয়ে ছুটে চলে গেল।

মান সিং চেয়ে থাকে লাল্লুর গমন পথের দিকে, লাল্লু মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। মান সিংয়ের মনটা যেন হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে যায়—সেই কোন সুদূর গোয়ালিয়রের এক পল্লীতে।

চার বছরের লেড়কা নান্নু যখন, তখন সে এক রাত্রে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে। রাতের অন্ধকারে দু'এক মাস পর পরই মান সিং আত্মগোপন করে রাতের অন্ধকারে তার বাড়িতে যেতো—ঐ নান্নুকে দেখবার জন্যই একটিবার।

রাতের অন্ধকারে যেতো আবার রাতের অন্ধকারেই গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে আসতো—মহল্লার অনেক দূরে পিপুল গাছটার নীচে তার ঘোড়াটা বেঁধে রেখে যেতো, মহল্লার মধ্যে ঘোড়া নিয়ে যেতে সাহস হতো না তার।

পুলিশ সর্বত্র ডাকাত মান সিংয়ের খোঁজ করে বেড়ায়।

চার চারটে মার্ডার চার্জ তার বিরুদ্ধে, তার শিরের দাম পাঁচ হাজার টাকা।

কিন্তু আজ চার বছর প্রায় সে বাড়ি যেতে পারেনি, নান্নু এখন আট বছরটির হয়েছে, হয়ত দেখতে ঐ লাল্লুর মতই বড়-সড়টি হয়েছে।

লাল্লুকে দেখে আজ যেন সেই নান্নুর কথাটাই মনে পড়ছে ডাকাত মান সিংয়ের।

মাসখানেক আগে এক পুলিশের এনকাউন্টারে পড়েছিল মান সিং। কি করে যেন পুলিশের বড়কর্তা তার ফেরার সংবাদটা পেয়ে গিয়েছিল জংগলের মধ্যে।

একটা আর্মড ফোর্স এসে জংগলটা ঘিরে ফেলে।

গুলি চালাতে চালাতে কোনমতে সে পালিয়ে এসেছে বটে কিন্তু তার ঘোড়াটা মারা গেছে, বেচারীর পেটে গুলি লেগেছিল।

তারপর থেকেই মান সিং হাঁটতে হাঁটতে ঐ মুলুক ছেড়েই এত দূরে চলে এসেছে।

॥ ৩ ॥

মান সিং পালাবার সময় ঠিক বুঝতে পারে নি তার বাঁ পাটা জখম হয়েছিল একটা গুলিতে, হাঁটতে হাঁটতে সে পাটা যখন বেশ টন টন করছে ব্যথায় বুঝতে পারে ব্যাপার কি, পাটা বেশ ফুলেও উঠেছিল।

দিনের আলোয় বেরুতে সাহস হয় না, তাই রাতের অন্ধকারে হাঁটে—তাও পায়ের জন্য বেশী হাঁটতে পারে না। আজ দু'দিন হলো ঐ ক্যালভার্টটার নীচে এসে মান সিং আশ্রয় নিয়েছে।

জলও গতকালই ফুরিয়ে গিয়েছিল, সামান্য যে কটা চাপাটি সংগ্রহ করে ছিল কোনমতে তাও আজ শেষ হয়ে গেল।

লাল্লু বোতলটা হাতে ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো, সিংজী—এই নাও জল এনেছি।

তৃষ্ণায় মান সিংয়ের বুকটা যেন কাঠ হ'য়ে ছিল, ঢক ঢক করে এক বোতল জলই সে গলায় ঢেলে দিল।

লাল্লু অবাক্ হয়ে মান সিংয়ের তৃষ্ণা নিবারণ দেখে।

বহুৎ পিয়াস লেগেছিল তোমায় তাই না সিংজী ?

হাঁ—বেটা বহুৎ তিয়াস—

সিংজী—

বলো—

তুমি এখানে না থেকে চল না আমাদের ওখানে গুম্‌টি ঘরে, আমার বাবুজী বহুৎ আচ্ছা আদমী হ্যায়—।

নেহি বেটা।

কিউ—?

দেখো বেটা—কিসিকো মাত্‌ বোলনা আমি এখানে আছি—।

কিউ—?

মান সিং ডাকুকে দেখলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে—।

তুমি ডাকু ?

হ্যাঁ বেটা, কেন আমাকে দেখে তোমার ডাকু মনে হচ্ছে না ?

না—তুমি ঝুট্ বলছো—তুমি ডাকু নও।

মান সিং হেসে উঠে, আমি ডাকু নই—?

না—? কভি নেহি হো সেকতা—।

সত্যিই আমি একজন ডাকু লাল্লু! আমার এই শিরটার কিমতই পাঁচ হাজার রূপেয়া—।

পাঁচ হাজার রূপেয়া ?

হ্যাঁ—।

পাঁচ হাজার—কত টাকা সিংজী—?

অনেক টাকা—তুমি যদি আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারো তোমাকে সরকার পাঁচ হাজার টাকা ইনাম দেবে।

না—আমি ইনাম চাই না।

কেন?

তোমাকে আমি কখনো ধরিয়ে দেবো না।

সাচ্—?

সাচ্—।

তব তুম হামার দোস্ত—আ যাও হাত মিলাও লাল্লু সাব্—।

বিরাট সিংহের থাবার মত হাতটা প্রসারিত করে দিল মান সিং—আও মিলাও হাত—!

লাল্লু তার ছোট্ট একখানি নরম হাত বাড়িয়া দিল মান সিংয়ের দিকে, মান সিং তার সিংহের থাবার মত কর্কশ হাতে লাল্লুর হাতখানি ধরে একটু চুমো খেলো সেই হাতে, সেরা বাচ্চা দোস্ত—।

সিংজী—

কেয়া দোস্ত—?

আমি তোমার জন্য সাঁঝবেলা বাবুজী চাপাটি তৈরী করলে নিয়ে আসবো—।

নেহি নেহি দোস্ত, সাঁঝমে ইধার মাত্ আয়া করো—।

কেন?

আগর কোই মুঝে দেখ লেগা তো মুস্কিল হোগা—

কেউ দেখতে পাবে না। দাও তোমার ত পানি সব ফুরিয়ে গেল—তিয়াস লাগলে পানি পাবে কোথায়, আমি আর এক বোতল পানি এনে দিয়ে যাই—

দেও গে দোস্ত তুমে তকলিফতো নেহি হোগা।

না, না—তকলিফ্ আবার কিসের, দাও—

বিকালের পড়ন্ত আলোয় লাল্লু এলো একটা নাগাদ। চাপাটি ও কিছু সব্জী নিয়ে এসে দেখে মানসিং শুয়ে আছে চোখ বুঁজে।

সিংজী!—

মান সিং চোখ মেলে তাকাল।

তোমার জন্ত চাপাটি আর সব্‌জী এনেছি সিংজী—

রেখে যাও—তুমি আর এখানে এসো না দোস্ত আঁধার নামছে—

চাপাটি খাবে না, গরম আছে এখনো—

এখন না দোস্ত! বড্ড বখার এসেছে, বখারটা কমলে তখন খাবো।

তোমার বখার হয়েছে?

হ্যাঁ—আর দেরি করো না তুমি যাও—দোস্ত।

লাল্লু চলে গেল।

পরের দিন সকালেই আবার এলো লাল্লু।

মান সিং তখন জ্বরে অনেকটা বেহুঁসের মত হয়ে পড়ে আছে।

সিংজী—দোস্ত—ডাকল লাল্লু।

মান সিং সেই ডাকে কোনমতে চোখ মেলে তাকাল, রক্তজবার মত দুটি চোখ মান সিংয়ের লাল।

বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে দোস্ত!

লাল্লু শুধায়।

না। পানি—

লাল্লু ওয়াটার বটলটা এগিয়ে দিল—সামান্য যে জল বোতলে অবশিষ্ট ছিল তাতে পিপাসা মিটল না মান সিংয়ের। বললে, আউর থোরা পানি—

লাল্লু তখুনি ছুটে গিয়ে বোতল ভরে জল নিয়ে এলো।

তিনদিন পর জ্বর কমলো মান সিংয়ের।

সেদিন সকালে এসে দেখে মান সিং উঠে বসেছে।

দোস্ত—

আও দোস্ত—

আজ কেমন আছো দোস্ত—লাল্লু প্রশ্ন করে।

ভাল—

এই ঠাণ্ডায় তুমি এখানে থাকো তাইত জ্বর হলো।

মান সিং হাসে।

আচ্ছা দোস্ত—লাল্লু বললে।

কেয়া—বোলো—

আমাকে তোমার বন্দুকটা ছুঁড়তে শেখাবে।

কি হবে তোমার বন্দুক ছুঁড়তে শিখে—

কেন—আমিও তোমার মত ডাকু হবো।

হো হো করে হেসে ওঠে মান সিং।

ঠিক ঐ সময় ব্রিজের উপর দিয়ে একটা ট্রেন পাস্ করে যায়, তার চাকার ঘটঘটং শব্দে মান সিংয়ের হাসির শব্দটা চাপা পড়ে যায়।

তুমি হাসলে কেন দোস্ত! লাল্লু বললে।

ডাকুকে সবাই ঘেন্না করে, তুমি কখনো ডাকু হয়ো না।

তবে তুমি ডাকু হলে কেন?

আমার তগদির।

তগদির—?

হ্যাঁ—দোস্ত! আমার চাচা ডাকু ছিল—আমাদের গাঁয়ের এক শয়তান সরকারের গুপ্তচর তাকে ধরিয়ে দেয়, বেচারী তার অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছিল।

তারপর?

চাচাজী পালাতে পারল না—পুলিশ তখন সারা মহল্লা ঘিরে ফেলেছে—যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত চাচাজী প্রাণ দেয়—আমার মাথায় যেন কেমন খুন চেপে গেল—দিলাম সেই শয়তানটাকে শেষ করে, একটা ছোরা তার পেটে চালিয়ে তারপরই পালালাম।

পালালে?

হাঁ, ডাকু বনে গেলাম।

॥ ৪ ॥

সুখলালের দৃষ্টিকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারে না লাল্লু।

দুপুরে মেল ট্রেনটা পাস করিয়ে সুখলাল রাতের খাবার তৈরী করে রাখত—সুখলাল রাত্রে খেতে বসে পর পর কয়েক দিন লক্ষ্য করলো, চার পাঁচটি চাপাটি গুণতি কম।

ছেলেকে একদিন শুধায় সুখলাল, বেটা—রোজই দেখি চাপাটি চার পাঁচটা কম—এখানেত বিল্লী কুত্তা বা ভিখ্ মাগনেওয়ালা কোই চোট্টা ভি নেহি হ্যায়—তবে চাপাটি কোথায় যায়—তুমি কিছু জানো?

না তো।

একটু ইতস্ততঃ করেই বলে লাল্লু।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হয়, সুখলাল বলে—তুমি নাও চাপাটি ?

না।

তব্ কি হয় চাপাটি—?

কম হলেই বা আমি ত রাত্রে মাত্র একটা চাপাটি খাই—।

ব্যাপারটা সুখলাল লক্ষ্য করেছিল।

রাত্রে খেতে বসে একখানার বেশী চাপাটি খায় না লাল্লু—বললে বলে, তার ভূখ্ নেই—।

সুখলালের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

কিন্তু কিছু বলে না আর।

ছেলের উপরে নজর রাখবে ঠিক করে, তার ধারণা হয়েছে তখন লাল্লুই চাপাটি নেয়, কিন্তু কি করে সে রোজ রোজ চাপাটি নিয়ে ?

নানা চিন্তা তার মাথায় আসে।

সেইদিনই একটা পুলিশের জীপ এসে লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে দাঁড়াল।

জীপে দু'জন আর্মড পুলিশ ও একজন অফিসার।

অফিসারকে জীপ থেকে নামতে দেখে সুখলাল এসে তাকে সেলাম জানায়।

সেলাম সাব্।

তুমিই এই গুম্‌টি ঘরের চার্জে আছো ?

জী সাব্—।

কি নাম তোমার ?

জী—সুখলাল—।

আচ্ছা সুখলাল—

জী—

এখানে—আশে পাশে কোন আনজান—আনপড় আদমীকে দেখেছো—লম্বা চওড়া চেহারা, হাতে বন্দুক ?

নেহি তো সাব্ ঐ রকম কেউত আমার নজরে পড়েনি—।

একটু নজর রেখো।

জিউ সাব্।

আমরা খবর পেয়েছি মান সিং ডাকু এই তল্লাটে এসে কোথাও লুকিয়ে আছে।

ডাকু মান সিং?

হ্যাঁ—খবর দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা সরকারের থেকে ইনাম পাবে। বহুৎখতরনাক্ ডাকু।

ঠিক আছে সাব্—।

খবর পেলে পুলিশ চৌকীতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে।

পাশেই তখন দাঁড়িয়ে ছিল লাল্লু।

সে সব কথাই শোনে।

এই লেড়কা কে, অফিসার জিজ্ঞাসা করে।

হামার বেটা লাল্লু সাব্—।

এই বাচ্চা ইধার আও—।

লাল্লু সামনে এসে দাঁড়াল।

তুমি কোথাও—ইয়া জোয়ান, হাতে বন্দুক—কাউকে আশে পাশে এ তল্লাটে যদি দেখতে পাও সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবুজীকে বলে দেবে—সমঝা?

জী!

অফিসার জীপ হাঁকিয়ে আবার চলে গেল।

ঐ দিনই দুপুরের দিকে—

সুখলাল নজর রেখেছিল লাল্লুর দিকে। লাল্লু একটা কাগজের মোড়ক হাতে গুমটি ঘর থেকে বের হলো—তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে লাইন ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

গুমটি ঘরের পাশে একটা শ্বেত করবীর গাছ ছিল তারই আড়ালে আত্ম-গোপন করে সুখলাল সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পায়।

সুখলাল লাল্লুকে অনুসরণ করে কিছুটা ব্যবধান রেখে।

ক্যালভার্টের কাছাকাছি এসে লাল্লু নীচে নেমে গেল।

সুখলাল ব্রীজের উপর যে স্লিপারগুলো পাতা তারই ফাঁক দিয়ে নীচে দেখতে লাগল।

নীচে বন্দুক হাতে একটা লোক বসে।

তার মাথায় পাগড়ি।

লাল্লু সামনে গিয়ে দাঁড়াল মান সিংয়ের।

লাল্লু ডাকলে—সিংজী!

আও দোস্ত—।

সিংজী, আজ পুলিশের জীপ এসেছিল।

ব্যগ্র কণ্ঠে শুধায় মান সিং—কোথায়? কখন?

সকালে—

উসকে বাদ কেয়া হুয়া?

বাবুজীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল—।

সমস্ত ব্যাপারটা বলে গেল লাল্লু।

সিংজী—!

দোস্ত—!

তুমি পালিয়ে যাও, এখানে আর থেকো না।

সুখলাল ওদের কথা শুনে ও মান সিংয়ের চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিল—লোকটা আর কেউ নয় পলাতক ডাকু মান সিং।

যার খোঁজে আজ সকালে পুলিশ এসেছিল।

যার শিরের দাম পাঁচ হাজার টাকা।

একটা আধটা টাকা নয় পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা। উঃ, পাঁচ হাজার টাকা পেলে সে ত রাজা বনে যাবে—।

ক্ষেতী কিনবে, ভইষ কিনবে—।

সুখলাল সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে গুমটি ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

এক কাজ করতে পারবে সিংজী! লাল্লু বললে।

কেয়া দোস্ত—?

বাপুজী যদি জানতে পারে তুমি এখানে আছো ঠিক পুলিশকে খবর দেবে—তাই বলছিলাম একটা কাজ করতে পারবে?

জি বলো?

ঠিক সাঁঝের বেলা ডাউন কলকাতার ডাকগাড়িটা এখান দিয়ে পাস করে—আমি সেটাকে থামাবো, তুমি উঠে পড়তে পারবে ডাকগাড়িতে।

কি করে উঠবো—চলন্ত ডাকগাড়িতে উঠবো কি করে?

ডাকগাড়িকে আমি থামিয়ে দেবো ঠিক এখানে—।

তুমি থামিয়ে দেবে, হাসলো মান সিং, তুমি ডাকু গাড়িকে থামাবে কি করে?

থামিয়ে দেবো তুমি দেখো—।

কিন্তু কেমন করে—?

লাল নিশান উড়িয়ে—

লাল নিশান?

হ্যাঁ, লাল নিশান দেখলে ঠিক গাড়ি থেমে যাবে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে ডাকগাড়িতে—

পাগল!

পাগল নয় দেখো—ঠিক থামিয়ে দেবো ডাকগাড়ি, তুমি তৈরী থেকো—পারবে না উঠতে ডাকগাড়িতে?

থামলে পারবো—

ডাকগাড়ি থামবে—আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ডাকগাড়ি এখান দিয়ে যাবে—আমি চলি, তুমি তৈরী থেকো দোস্ত—কেমন?

সুখলাল লাইনের উপর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে।

তার মনের মধ্যে তখন লোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এ যে তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

সেই ভয়ানক ডাকু মান সিং পালিয়ে এখানে তারই নাগালের মধ্যে ঐ ক্যালভার্টটার নীচে এসে আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করে আছে।

যাকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার পাঁচ হাজার টাকা ইনাম দেবে।

উঃ, তার ছেলে ঐ লাল্লুটা কি বোকা!

কয়দিন ধরে তাকে রোজ গিয়ে চাপাটি খাইয়ে আসছে অথচ কথাটা একবারও তাকে জানায় নি, এমন কি পুলিশ অফিসার যখন আজই সকাল বেলা জীপে করে এসে তার কাছে খবরাখবর নিচ্ছিল ঐ ডাকাতটা সম্পর্কে তখন লাল্লুও তার পাশে দাঁড়িয়ে।

পুলিশ অফিসার ত তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু তখনো সে একটা কথা বললো না।

পুলিশ চৌকী ঐখান থেকে মাইল দেড়েকের পথ হবে।

সুখলাল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগল পুলিশ চৌকীর দিকে।

একবারও সুখলালের মনে পড়লো না—আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা লখ্‌নৌগামী আপ একস্‌প্রেস তাকে পাস করাতে হবে।

শুধু তাই নয়, ঘণ্টা আড়াই-তিন বাদেই ডাউন ক্যালকাটা মেল আসছে।

সব যেন সুখলালের মন থেকে মুছে গিয়েছে—কেবল পাঁচ হাজার টাকার আসল নোট তার চোখের সামনে কেবলই উড়ছে।

পাঁচ হাজার টাকা!

চৌকীতে যখন সে পৌঁছাল এ. এস. আই. প্রীতম ঝাঁ ডিউটিতে ছিল।

মোটাসোটা নাদুস-নুদুস চেহারা প্রীতম ঝাঁর।

চেয়ারটার উপর বসে প্রীতম ঝাঁ কোমরের চামড়ার পেটিটা খুলে হাঁ করে ঘুমাচ্ছিল—আর মধ্যে মধ্যে একটা উড়ন্ত মাছিকে তার মুখের উপর থেকে হাত নেড়ে তাড়াবার চেষ্টা করছিল।

হোজুর—

হুমড়ি খেয়ে পড়ল একেবারে হাঁপাতে হাঁপাতে সুখলাল—ডাকু—

তড়াক্ করে প্রীতম ঝাঁ লাফিয়ে উঠে—ডাকু কিধার?

হোজুর, ডাকু মান সিং—

মা-মান সিং—কি-কি কিধার? তোতলাতে থাকে প্রীতম ঝাঁ। ঠক্ ঠক্ করে প্রীতম ঝাঁর সারা শরীর তখন কাঁপছে।

জলদি চলিয়ে হোজুর, ডাকু মান সিং—।

কৌন হো তুম?

হোজুর ম্যায় সুখলাল হু—পয়েণ্টস্ ম্যান—জল্‌দি চলিয়ে হোজুর, ডাকু মান সিং—

কিধার হ্যায় ডাকু মান সিং—?

গুমটিঘর থেকে আধমাইলটাক দূরে ক্যালভার্টটার নীচে তখন বসে আছে দেখেছি, দেরী করবেন না হুজুর, তাড়াতাড়ি চলুন, সে একলাই আছে—

তোম ঠিক দেখা?

হাঁ হোজুর, ম্যায়নে আপনা আঁখোসে দেখা—দেখেই সংবাদ দিতে আপনাকে ছুটতে ছুটতে আসছি। ইয়া তাগড়া জোয়ান—ইয়া গোঁফ, শিরপর পাগড়ি, হাতোমে বন্দুক—

প্রীতম খাঁ তাড়াতাড়ি তার চৌকীর পুলিশদের ডাকল—একটা ফোনও করে দিল নিকটবর্তী থানায়, আরও পুলিশ পাঠানোর জন্য।

কিন্তু লোকটা যখন বলছে মান সিং একলাই আছে—প্রীতম খাঁ আর দেরি করে না—দলবল নিয়ে বের হয়ে পড়ে।

লাল্লু গুমটি ঘরে ফিরে এসে কোথাও তার বাপ সুখলালকে খুঁজে পায় না। বাপুজী কোথায় গেল। কিন্তু এদিকে লাল্লু তার লাল নিশানাটা খুঁজে পায় না।

কোথায় রেখেছে—কোথায় গেল সেটা—পাগলের মত লাল্লু নিশানটা খুঁজতে থাকে। হঠাৎ মনে পড়লো লাল্লুর তার বাপের নিশান দুটো সবুজ আর লাল, একপাশে একটা কালো বাক্সের উপরই ছিল।

দুটো নিশানই সে তুলে নিল হাতে।

বাপুজী গেল কোথায়—এখুনি আপ ট্রেনটা এসে পড়বে—

নিশান দুটো নিয়ে লাল্লু গুমটি ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

একটু পরেই লাল্লু দেখতে পেল আপ ট্রেনটা আসছে অথচ বাপুজীর দেখা নেই।

লাল্লুই তখন সবুজ নিশানটা হাতে গুমটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নিশানটা দোলাতে থাকে। ট্রেনটা গুমটি ঘরের সামনে দিয়ে পাস করে গেল।

ড্রাইভার ইমানুয়েল সাহেব লাল্লুর পরিচিত—সে হাত নেড়ে লাল্লুকে অভিনন্দন জানাল।

বেলা ঝিমিয়ে আসছে ক্রমশঃ।

শীতের বেলা শেষ হয়ে আসছে।

আকাশে সূর্যের শেষ ম্লান আলোর লুকোচুরি।

আর বেশী দেরী নেই ডাউন ডাকগাড়িটা আসবার।

হাতে লাল নিশানটা নিল লাল্লু।

লাল নিশান দেখালে ট্রেন থেমে যাবেই—ঠিক! বাপুজী তাকে কতদিন বলেছে, লাল নিশান দেখালে ট্রেনকে থামতেই হবে।

কিন্তু তার বাপুজী সুখলাল কোথায় গেল? তাকে দেখছে না কেন লাল্লু?

যাক—ভালই হলো—বাপুজী থাকলে হয়ত তাকে বাধা দিত, সিংজী—তার

দোস্ত পালাতে পারত না। কিন্তু ট্রেনটাকে থামাতে হবে ঠিক ক্যালভার্টটার কাছাকাছি—যাতে করে সিংজী ডাকগাড়ীতে উঠে পড়তে পারে।

গুমটিঘর ছেড়ে এগিয়ে চললো স্লিপারের উপরে পা ফেলে ফেলে লাল্লু ক্যালভার্টটার দিকে। ক্যালভার্টটার হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল লাল্লু। হাতে লাল সবুজ নিশান।

ঐ—ঐ ডাকগাড়ী আসছে—দূরে আবছা দেখা যায়—বিরাট লৌহদানব ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে—লাল্লু একেবারে লাল নিশানটা হাতে লাইনের মাঝখানে দাঁড়ালো।

প্রাণপণে হাত তুলিয়ে লাল নিশানটা ওড়াতে লাগল।

ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ডাকগাড়িটা ক্রমশঃ কাছে—আরো কাছে।

লাল্লু নিশান ওড়াতে থাকে।

ততক্ষণে সুখলাল প্রীতম ঝাঁকে নিয়ে গুমটিঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে—।

প্রীতম ঝাঁ শুধায়, কিধার হ্যায় সে ডাকু?

চলিয়ে হুজুর, সামনে ক্যালভার্টটার নীচে—

কিন্তু দলবল নিয়ে উত্তেজনার মুখে এগুতে গিয়ে হঠাৎ সুখলালের নজরে পড়ে—দূরে লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে লাল্লু লাল নিশান উড়াচ্ছে।

একি—লাল্লু লাল নিশান উড়াচ্ছে কেন, ডাকগাড়ির গতি থেমে আসছে—

পাগলের মত ছুটতে থাকে সুখলাল লাইনের উপর দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে, লাল্লু—এ লাল্লু—লাল্লু নিশান মাত্ দেখাও—ডাকগাড়ি রুখ্ যায়গি—লাল্লু—লাল্লু—

গাড়ি ততক্ষণে থেমে গিয়েছে।

ইঞ্জিন ড্রাইভার মুখ বের করে উগ্র কণ্ঠে চীৎকার করে শুধায়, এ কেয়া হ্যায়, গাড়ি রুখ দিয়া কিউ—? কৌন হ্যায় তুম—?

মান সিং কিন্তু ঐ সামান্য সময়ের মধ্যেই গাড়ি মন্থরগতিতে থামার মুখে ট্রেনের একটা কামরায় উঠে আত্মগোপন করেছে।

সুখলাল ছুটে এসে লাল্লুর গালে বিরাট একটা চড় বসিয়ে দিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, ইয়ে তুম্‌নে কেয়া কিয়া,—ডাকগাড়ি রুখ দিয়া কিউ?

প্রীতম ঝাঁ হাঁপাতে হাঁপাতে ভুঁড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়, কেয়া বাত হ্যায় ?

লাল্লু নীরব।

ছেলের হাত থেকে সবুজ নিশানটা ছিনিয়ে নিয়ে সুখলাল বললে ড্রাইভারকে, এ বাচ্চাকা কসুর মাফি কিদিজিয়ে ড্রাইভার সাব !

সুখলাল সবুজ নিশানটা উড়িয়ে ছাড়বার সংকেত জানায়।

গাড়ি আবার ছেড়ে দিল।

প্রীতম ঝাঁ এবার সুখলালের দিকে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে বলে, কিধার হ্যায় ও ডাকু ?

চিল্লাইয়ে মাত সাব—ঐ কালভার্টকা নীচে—

সকলে কালভার্টটার নীচে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো, যে যার বন্দুক হাতে দশ বারজন সেপাই—বন্দুক বাগিয়ে তারা পা টিপে টিপে এগুতে থাকে।

বহুত খতরনাক ডাকু, ওকে বিশ্বাস নেই—প্রীতম ঝাঁর বুকের মধ্যে কাঁপছে।

লাল্লু পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

কিন্তু কোথায় ডাকু মান সিং।

ক্যালভার্টটার নীচে কেউ নেই।

চারিদিক তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

প্রীতম ঝাঁ রুখে ওঠে এবারে সুখলালকে, কিধার হ্যায় তোম্‌হারা ডাকু—এ কেয়া দিল্লিগী হ্যায ?

সাব—বিশ্বোয়াস করিযে আমি নিজের চোখে মান সিং ডাকুকে দেখেই তবে—

ঠাস্‌ করে একটা চড় কষিযে দিলে প্রীতম ঝাঁ সুখলালের গালে,—খামোশ—ডাকুকে বাচ্চে— !

লাল্লু হঠাৎ ঐ সময় বলে উঠলো,—ঠারিয়ে মাত মারিযে হামারা বাপুজীকো—বাপুজীনে সাচ্‌ই কহা থা—

রক্ত চক্ষে তাকাল প্রীতম ঝাঁ লাল্লুর দিকে, এই লৌণ্ডে—

হ্যাঁ—সাচ মান সিং চলা গিয়া—আমিই তাকে পালাবার পথ বলে দিয়েছি—।

কিধার—কিধার গিয়া ও ডাকু ?

প্রীতম ঝাঁ লাল্লুর একটা হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, কিধার গিয়ে বোল—

নেহি—নেহি—

ঠাস্ ঠাস্ করে চড়াতে থাকে প্রীতম ঝাঁ লাল্লুর এ গালে ও গালে যেন পাগলের মতই আর চেঁচাতে থাকে, বোল—বোল—

নেহি—

বোলেগা নেহি!

নেহি—নেহি—নেহি—

ক্রোধে অন্ধ হয়ে এক লাথি দিয়ে লাল্লুকে ফেলে দিল প্রীতম ঝাঁ—

লাল্লু গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে—মারের চোটে, তার মুখ কেটে রক্ত ঝরতে থাকে।

লাল্লু তখনো বলে চলেছে, নেহি—নেহি—নেহি—

খোকন যাবে চাঁদে

শ্রী প্রদোষ দত্ত

খোকন দুধ খায় না,
ধরেছে এক বায়না—

সে দেবেই চাঁদে পাড়ি,
মায়ের সঙ্গে আড়ি।
মেঘের সঙ্গে লড়ে
রকেট ভেলায় চড়ে,
ইয়াঙ্কি তিন ছেলে,
আকাশ বাতাস ঠেলে
গিয়েছে চাঁদের দেশে,
রঙীন স্বপন মেশে।
সে যাবেই উড়ে উড়ে,
হাওয়ার পিঠে চড়ে।

মেঘের পাহাড় ভেঙ্গে,
রামধনু-রঙ রেঙে।
চরকা-বুড়ির কাছে,
তার চাঁদা মামা আছে।
করবে আদর তারে,
সে ডরায় নাকো কারে!
হঠাৎ খোকন দেখে,
দুধের গেলাস রেখে—
চাঁদের পাহাড় টলে,
'দুধ খাও' মা বলে।

মধুর আনন্দে

শ্রী শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য

পাখীরা কাকলী শেষে ঘরে ফিরে এলে
সূর্যরোদ দিন শেষে ছায়া হয়ে গেলে
মায়াময় রাত নামে গাছের শাখায়
হিমে মোড়া বাতাসের ক্লান্ত পাখায়।
শান্ত মুখ শান্ত ছবি ফুলের বাহারে
যতদূরে চোখ যায় কি মধুর আহারে!
আনন্দ-আনন্দ দেখো ছড়ানো হেথায়
রূপ রং রসময় কানন যেথায়।
কিশোর বালক ঐ ফিরে ফিরে চায়
শূন্যাকাশে নীলে ভরা নক্ষত্রের পানে—
বেল যুঁই গন্ধরাজ আকাশী মায়ায়
হেথা-হোথা মনে মনে সুগন্ধ হানে।

কবিতার ওপরে ছড়া

শ্রী নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

হাতুড়িটা আন্ দেখি,
ছ'ঘা দিই মগজে।
লিখব যে কবিতা
মেপে মেপে ছ'গজে
গালভরা ফাঁকা কথা,
এলোমেলো ছন্দ—
রাজনীতি, দুর্নীতি,
ভায়ে-ভায়ে দ্বন্দ্ব।

চাল নেই, ডাল নেই,
নেই ঘুঁটে কয়লা,
জীবনের সবখানে
স্তূপীকৃত ময়লা।
যাক্ বাবা,—মিলে গেছে
হয়ে গেছে পদ্য—
লেখা শেষ ক'রে দেখি,
এ যে খাঁটি গদ্য।

ছোটবাবু

শ্রী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়



সঙ্গিতার মায়ের কথা মনে পড়ে না। মানুষ হয়েছে বাবার কাছে। সঙ্গিতা, তার বাবা আর দাদা, এই ছিল বাড়ীর মেম্বার। বাবা ডাক্তার, সঙ্গী বলতে বাবা আর দাদা। ফ্রক পরতে ভীষণ লজ্জা, দাদার মতই সার্ট প্যান্ট পরে। ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, রণ-পায়ে উঠে চলা এসব ওর দারুণ প্রিয় খেলা। পোষাকী নাম সঙ্গিতা হলেও, ওকে সকলে ছোটবাবু বলে ডাকতো। অনেকেই জানতো যে ডাঃ চৌধুরীর এক ছেলে নয়, দুই ছেলে।

প্রতিদিনের মত সেদিনেও সঙ্গিতা বসে আছে ডিস্‌পেন্সারিতে। রাত সাড়ে ন'টা বেজেছে। এমন সময়ে এক ভদ্রলোক এসে বলল—"ডাক্তার বাবু, আমার স্ত্রীর ভীষণ অসুখ, আপনি চলুন।" সঙ্গিতার বাবা ডাঃ শিবশঙ্কর চৌধুরী বললেন—"আমি রাত ন'টার পর বাইরের কলে যাই না।" কিন্তু ভদ্রলোক কোন কথা শুনতে চান না। বললেন, "আপনি না গেলে আমার স্ত্রী বাঁচবে না," বলে কেঁদে ফেললেন, অগত্য ডাঃ চৌধুরী যেতে রাজি হলেন। সঙ্গিতা বাবাকে একেলা যেতে দিলো না। ও সঙ্গে গেল।

শীতের রাত্রি চারিদিক নিঝুম। যশোর রোড ধরে মোটর ছুটে চলেছে। সঙ্গিতা বাবার পাশে বসে আছে। পরণে প্যান্ট, গায়ে সার্টের ওপর লোম ওয়ালা জাম্‌পার। মোটর শহরতলীর রাস্তা দিয়ে চলল। একপাশে নদী, অন্য পাশে খড়ের বাড়ী। ঝোপঝাড়। বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে ভদ্রলোকের নির্দেশে মোটব এবার রাস্তা ছেড়ে কাঁচা মাঠে নামলো, সেই মাঠ পেরিয়ে একটা আধুনিক স্টাইলে তৈরী গেটওয়ালা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। দু'জন উর্দিপরা লোক গেট খুলে দিল। গাড়ী ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক বলল, "এসে গেছেন, শীগ্‌গির ওপরে চলুন, পেসেণ্টের অবস্থা ভালো নয়।" মোজেক ফ্লোর, চওড়া সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির শেষ হল, তার পাশে পাশে ঘর। দু'তিনটি দরজা পেরিয়ে একটি ঘর। মাঝখানে অতি আধুনিক ডিজাইনের ডানলোপিলোর গদিআঁটা খাট। হাল্কা নীল আলো জ্বলছে। বাবার সঙ্গে এগিয়ে গেল ছোটবাবু। সার্টিনের

লেপ গায়ে শুয়ে আছে একটি ছেলে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে একবিন্দু রক্ত নেই। ডাঃ চৌধুরী বললেন—"আপনার স্ত্রীর অসুখ বলেছিলেন না!" ভদ্রলোক হেসে বললেন—"হ্যাঁ স্ত্রীরও অসুখ, আর এও অসুস্থ। আপনি একে আগে দেখুন।" ভদ্রলোক লেপটা ওর গা থেকে তুলে নিল। ছোটবাবু আর ডাঃ চৌধুরী চমকে পিছিয়ে এলেন, ছেলেটির বুকের কাছে চাপ চাপ রক্ত জমে আছে, বিছানার চাদরেও রক্ত জমে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কিছু তাজা রক্ত গড়িয়ে আসছে। ডাঃ চৌধুরী বললেন—"একি এ যে সাংঘাতিক কাণ্ড। আপনিই কেন এই মারাত্মক রোগীকে ঘরে রেখেছেন? হসপিটালে দেন নি কেন?"

ভদ্রলোক খুব শান্ত গলায় বলল—"হসপিটালে দিলে পুলিস কেস হবে।" "নিশ্চয়ই পুলিস কেস হবে। আপনার আত্মীয়কে যারা খুন করতে চেয়েছিল তাদের আপনি শাস্তি দেবার চেষ্টা করবেন না?" ভদ্রলোক খুব কঠিন গলায় বলল—"আমি কি করব না করব সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দেব না। আপনি আপনার ডিউটি করুন। পেসেণ্টের অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছেন, কি করে একে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করুন।" ডাঃ চৌধুরী বললেন—"না, আমার প্রশ্নের জবাব না পেলে, সে চেষ্টা করব না। কারণ আমি বুঝতে পারছি আপনার উদ্দেশ্য সৎ নয়। একে এই মুহূর্তে অপারেশন থিয়েটারে নিতে হবে, হসপিটাল ছাড়া কোথায় ও, টি, পাওয়া যাবে?" "ও, টি, মানে অপারেশন থিয়েটার এই বাড়ীতেই আছে!" 'তাহলে ডাক্তারও আছে নিশ্চয়ই? আপনি তাকে দিয়েই অপারেশন করান। আমার পক্ষে এখানে অপারেশন করা সম্ভব নয়।"

"ডাঃ চৌধুরী, আপনার ছেলেটিকে সঙ্গে এনে ভালই করেছেন। যদি এই পেসেণ্টকে অপারেশন না করেন তাহলে আপনার ছেলের অবস্থাও ঐ ছেলেটির মত হবে।" এই কথা বলে লোকটি ছোটবাবুর দিকে রিভলবার উঁচু করে ধরল। সঙ্গিতা মানে ছোটবাবু ভয়ে বাবার কাছে সরে এলো। দাঁতে দাঁত চেপে ডাঃ চৌধুরী বললেন—"বেশ, আমি রাজি, চলুন কোথা যেতে হবে।" দু'জন বিহারী ষণ্ডামার্কা লোক স্ট্রেচারে করে ছেলেটাকে নিয়ে গেল অন্য দরজা দিয়ে। লোকটা বলল—"আসুন আমাদের সঙ্গে।"

ছোটবাবু একলা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ওর বাঁ পাশের দরজায় খসখস শব্দ হল, তাকিয়ে দেখে ভেল্‌ভেটের দামী পর্দার পাশ থেকে একটি হাত ওকে ইশারায় ডাকল। ছোটবাবু এগিয়ে গেল। দেখল একটি মহিলা পরণে লাল পাড় শাড়ী,

কপালে সিঁদুরের টিপ, কেমন যেন মা মা চেহারা। ফিস্‌ফিস গলায় বলল—"ডাক্তার বাবু বুঝি তোমার বাবা?" ছোটবাবু মাথা নেড়ে সায় দিল। মহিলা বলল—"এরা ভয়ঙ্কর লোক। তোমার বাবা ঐ রোগীকে ভালো করে তুললেও তোমাদের ছাড়বে না। এখান থেকে তোমাকে পালাতে হবে, তুমি কি সাইকেল চালাতে পারো?"

"হাঁ পারি কিন্তু সাইকেল কেন? আমাদের মোটর এবং ড্রাইভার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।" মহিলা হাসলো, বলল "তুমি আমার সঙ্গে এসো।" অন্ধকার সরু এক বারান্দা দিয়ে মহিলা এগিয়ে চললো, নিঃশব্দে কিছুদূর চলার পরে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো বাগানে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, মহিলা ওর হাত ধরে নিয়ে চলছে। একটা ঝোপ পেরিয়ে এসে মহিলা বলবে—"ঐ যে গাছের পাশে একখানা ঘর দেখতে পাচ্ছ, ঐখানে তোমাদের গাড়ীটাকে আর ড্রাইভারকে বন্ধ করে রেখেছে। সব দরজা জানালা লক করে ইঞ্জিন স্টার্ট করে রেখেছে, একটু পরেই ড্রাইভার মারা পড়বে। তুমি কি সহরে গিয়ে পুলিসে খবর দিতে পারবে? আমি তোমাকে সাইকেলটা দিতে পারি।" ছোটবাবু প্রশ্ন করল "গ্যারেজ কি খোলা যায় না?"

"না, চাবি আমার কাছে নেই। তবে তুমি যদি জানালা গলে ঢুকতে পারো তাতে অন্ততঃ ড্রাইভারকে তুমি বাঁচাতে পারবে।" একটা কাঁটা দিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে মহিলা জানালাটা খুলে ফেলল। ছোটবাবু জানালা বেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পেট্রলের গন্ধে ওর দম বন্ধ হয়ে এল। গ্যারেজের মধ্যে রেঞ্চ ছিল সেটা দিয়ে উইণ্ডো গ্লাশ ভেঙ্গে ফেলে দরজা খুলে ফেলল। ভেতরে বসে এ্যাক্‌সিলেটরে দারুণ চাপ দিয়ে আশী মাইলে স্পীড তুলে এগিয়ে গেল কাঠের বন্ধ গেটের ওপর। গাড়ীর সেই প্রচণ্ড গতির ধাক্কায় গেট ভেঙ্গে পড়ল আর গাড়ী ছুটে চলল বিদ্যুৎগতিতে। ছোটবাবু তার শেষ শক্তি দিয়ে ষ্টিয়ারিং চেপে ধরে মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠে পড়ল গাড়ী নিয়ে। সরু প্রায় খালের মত নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা, ওর হাত কাঁপতে লাগল।

ওদিকে বাড়ীর মধ্যে ডাঃ চৌধুরী অপারেশন টেবিলে অপারেশন করে চলেছেন। কিছুরই অভাব নেই। অক্সিজেন সিলিণ্ডার, ব্ল্যাডের বোতল, নাইফ, সিজারস্‌, ফরসেপ, ক্লোরাফর্মের হুড, টপ-লাইট এবং স্বয়ং মালিক অ্যাসিস্‌টেন্টের কাজ করছে। দেখে মনে হয় ও নিজে ডাক্তার। ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে চারজন ষাণ্ডামার্কা লোক। কখন কি দরকার হয়

তার জন্যে। ছোটবাবুর মত একটা ছোট ছেলে কোথায় কি করছে সে খবর রাখার প্রয়োজন মনে করেনি এরা। কারণ বাড়ীর সামনেও পাহারা আছে।

খোলা হাওয়া ও গাড়ীর ঝাঁকানিতে ড্রাইভারের জ্ঞান ফিরে এল। রঘুবীর উঠে বসে অবাক হয়ে বলে—"একী! তুমি গাড়ী চালাচ্ছ কেন, ছোটবাবু?" "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ক্ষমতা আমার নেই। স্টিয়ারিং ধরো, আমার হাত কাঁপছে।" রঘুবীর স্টিয়ারিং ধরে বলল—"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" "জোরে গাড়ী চালাও, থানায় চলো।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওরা থানায় এসে পৌছাল। সঞ্চিতা ছুটে গেল অফিসারের কাছে। সব কথা বলে ওদের কাছে সাহায্য চাইল। ইন্সপেক্টর পুলিস-ফোর্স নিয়ে জীপে করে ওদের সঙ্গে রওনা দিল। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওরা সেই বাড়ীটার কাছাকাছি এসে পড়ল। ছোটবাবু বলল—"বাড়ীর সামনের দিকে লোকজন আছে। আমরা পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকব।"

ওরা একটি ঝোপের মধ্যে জীপ রেখে পেছনের দরজার দিকে এগুতে লাগল। অন্ধকারে ওদের দৃষ্টি চলে না, ঠিক করতে পারছে না কোনখান দিয়ে এগুলে লোহার সিঁড়ির কাছে পৌছাতে পারবে। হঠাৎ ঝোপের পাশ থেকে কে যেন ছোটবাবুকে টেনে ধরল। ও দেখল সেই মহিলা। মহিলা বলল—"এইদিকে এসো।"

ইন্সপেক্টর সেন্ট্রিদের বাড়ী ঘেরাও করার নির্দেশ দিয়ে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন। মহিলা বলল—"এখনও অপারেশন চলছে, এখন ওদের এ্যারেস্ট করলে রোগী মারা যেতে পারে। একটু অপেক্ষা করুন। অপারেশন শেষ হলে আমি ইশারা করব।"

কিছুক্ষণ পরে মহিলা ডাকল। ডাঃ চৌধুরী অপারেশন শেষ করে বেসিনে হাত ধুচ্ছেন, বাড়ীর মালিক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, নার্স জলের খোল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ঠিক সেই সময়ে ইন্সপেক্টর রিভলবার ধরে বললেন—"হ্যাণ্ডস আপ্।" তিন চারজন সেন্ট্রি নার্স, আরদালি, বেয়ারাদের ঘিরে ফেলল।

মালিক হাত তুলে দাঁড়াল। সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল—"ওঃ তুমি—! তুমিই তাহলে পুলিসে খবর দিয়েছিলে! বেইমান তোমাদের রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলাম, তোমার মেয়েকে নার্সিং শিখিয়ে স্বাবলম্বী

করে দিলাম এবং এখনও তোমাদের ভরণ-পোষণের সব খরচ আমি চালাচ্ছি, তারই প্রতিদান দিলে তুমি !"

"থামুন, ওসব কথা কোর্টে গিয়ে বলবেন, এখন চলুন থানায় ।"

থানায় যাওয়ার পরে ও. সি সেই মহিলাকে বললেন—"দেখুন, আপনার সাহায্য না পেলে আমরা এদের ধরতে পারতাম না। এখন বলুন এরা কারা এবং এদের উদ্দেশ্য কি।"

মহিলা বললেন—"আমরা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসি। ক্যাম্পে ছিলাম, সেখানে এই ভদ্রলোক আমাদের বললেন—উনি তার বাড়ীতে আমাকে কাজ দিতে পারেন এবং আমার মেয়েকে নার্সিং শিখিয়ে চাকরি দেবেন। উনি রিলিফের ডাক্তার বলে আমাকে পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর ওর বাড়ী এসে বুঝতে পারলাম কি ভয়ঙ্কর লোক ও! মেয়েকে নার্সিং শিখিয়ে ওর সহকারী হিসাবে কাজও দিয়েছিলেন। সাংঘাতিক কাজ! ওর মাইনে-করা গুণ্ডারা সহরের ধনীর ছেলেদের ধরে এনে, তাদের বাবার কাছে মোটা টাকা নিয়ে ফেরৎ পাঠাত। বাবা টাকা না দিলে ছেলেদের যে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হয় তা আপনারা দেখতে পেলেন। এই ছেলেটির বাবা দু-একদিনের মধ্যে টাকা নিয়ে আসবে কথা ছিল। কিন্তু আজ ছেলেটি পালাবার চেষ্টা করলে ওই লোকটা তাকে গুলি করে। গুলিটা ও'র পাজরে লাগে। অনেকগুলি টাকা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ডাক্তাব চৌধুরীকে এনেছিল চিকিৎসার জন্যে। কারণ লোকটা ডাক্তার হলেও অপারেশন করতে পারে না। বাড়ীতে নার্সিং-হোম করে রেখেছে। আমার ক্ষমতা ছিল না ওকে ধরিয়ে দেবার, আমাদের এরা বন্দী করে বেখেছিল। ছোটবাবু ছোটছেলে হয়েও যে সাহসের পরিচয় দিলে তাতে, ওকেই ধন্যবাদ দেওয়া দরকার, আমাকে নয়।"

ছোটবাবুর পিঠ চাপড়ে আদর করলেন ও. সি.।

ডাঃ চৌধুরী বললেন—"ভুল হল, ও ছেলে নয়, আমার মেয়ে।"

অবাক হয়ে ও. সি. বললেন "তাই নাকি !" তারপর হো-হো করে হেসে বললেন—"ছোট্ট খুকু, তুমি আমার মত দুঁদে দারোগাকে বোকা বানিয়ে ছাড়লে।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রী সুলতা সেনগুপ্ত

শারদ সূর্য বিদ্যাসাগর, চরণ যুগলে করি প্রণতি
শুভ্র তোমার হৃদয়-পদ্মে আসন পাতেন সরস্বতী।
বঙ্গবাণীর কাননে-কাননে ঝরালে গন্ধপুষ্প বৃষ্টি,
দৃঢ়কল্যাণ হস্তে ছড়ালে ভারত সমাজে নবীন কৃষ্টি।
কর্ম-জগৎ বিস্ময়ে হেরে, ক্লান্তি শূন্য মহান্ কর্মী
শত্রুরে বাঁধো স্নেহালিঙ্গনে, চির নির্ভীক বিবেক ধর্মী।
বক্রদৃষ্টি পণ্ডিতজন কর্মে তোমার করিল হাস্য ?
সে যে এক নব শ্রদ্ধার ধারা, সে যে এক পূজা অবিশ্বাস্য।
বন্ধ নয়ন খুলিল আলোকে—পরিচয় হোল বর্ণে-বর্ণে।
বিধুরা কিশোরী আবার গরবে সাজিল শঙ্খে, সিঁদুরে, স্বর্ণে।
পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠায় দুঃখী পিতার ঘুচালে শ্রান্তি,
আদর্শে তাঁর সম্মান রাখি শঙ্কিত মনে দিয়েছ শান্তি।
খর-তরঙ্গ অঙ্গে ধরেছ, উজ্জ্বল তব মাতৃভক্তি।
দীন-বান্ধব দাতা হে, তোমার স্বার্থে অর্থে নাহি আসক্তি।
সর্বকালের মহা গৌরব, চরণে আমরা করি প্রণতি
পবিত্র তব মানস-কমলে আসন পাতেন সরস্বতী।

সত্যি না মিথ্যে

শ্রী পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

তাল-পুকুরে রাত-দুপুরে ছেলে ..ড়ায় কোরাস গায়,
সাঁতরাগাছির ছ্যাকড়া গাড়ী পুজোয় নাকি দিল্লী যায় ?
আরামবাগে কতোই আরাম কয় নিধিরাম জোয়ারদার,
বাঁকুড়া জেলায় শ্যাকরাগুলো সোনায় তৈরী করে পাহাড়
সত্যি কিনা এসব খবর চল না দেখি চোখটা খুলে,
বুঝবো তবে নিধিরামের মগজ ভরা আজব গুলে!



তারিণীদার বাঘ শিকার

শ্রী কুঞ্জবিহারী পাল

বলছিলাম তারিণীদার কথা। তোমাদের অনেকেরই তারিণীদার কথা মনে আছে। সেই যে আমাদের আফিসের বড়বাবু তারিণীচরণ চক্রবর্তী। সেকালের সরকারী আপিসের বড়বাবু হওয়া তো সামান্য কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে সাহেবী আমলের একটা আফিস, যার বড়কর্তা, মেজকর্তা সবই খাস বিলাতী সাহেব, সে-সব আফিসের বড়বাবুরাই ছিলেন প্রকৃত কর্তাব্যক্তি। আফিসের কর্মচারীরা বড়বাবুদের যমের মত ভয় করত। তাঁদের কলমের একটি খোঁচায় যে-কোনো কর্মচারীর ইহকাল পরকাল সবই ভেস্তে যেতে পারত।

সরকারী আফিসের বড়বাবুদের একটি মোক্ষম অস্ত্র ছিল সি. সি. আর,—কনফিডেনসিয়াল ক্যারেকটার রোল। বছরের শেষে একবার করে বড়বাবু কর্মচারীদের সম্বন্ধে একটি গোপনীয় রিপোর্ট পাঠাতেন বড় সাহেবের কাছে। কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নির্ভর করত এই রিপোর্টের উপর। তাদের পদোন্নতি, বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি, সবকিছুই নির্ধারিত হত এই রিপোর্টের ভিত্তিতে। কাজেই বড়বাবুদের সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হত, কখনো কদাচিৎ কোন কর্মচারী যদি ভুলে বড়বাবুর মুখের ওপর জবাব দেওয়ার দুঃসাহস দেখাত তবে বড়বাবুর মুখের একটি কথা, 'সি. সি. আরের বেলা দেখে নেবো' শুনলেই সে চুপসে যেত।

যাক সে কথা। বলছিলাম তারিণীদার কথা।

সেকালে সরকারী আফিসে বড়দিন এবং ইংরেজী নববর্ষে একটানা কয়েকদিন ছুটি থাকত। খাস বিলাতী সাহেবরা এবং তাদের এদেশীয় পোষ্যরা সে ক'টা দিন আমোদ-স্ফূর্তির জোয়ার বইয়ে দিত।

সেবার বড়দিনের ছুটিতে আমাদের আফিসের বড়সাহেবের সাধ হল তিনি সুন্দরবনের ব্যাঘ্র শিকারে যাবেন। তিনি জানেন তারিণীদার বাড়ী সুন্দরবন অঞ্চলে। কাজেই—

সুন্দরবনের মানুষ তারিণীদা। বাঘের সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয় থাকার

কথা। কিন্তু সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার তিনি দেখেছেন শুধু জু-গার্ডেনে। সাহেবকে তো আর এ-সব কথা বলা যায় না!

ছুটির আগের দিন বড় সাহেব তারিণীদাকে ডেকে বললেন, বড়বাবু, গেট্ ইওরসেল্‌ফ্ রেডি টু অ্যাকম্প্যানি আস টু দি সুন্দরবন ডে আফটার টু-মরো। তোমার সঙ্গে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পরিচয় আছে। তোমার সাহায্যে ওদের দু-একটা ধরে নিয়ে আসতে চাই আমি।

মুখে 'না' বলা অসম্ভব। তারিণীদা একগাল হেসে বললেন, মাই ফরটিন ফাদারস্ লাক, স্যার। আই গো উইথ ইউ গ্লাডলি।

মুখে যাই বলুন না তারিণীদার অবস্থা কাহিল। মনে মনে সাহেবের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করলেন। কেন রে বাপু, বড়দিনের ছুটি, আমোদ-স্ফূর্তি কর না; তা না, বাঘ ধরতে যাবেন উনি সুন্দরবনে। শেষ পর্যন্ত বাঘকে না ধরে—বাঘের পেটেই না চলে যান।

খাওয়া ঘুম বন্ধ হয়ে গেল তারিণীদার। পরের দিন ছুটলেন ধপ্‌ধপি। ওখানকার বাবা দক্ষিণরায় বড় জাগ্রত দেবতা। ভালো করে পূজো দিলেন। পূজোর ফুল বেলপাতা সযত্নে বেঁধে রাখলেন নিজের কাছে। বাবার কৃপায় ভালোয় ভালোয় সুন্দরবন থেকে ফিরে আসতে পারলে আবার পূজো দিতে হবে বাবার থানে।

যথাদিনে সাহেবের সঙ্গে লঞ্চে চাপলেন তারিণীদা। যাবার আগে বাড়ীর সবাইএর কাছ থেকে বিদায় নিলেন, ভাবখানা তিনি যেন চিরবিদায়ই নিচ্ছেন এ সংসার থেকে।

সাহেবের সঙ্গে আরও কয়েক জোড়া সাহেবমেম সুন্দরবন ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন। তারিণীদার অবস্থা রীতিমত কাহিল। সর্বক্ষণ তিনি ইষ্টনাম জপ করেন, দক্ষিণরায়ের পূজোর প্রসাদী ফুল কপালে ঠেকান। লঞ্চের নিচের তলাকার এক কোণায় তাঁর স্থান হয়েছে। খাদ্য তাঁর চিঁড়া, গুড় এবং নারকোল। যাতে জাতধর্মটা তাঁর বাঁচে তারই জন্যে এ ব্যবস্থা। চিঁড়া ভেজানো হয় পবিত্র গঙ্গাজলে, লঞ্চটাও চলেছে গঙ্গার ওপর দিয়ে।

ভালোয় ভালোয় সাহেবের লঞ্চ পৌঁছে গেল সুন্দরবন অঞ্চলে। এখনো গভীর বন সুরু হয়নি। এখানকার এক গ্রাম থেকে জোগাড় করা হল বাছা-বাছা জনা কুড়ি যোয়ান লোক। এদের কাজ হবে লাঠিসড়কি নিয়ে বাঘ তাড়িয়ে সুবিধেমত জায়গায় এনে ফেলা। বড় সাহেব বন্দুক হাতে সেখানেই

থাকবেন। তারিণীদাও অবশ্য সাহেবের পাশে থাকবেন। ভয়ের কিছু নেই, কারণ তাঁর হাতেও বন্দুক থাকবে। অন্যান্য সাহেবমেমরা লঞ্চেই বিশ্রাম করবেন।

বেচারী তারিণীদা। তিনি চেয়েছিলেন বাঘের সম্মুখীন না হতে। কিন্তু সাহেব কি সে কথা শুনবার পাত্র। তিনি বলেন, হাউ ক্যান ইট বি ? ইউ বিলঙ টু সুন্দরবন। ইউ মুড নো টাইগারস বেটার। এর ওপর আর কথা চলে না।

সব ব্যবস্থাদি পাকা করা হল। সেদিন ব্রেকফাস্ট সেরে উপযুক্ত পোষাক-টোষাক পরে বড়সাহেব বন্দুক হাতে প্রস্তুত। তারিণীদাকেও শিকারের উপযোগী পোষাক পরতে হল। শক্ত করে মালকোচা মেরে ধুতির ভেতরে সার্ট গুঁজে দেওয়া হল ভাল করে। বন্দুকও একটা হাতে নিতে হল। বাপদাদার বয়সে বন্দুক হাতে নিয়ে দেখেন নি তারিণীদা। সাহেব অবশ্য বন্দুক ছুঁড়বার কায়দাকানুন শিখিয়ে দিলেন।

অগত্যা বন্দুক হাতে এগিয়ে যেতে হল তারিণীদাকে। বুক পকেটে হাত দিয়ে একবার পরখ করে দেখলেন বাবা দক্ষিণরায়ের পুজোর ফুল বেলপাতা ঠিক আছে কিনা। একমাত্র ভরসা যা দক্ষিণরায় !

কিছু সময় পরেই নির্দিষ্টস্থানে হাজির হলেন তারিণীদা ও বড়সাহেব। গভীর জঙ্গলের মধ্যে জায়গাটা কিছুটা ফাঁকা। তিন দিকে গভীর বন। এখানে একটা কেঁওড়া গাছের তলায় সাহেব এবং তারিণীদা বন্দুক রেডি করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বাঘকে বন্দী করে রাখবার জন্যে দুটি কাঠের খাঁচা তৈরী করা হয়েছিল। আগে থেকেই খাঁচা দুটি কাছাকাছি খুলে রাখা হয়েছে।

দূরে লোকজনদের চীৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। ওরা সম্ভবতঃ বাঘ তাড়িয়ে নিয়ে এদিক পানেই আসছে।

এদিকে এক বাঘিনী তার দুটি বাচ্চা নিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। বাঘেরা দিনের বেলা ঘুমোয়, রাতের বেলা শিকার সন্ধানে বেরোয়। বাচ্চা দুটি খেলা করছিল, লোকজনের চীৎকারে বাঘিনীর কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সে চোখ খুলে আড়মোড়া ভাঙ্গল একবার। তারপর ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। বাচ্চা দুটিকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব ও তারিণীদা যে গাছটার নিচে রয়েছেন সেদিকেই গুটি গুটি রওনা দিল। কয়েক পা এগিয়ে

তার চোখে পড়ল দুটি আজব জীব দাঁড়িয়ে রয়েছে উল্টোদিকে মুখ করে। বাঘিনী আরও খানিকটা এগিয়ে এসে হালুম করে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে পড়ল একেবারে তারিণীদার সামনে।

ব্যাপারটা ভাল করে বুঝবার আগেই তারিণীদার মুখ থেকে ফস্ করে বেরিয়ে গেল, বড় বাড় বেড়েচ দেখছি। সি. সি. আর খারাপ করে দেব।

আশ্চর্যকাণ্ড মুহূর্তমধ্যে বাঘিনী বেচারীর মাথা নত হয়ে গেল। লেজ গুটিয়ে সে বসে পড়ল তারিণীদার সামনে। বাচ্চা দুটো এসে ভেজা বেড়ালের মত বসে পড়ল মায়ের কোলের কাছটিতে। বাঘিনীর মুখে রা'টি নেই। ইতিমধ্যে লোকজনরা সব এসে পড়েছে। তারিণীদাকে তখন পায় কে! আদেশ করলেন, বাঁধ বেটাকে।

সুন্দরবনের লোকেরা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল বাঘিনীর কাছে। কাছে যেতেই বাঘিনী তার সামনের পা দুটো বাড়িয়ে দিল। শক্ত করে বাঁধা হল পা দু'খানা। বাঘিনীর হাবভাব দেখে ওদের ভারী মায়া হল, তারা তার গলায় একটি মাত্র দড়ি বেঁধে পোষা কুকুরের মত সেটাকে নিয়ে গেল খাঁচার কাছে। দরজা খুলতেই বাঘিনী আর তার বাচ্চা দুটো সুড়সুড় করে ঢুকে গেল খাঁচার ভেতরে।

বিস্ময়ের বোধ হয় আরও কিছু বাকি ছিল। বাঘিনীর খাঁচা সমেত খানিকদূর আসতেই একটা বাঘের দেখা মিলল। সে বেচারী বাঘিনীর খাঁচার পেছনে পেছনে চলল। লোকজনদের নজর সেদিকে পড়তে তাকে ধরে পুরে দেওয়া হল দ্বিতীয় খাঁচায়। বাঘটাও ভেজা বেড়ালের মত।

দুটি খাঁচাসমেত সাহেবের লঞ্চ একসময় কলকাতায় এসে হাজির হল।

গল্পটা আমাদের তারিণীদার মুখেই শোনা। গল্প শুনে জিজ্ঞেস করেছিলাম—সাহেব বাঘ-বন্দীর সময় কোথায় ছিলেন?

—কোথায় আর থাকবেন, বললেন তারিণীদা, বাঘ দেখে সাহেবের হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ল মাটিতে। তারপর সাহেবের আর হুঁসই ছিল না। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বললেন, হ্যাভ ইউ কট ইট বড়বাবু? তবে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। এসব যেন অন্য কারো কানে না যায়। তবে চাকরী থাকবে না।

খবরের কাগজে অবশ্য রিপোর্ট বেরিয়েছিল সাহেবই সশরীরে দু-দুটো বাঘ বন্দী করে এনেছেন সুন্দরবন থেকে।

ইয়ে—

শ্রী শ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

রাগছো কেন রতন মামা ঐ তো তোমার ইয়ে,—
কেমন করে বোঝাই বল কোন্ ভাবে কি দিয়ে।
এই সেদিনে হাবলা পিসে,
পাচ্ছিল না পথের দিশে,
হাওড়া যেতে স্থাওড়া তলায় দাঁড়িয়ে ছিল মিশে।

তার পরেতেও আছে শোনো, দৌড় দিও না সোজা,
অমন ক'রে কোনও-দিনই যায় না কিছু বোঝা ;
মানেটাকে বুঝতে হলে—
মিষ্টি দিয়ে মাছের ঝোলে,
জ্যোতিষ ডেকে গুনিয়ে জেনো মিশবে কিসে কিসে।

নামতা ছড়া

শ্রী অভীককুমার চৌধুরী

এক এককে এক
পড়ছি ধারাপাত।
দুই এক্কে দুই
ভারত মোদের ভুঁই।
তিন এক্কে তিন
আমরা স্বাধীন।
চার এক্কে চার
করব সদাচার।
পাঁচ এক্কে পাঁচ
বলবো কথা সাচ্।

ছয় এক্কে ছয়
হটবো না কোনো ভয়ে।
সাত এক্কে সাত
সবাই একসাথ।
আট এক্কে আট
গড়বো পথ-ঘাট।
নয় এক্কে নয়
জয় হবে নিশ্চয়।
দশ এক্কে দশ
এতেই মোদের যশ॥

কুয়াশা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

রাত দশটা বেজে গেছে। পথ জনবিরল। এই অঞ্চলটা এখনই এমন পথচারীবর্জিত হবার কথা নয়, কিন্তু কিছুদিন যাবত প্রয়োজন ছাড়া এখানকার পথে মানুষ চলাফেরা করে না। বছর খানেক ধরে সি-এম-ডি-এ এই অঞ্চলে বাষট্টি ইঞ্চি ড্রেনের পাইপ বসাচ্ছে, সারা পথটা গোড়া থেকে শেষ অবধি খোঁড়া হয়েছে, খানিকটা পাইপ বসেছে, খানিকটা বসবে, পথে খানা খন্দ রাবিশের ঢিবি ছড়ানো, একপাশ দিয়ে কোনমতে মানুষ চলাফেরা করে নেহাৎ যারা এখানকার বাসিন্দা তারাই। গাড়ী চলা বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন। হারাধন ধীরে ধীরে চলেছিল এই পথ দিয়ে।

পথের একদিকে বড় বড় বাড়ী আরেক দিকে পার্ক। পার্কের ধার দিয়েই আসছিল। এক একটা গাছের নীচে এসে সে থমকে দাঁড়াচ্ছিল, গাছের ছায়ায় তখন আর তাকে ঠাহর করা যাচ্ছিল না। তার পরণে কালো প্যান্ট ও কালো বুশশার্ট যেন এই অন্ধকারে মিশে যাবার জন্যই।

এই অঞ্চলে এই সময়টায় রোজই লোড শেডিং চলছে। রাত দশটা বাজলেই আর আলো নেই, সব ব্ল্যাক-আউট। এই খানা-খন্দে পথের তখন দুর্গম অবস্থা।

ধীরপদে হারাধন এগিয়ে চললো। সে যেন হিসাব করেই আসছিল। মাঝ-বরাবর আসতেই যথারীতি সব অন্ধকার হয়ে গেল। হারাধনও দাঁড়িয়ে পড়ল গাছের নীচে।

কয়েক মিনিট হারাধন চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল।

ইতিমধ্যে সামনের বাড়ীগুলির কোন কোন ঘরে হারিকেনের স্তিমিত আলোক দেখা দিল, তিনতলা অবধি অন্ধকার। সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে হারাধন পকেট থেকে একটি পেনসিল টর্চ বের করে তারই আলোয় দেখে দেখে সে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর পথ পার হয়ে ওদিকে গেল, টর্চ নিভিয়ে ফিরে এলো পূর্বের বাড়ীটির সামনে।

ফ্ল্যাট বাড়ী, সদর দরজা খোলাই ছিল, হারাধন ঢুকে পড়লো বাড়ীর মধ্যে। এ বাড়ীর পথ যেন হরাধনের চেনা। বরাবর ভিতরে গিয়ে বাঁ-দিকে সিঁড়ি,

সে উপরে উঠলো। দোতলায় একটি ফ্ল্যাটের দরজা। দরজায় বড় একটি তালা দেওয়া। সিঁড়ির উপর নীচ একবার দেখে নিয়ে হারাধন পকেট থেকে চাবির গোছা বের করলো। প্রথম চাবিটি তালায় ঢোকালো, তালা খুললো না, দ্বিতীয় চাবি দিয়ে চেষ্টা করলো, তারপর তৃতীয় চাবিতে তালা খুলে গেল। হারাধন ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

বাঁদিকের প্রথম ঘরে তালা দেওয়া, হারাধন আবার সেই চাবির গোছা বের করে তালা খুললো। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

এবার হারাধন বড় টর্চ বের করে ঘরখানি দেখে নিলে। শোবার ঘর। খাট, বুককেস, টেবিল, স্টীলের আলমারী। হারাধন স্টীলের আলমারীর সামনে গেল। চাবি দিয়ে আলমারী খুললো। নীচের তাকে একটি স্যুটকেশ। হারাধন স্যুটকেশটি বের করলো। বেশ ভারী। আরেক তাকে গোছা গোছা নোট রবারের গার্টার দিয়ে বাণ্ডিল বাঁধা। হারাধন গোটা চারেক বাণ্ডিল প্যাণ্টের ত্ন' পকেটে ভরলো, তারপর আলমারী বন্ধ করে স্যুটকেশটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ করলো। বাইরে এসে ফ্ল্যাটের দরজাতেও আগের মত তালা দিল। তারপর সোজা নেমে এলো নীচে। সদর দরজা পার হয়ে সে পথে নামলো।

সেই অন্ধকারেই চারিপাশ একবার দেখে নিলে কেউ কোথাও নেই। আবার পেনসিল-টর্চ বের করে সেই আলোয় রাস্তা পার হয়ে সে পার্কের দিকে চলে গেল। সাধারণ পথিকের মত হাঁটতে স্থরু করলো।

পার্ক পার হলেই ওদিকে ভাল রাস্তা, তারপরেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড।

স্ট্যাণ্ডে ট্যাক্সি ছিল না। হারাধন অন্ধকারেই অপেক্ষা করলো।

ত্ন' মিনিট পরেই হলুদ রঙের একখানি ট্যাক্সি এসে পড়লো, ড্রাইভারের পাশের লোকটি মুখ বের করে বললো—যাবেন ?

হারাধন এগিয়ে গেল, সে দরজা খুলে দিলে। হারাধন ভিতরে উঠতেই একটা লোক তাকে চেপে ধরে বসিয়ে দিল। হারাধন চমকে উঠলো। লোকটি বললো—চুপ ! চেঁচালেই খুন করবো।

ড্রাইভারের পাশ থেকে ছেলেটি নেমে এলো, হাতে তার ছোরা।

ভিতরের লোকটি হারাধনের হাত থেকে স্যুটকেশটি কেড়ে নিলে। পকেটে হাত ভরে দিয়ে নোটের বাণ্ডিলও বের করে নিলে। তারপর হেসে বললো:—মানিকচাঁদের মাল তো ? আমি জানি! এবার নেমে যাও!

—নেমে যাবো! এতক্ষণে হারাধনের মুখে কথা ফুটলো।

—নামো—

লোকটি হারাধনকে এক ধাক্কা দিয়ে ট্যাকসি থেকে বাইরে ফেলে দিল। ছেলেটি লাফিয়ে উঠে পড়লো, ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

হারাধন ট্যাক্সি থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, হাঁটুতে লেগেছিল। উঠে



দাঁড়াতে একটু সময় লাগলো। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে ট্যাক্সি তখন হারিয়ে গেছে।

হারাধন কয়েক মিনিট থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক সেই সময় পিছনে একজনের সাড়া পাওয়া গেল—আপনার ছিনতাই হলো নাকি? ট্যাক্সিটা অমনভাবে আপনাকে পথের উপর ফেলে দিয়ে গেল?

হারাধন সহসা জবাব দিতে পারলো না।

—আপনার হাতে কি একটা ছিল না?

এবার হারাধন বললো—হ্যাঁ, একটা ব্যাগ। ওরা কেড়ে নিলে।

—ছিনতাই কেস। আমারও তাই মনে হলো। অমনভাবে পড়লেন কোথাও লাগে নি তো?

—না।

—ব্যাগে কি ছিল?

এবার হারাধন নিজেকে সামলে নিয়েছে, বললো—না, তেমন কিছু নয়, কিছু কাগজপত্র আর কয়েকটা টাকা।

যাক্, অল্পের উপর দিয়ে গেছে। চলুন, থানায় একটা ডায়েরি লিখিয়ে যাবেন। আমি সাক্ষী হবো। কলিকাতায় দিন দিন এ একটা অসহনীয়

অবস্থা হয়ে আসছে তার উপর এই লোড-শেডিং-এ ওদের আরো সুবিধা হয়েছে।

থানার কথা উঠতেই হারাধন বললো—রাত অনেক হয়ে গেছে, এখন বাড়ী চলে যাই, কাল সকালে লালবাজার গিয়ে ডায়েরি দোব। দিয়েই বা লাভ কি হবে ?

—তখন তো আর আমাকে পাবেন না। তাছাড়া এসব সম্ভ-সম্ভ লোক্যাল থানায় জানানো দরকার। চলুন আপনাকে পনেরো মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করবো। আমি এখানকার একজন ইনেসপেকটার।

ইনেসপেকটারের সঙ্গে থানায় যাবার ইচ্ছা হারাধনের মোটেই ছিল না। কোথা থেকে কি হয় কিছুই বলা যায় না। ফ্ল্যাট থেকে গয়না লুঠ হবার খবর তো কিছুক্ষণের মধ্যেই থানায় এসে পৌছবে, তখন ? কিন্তু এখন ইনেসপেকটারের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় কি ? ছুটে পালানো তো সুবিধা হবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে থানার কাজ সেরে নিয়ে সরে পড়াই ভাল হবে। বললো—বেশ চলুন—

থানা সেখান থেকে দশ মিনিটের পথ। সেখানে আলো জ্বলছে। ও. সি. আপিসে বসে কি একটা ফাইল দেখছিলেন। ইনেসপেকটার ঘরে ঢুকেই বললো —চোখের উপর এখনই একটা ছিনতাই হয়ে গেল, এই ভদ্রলোকের ব্যাগ—

ও. সি. মুখ তুলে তাকালেন, সহসা তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, তারপর বললেন—আপনার ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে ?

হারাধন বললো—আসছিলাম পথ দিয়ে, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে একখানা ট্যাক্সি হঠাৎ পাশে এসে থামলো। ড্রাইভারের সঙ্গে একটি লোক ছিল, নেমে এসে ব্যাগটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে, তারপর আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল।

—গাড়ীর নম্বর দেখেছেন ?

—অন্ধকার তো। তবে গাড়ীটার রঙ হলদে।

—ব্যাগে কি ছিল ?

—জমির প্ল্যান, একখানা ডায়েরি আর খুচরো কয়েকটা টাকা—পাচ টাকা কয়েক পয়সা।

—আপনার জমি ?

—না, আমি দালালি করি।

—বসুন।

—রাত হয়ে যাচ্ছে, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন, অনেক পথ যেতে হবে।

—কোথায় থাকেন আপনি ?

—মাণিকতলা।

—এখনও তো রাত এগারোটা বাজে নি। এর চেয়ে অনেক বেশী রাতে পথ চলা আপনার অভ্যাস আছে।

—মানে ?

—মানে লোড্‌-শেডিং-এর অন্ধকারে হাতে ব্যাগ নিয়ে আসছিলেন। আপনি আমার চেনা লোক। আপনার ব্যাগে কি রহস্য ছিল সেটা একটু বুঝে নিতে চাই। তারপর আমরাই আপনাকে বাড়ী পৌছে দোব। একটু বসুন।

—আমি আপনার চেনা লোক ?

—হ্যাঁ! পূর্ণবাবু দেখুন তো সার্চ করে ওর কাছে কি আছে।

হারাধন কিছু বলার আগে ইনেসপেকটার হারাধনের পকেটগুলি হাতড়ে নিল। তারপরেই প্যাণ্টের পকেট থেকে বের করলো ছুটো টর্চ আর চাবির গোছা।

ও, সি বললেন—এতো চাবি কিসের ? বাড়ীতে আলমারী সিন্দুক বুঝি অনেকগুলো ?

হারাধন কোন জবাব দিলে না।

ও. সি. বললেন—অন্ধকারে কার সিন্দুক হাল্‌কা করে এলে ?

হারাধন বললো—আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

—কাল সকালে বোঝাব। জমাদার ইসকো ফটকমে বন্ধ করো!

—বিনা দোষে আপনি আমাকে আটক করবেন ?

—ওই চাবির গোছাটি কার সেটা না জানা অবধি তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।

সুখলাল আগরওয়ালা লোহার ব্যবসায়ী। লোহার পারমিট বের করে, কনট্রোলে লোহা কিনে খুসিমত দামে বিক্রী করে সে রাতারাতি ফেঁপে উঠেছিল। হিসাবের বাজে খাতা তৈরি করে আয়কর ও বিক্রয়করে গবর্ণমেণ্টকে

সে হাজার হাজার টাকা ফাঁকি দিত। ধরা পড়ার ভয়ে টাকা সে ব্যাঙ্কে রাখতো না। রাখতো একশো টাকার নোট ঘরের স্টীলের আলমারীতে। লাখ দুয়েক টাকা জমে যাবার পর সে দুশ্চিন্তায় পড়লো। আলমারীর পর আলমারী নোটে বোঝাই করা কি ঠিক হবে? সোনাও ভারী বস্তু, কেনা ঠিক নয়। তার চেয়ে জহরৎ ভাল। একখানা ছোট্ট হীরের দাম পাঁচ হাজার টাকা। দু-চার লাখ টাকার মাল একটি ছোট থলির মধ্যে রেখে দেওয়া যায়। ক'দিন আগে নীলাম থেকে সে একটি হীরের নেকলেস কিনে এনেছিল। সেটাই সে রেখেছিল আলমারীতে। ইচ্ছা ছিল ব্যাঙ্কের লকারে রাখবে। কিন্তু সম্প্রতি আয়কর ইনেসপেকটাররা যেভাবে লকার খুলছে, তাতে সুখলাল ব্যাঙ্কের লকারে নেকলেশ রাখতে ভরসা পায় নি। রোজ সকালে আহ্নিক-পূজা সেরে সে আলমারী খুলে নেকলেশটি একবার দেখতো, তাতে মুনাফা করার নতুন উৎসাহ সে পেতো, নবোদ্যমে দাঁও মারতো।

সেদিন সকালে আলমারী খুলেই সুখলাল চমকে উঠলো। নেকলেশের বাক্স্ কোথায় গেল? সামনের সারি থেকে দু-বাণ্ডিল নোটও তো নেই?



নিজেকে সামলে নিতে সুখলালের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো। তারপর ছেলেকে ডেকে বললো—এখন কি করি বল্ ত?

চুনীলালের বয়স কম। বাপের ব্যবসার কলাকৌশল সে শিখেছে আর শিখেছে সিনেমা দেখতে। তাহলেও সে বোকা নয়। খানিকক্ষণ ভেবে সে বললো—পুলিশে খবর দিলে এই সব টাকার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আর এক হুজ্জত সুরু হবে। পুলিশকে সামাল দিতে আরো টাকা খরচ হবে, ওদিকে চোর ধরার কিছুই সুবিধে হবে না। ইনকাম-ট্যাকসের উকিলবাবু আমাদের অনেক খবর জানে, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করুন। তিনি কি করতে হবে বাতলে দেবেন।

কথাটা সুখলালের মনে লাগলো। তখনই সে উকিল সমরবাবুকে টেলিফোন করলো। লাখপতি মক্কেলের ডাক। সমরবাবু তখনই ছুটে এলো। সব

দেখে-শুনে বললে—আমার বন্ধু আছে ফৌজদারী কোর্টের উকিল, সখের গোয়েন্দাগিরি করেও সে নাম করেছে, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।

সুখলাল বললো—তাহলে তাকে আপনি এখানে নিয়ে আসুন, আমি ট্যাক্‌সি ভাড়া দিচ্ছি।

সুখলালের নোটখানি পকেটে ভরে সমরবাবু বেরিয়ে গেল, আধঘণ্টার মধ্যে গোবিন্দকে নিয়ে এলো। গোবিন্দ সব দেখেশুনে বললো—পুলিশকে অবশ্যই জানাতে হবে। আপনাদের নিরপত্তার জন্যই জানানো দরকার। যে লোক আলমারী ভর্তি নোটের গোছা দেখে গেছে সে আবার দলবল নিয়ে আসবে, তখন হয়তো আপনাদের জীবন বিপন্ন হবে। এসব ব্যাপার গোপন রাখা উচিত নয়। আমার বন্ধু আছে পুলিশের গোয়েন্দা গিরিনবাবু—গিরিন চক্রবর্তী, আপনি তার কাছে যান। মানুষ ভাল, অকারণে লোকের ক্ষতি করে না।

গোবিন্দকে নিয়ে তখনই সমর ও সুখলাল বেরিয়ে পড়লো।

গিরিন চক্রবর্তী ধীরভাবে চুরির ঘটনাটি শুনলেন। তারপর সোজা চলে এলেন সুখলালের ফ্ল্যাটে। চুনিলাল তখন আলমারী থেকে নোটের বাণ্ডিল অন্য ঘরে সরিয়ে ফেলেছে। গিরিনবাবু সব দেখে-শুনে বললেন—আপনারা ফ্ল্যাটে কেউ ছিলেন না। ফিরে এসেও কিছু বুঝতে পারেন নি। যেমন তালা দিয়ে গিয়েছিলেন, ঘরে বাইরে তেমনই তালা দেওয়া ছিল। জানতে পারলেন আজ সকালে আলমারী খুলে। আলমারীর সামনে দু' বাণ্ডিল একশো টাকার নোট ছিল, সেই দুটি আর নেকলেসের সুটকেশটি ছাড়া ঘরে কিছুই খোয়া যায় নি। এ চোর সাধারণ চোর নয়, এ অনেকদিন ধরে আপনার উপর নজর রেখেছে, ঘরের খবর জানে। এর যে আঙুলের ছাপ পাব তারও উপায় নেই, কারণ আলমারী পরে আপনারা খুলেছেন, এখন ওর হাতলে আপনাদেরই আঙুলের ছাপ আছে। সে ঘরের অন্য কোন জিনিষ স্পর্শ করে নি। এ চোর ধরা সহজ হবে না। ওই নেকলেশ যখন সে বিক্রী করার চেষ্টা করবে যদি তখন ধরা পড়ে। আপনি কালোবাজারে অনেক মুনাফা লুটেছেন, এটা আপনার লোকসানের টাকা বলে ধরে নিন।

সুখলাল বললো—এ কি একটা কথা হলো বাবুজী, কিছু লাফা তো সবাই করে, আমিও করেছি। চল্লিশ হাজারের এই নেকলেশ আর নোটে দশহাজার

টাকা, এই তো আমার সম্বল ছিল বাবুজী, আমার তো শেষ হয়ে গেল। আপনি একটু সুলুক-সন্ধান করে দেখুন, যদি মিলে যায়। আপনাকে আমি দশহাজার টাকা সেলামী দেবো।

গিরিনবাবু হাসলেন, বললেন—দেখি চেষ্টা করে, তারপর আপনার বরাত। এখন আপনি আমার সঙ্গে চলুন, থানায় একটা ডায়েরি লেখাতে হবে, একটা রেকর্ড থাকা চাই।

সুখলালকে নিয়ে গিরিনবাবু এলেন থানায়।

পূর্ণবাবু ছিলেন, গিরিনবাবুকে আপ্যায়িত করলেন, তারপর ধীরভাবে সব ঘটনাটি শুনে সমরবাবুকে বললেন—আপনারা দু'জনে অপিসঘরে গিয়ে ডায়েরিটা লিখিয়ে দিন তো, আর গিরিনবাবু এখানে বসুন, অনেক কথা আছে।

সমর ও সুখলালকে বিদায় করে দিয়ে পূর্ণবাবু বললেন—এই চোর কালই আমাদের হাতে ধরা পড়েছে, এখন হাজতে আছে।

রাত্রে হারাধনের ধরা পড়ার কথা পূর্ণবাবু সব বললেন।

গিরিনবাবু বললেন—লোকটাকে আপনি চেনেন?

পূর্ণবাবু বললেন—মানিকতলায় যখন ছিলাম তখন ছিনতাই ও ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারে ও দু'বার ধরা পড়ে।

—জেল খেটেছিল?

—না। মামলা কোর্টে তুলতে পারি নি, মুরুব্বিরা তদ্বির করে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

—ধরা পড়ে কিছু বলেছে?

—ওর মুখ থেকে সত্যি কথা বের করা সহজ নয়।

—চাবির গোছাটা দিন, আমি একবার কথা বলে দেখি, মানুষটিকেও চেনা হবে।

—এখানে আনাচ্ছি।

—না না, আপনার সামনে নয়, অন্য একটা ঘরে একা একা কথা বলতে চাই।

—বেশ তো, পাশের ঘরে। জমাদার, কাল রাতের আসামীকে পাশের ঘরে নিয়ে এসো।

পাশের বড় ঘরে গিরিনবাবু এসে বসলেন, জমাদার হারাধনকে নিয়ে এলো।

গিরিনবাবু জমাদারকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে, হারাধনের পানে ফিরলেন, বললেন—বসো।

হারাধন সামনের চেয়ারে বসলো।

গিরিনবাবু বললেন—তারপর হারাধনবাবু, কাল রাতে লোড-শেডিং-এর অন্ধকারে কার স্যুটকেশ আপনি হাতিয়েছিলেন সত্যি করে বলুন তো?

—আপনি আমাকে চেনেন?

—মাণিকতলার ওয়াগন-ব্রেকার হারাধন দাসকে যদি না চিনি, তাহলে কলিকাতা পুলিশে উত্তর কলিকাতায় পনেরো বছরের অভিজ্ঞতাই তো বাজে হয়ে যাবে।

—আপনারা একবার যা দেখেন সেইটাই ধরে বসে থাকেন স্যার। আমি অভাবে পড়ে একবারই ওয়াগন-ব্রেকারের দলে ভিড়েছিলাম। তারপর নাকে কানে খৎ দিয়েছি আর ওপথে নয়। এখন স্যার জমি-জায়গার দালালি করি— সত্যি বলছি স্যার—

—তা বেশ। তবে কাল যে স্যুটকেশটা খোয়ালে সেটার মধ্যে কি জমি ছিল?

—স্যুটকেশ কোথায় স্যার, একটা ফোলিও ব্যাগ ছিল হাতে। তার মধ্যে দু'খানা জমির প্ল্যান ও গোটা পাঁচেক টাকা আর একখানা ডায়েরি ছিল। ইনেসপেকটারবাবু অন্ধকারে ভুল দেখেছেন।

—বেশ, কিন্তু এই চাবির গোছাটা তোমার পকেটে এলো কোথা থেকে?

—এই চাবির গোছা?—হারাধন চাবির গোছাটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে, বললে—এই চাবির কথা আমি কিছুই জানি না, আমি সত্য বলছি, এটা আমার পকেটে কি করে এলো, তা-ও আমি জানি না।

—তোমার এ রূপকথার গল্প চলবে না হারাধনবাবু, এই চাবির গোছা দিয়ে কাল রাতে তুমি কারও বাড়ীর তালা খুলেছিলে, গয়নার স্যুটকেশ হাতিয়ে সরে পড়েছিলে, তারপর ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে চোরের উপর বাটপাড়ি হয়ে গেল—সত্যি কথাগুলি খুলে বল দিকি? নয়তো এই হাজতেই পচতে হবে দিনের পর দিন, সেটা খুব আরামের ব্যাপার হবে না।

—সে যদি হয় তো সে আমার বরাত, আমি ইনেসপেকটারবাবুকে কাল যা বলেছি সবই সত্যি কথা বলেছি। আপনারা বিশ্বাস না করলে আমি কি করতে পারি।

—সত্যি কথা তুমি বল না, বলবেও না। তবে বামাল সুদ্ধ ধরা পড় নি সেইটাই তোমার বাঁচোয়া। তবে এই চাবির গোছার তথ্যটা আমরা ঠিক বের করবো।

গিরিনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সুখলালের তখন ডায়েরি লেখানো শেষ হয়ে গেছে। তারা পূর্ণবাবুর ঘরে আসতেই গিরিনবাবু বললেন—আবার একবার আপনার বাড়ী যেতে হবে। এই চাবির গোছার কোন চাবিটা আপনার ঘরের কোন তালায় লাগে কিনা দেখে আসতে হবে।

গিরিনবাবু আবার গেলেন সুখলালের ফ্ল্যাটে। গোছা থেকে তিনটি চাবি ফ্ল্যাটের তালায়, ঘরের তালায় ও স্টিল আলমারীতে লেগে গেল। গিরিনবাবুর সন্দেহ মিটে গেল। থানায় এসে পূর্ণবাবুকে বললেন—ব্যক্তিগত মুচলেখা নিয়ে হারাধনকে ছেড়ে দিন। হারাধনের পিছনে আমাদের লোক নজর রাখবে, তাহলে হয়তো চুরির কিনারা হবে। না হলে ওর মুখ থেকে কোনো কথা বের করা যাবে না। আর একগোছা চাবির জন্য ওকে তো জেলে পাঠানোও যাবে না।

সেই কথায় কাজ হলো, হারাধন সেইদিনই হাজত থেকে ছাড়া পেল।

উল্টাডিঙ্গি রেললাইনের পাশ দিয়ে সুদৃশ্য প্রশস্ত পথ তৈরী হয়েছে, তার একদিকে নতুন নতুন বাড়ী উঠছে। রেললাইনের আরেক দিকে কিন্তু সেই পুরানো পথ। পথের ধারে গরীব লোকদের পুরানো বস্তি। মাঝে মাঝে এই বস্তি থেকে এক একটি রাস্তা রেললাইনের নীচে দিয়ে নতুন রাস্তায় এসে পড়েছে।



এমনি এক রাস্তার মোড়েই বড় বড় দুটি অশথ গাছ, গাছের নীচেই একটি টিনের চালা। চালার ভিতরে তিনচারখানি বেঞ্চি পাতা। সামনের দিকে উনুন জ্বলছে, উনুনে চায়ের বড় কেটলি চাপানো, পাশে

কয়েকটা শিশিতে দিশি বিস্কুট। প্রথম নজরে মনে হয় চায়ের দোকান। অবশ্য সকালে ও বিকালে এখানে চায়েরই আসর জমে। রাত আটটার পর থেকেই তাড়ির কলসী এসে পড়ে, আর তার পরেই আসে এই অঞ্চলের মস্তানের দল, এখানে বসে বসে দু-এক গেলাস তাড়ি না খেলে তাদের রাতের মৌতাত জমে না।

সেদিন রাত আটটার পর একটি ছোকরা এসে ঢুকলো, বললো—মুরারীবাবু, জয়হিন্দ।

দোকানের মালিক মুরারী তাকালো, বললো—শিবু? তা ক'দিন দেখি নি যে?

—এ তল্লাটে ছিলাম না, অন্য জায়গায় কাজ পড়েছিল। আবার আজ থেকে এদিকে এলাম। এদিকে থাকলে তোমার এখানে একবার না এলে তো মনে হয় দিনটাই বাজে হয়ে গেল।

—আসবে বৈকি অবশ্য আসবে। তোমাদের না দেখলে আমার মনটাও ভাল থাকে না।

—খ্যাঁদা, হাবু, দীপু সব আসছে?

—খ্যাঁদাকে পুলিশ মিসায় ধরেছে, হাবু আর দীপু বোধহয় ক'দিন গা ঢাকা দিয়েছে, আর তো আসছে না।

—তাহলে তো আড্ডা জমবে না।

—বসো না। চেনা মুখ পেয়ে যাবে হয়তো।

শিবু বসলো, এক পাশে কয়েকটা কলসী নিয়ে বছর পনেরোর একটা ছোকরা বসেছিল। শিবু তার পানে তাকিয়ে বললো—দে এক গেলাস।

ছেলেটি বড় এক গেলাস সফেন তাড়ি শিবুর হাতে এগিয়ে দিল। শিবু এক এক চুমুক রসিয়ে রসিয়ে খেতে লাগলো। পকেট থেকে চানাচুরের একটা ঠোঙা বের করে দুটি দুটি চানাচুর চিবুতে লাগলো।

দু' গেলাস তাড়ি যখন শিবু শেষ করেছে তখন জনা-তিনেক ছোকরা এসে ঢুকলো। এর আগেও ক'জন এসে বসেছে, শিবু গ্রাহ্য করে নি। এদের দেখে শিবু যেন সজাগ হলো।

ওরা চুপচাপ গেলাস খানেক তাড়ি খেলে। তারপর শিবুর মতই চানাচুর চিবুতে চিবুতে আরেক গেলাসে চুমুক দিলে। তারপর তাদের মুখ খুললো :

—হারাধনের কি হলো বলত? কাল এলো না। আজ এখনও দেখা নেই, ধরা পড়ে গেল নাকি?

—ধরা পড়লে তো কাগজে বেরুতো। কাগজে তো কোন খবর দেখতে পেলাম না।

—এই ব্ল্যাক-আউটে হারাধন ধরা পড়বে না। কাজ সে ঠিক হাসিল করেছে। তবে আরেকদিকের কথা আমি ভাবছি।

—আরেকদিকের আবার কি—মাল সরানো?

—না। আমি শুনলাম হাসু পাণ্ডারও নজর আছে রামলালের উপর। ওই নেকলেশটা কেনার সময় থেকেই সে নজর রেখেছে। হাসু পাণ্ডার কাছে হারাধন কিছুই নয়।

—হারাধন জানে?

—আমিই তো বলেছি।

—তবে কি হাসু পাণ্ডাই ওকে গায়েব করে দিলে নাকি?

—অসম্ভব নয়। হাসু পাণ্ডার কাছে দু-একটা খুন কিছুই নয়।

—তুই হাসুকে দেখেছিস?

—তার দলের চাঁইরাই তাকে দেখে নি, আমি দেখবো কি? ওর আসল নামও কেউ জানে না। ও আড়াল থেকে হাসে, সেই হাসি শুনলেই মানুষের কাঁপুনি হয়, তাই ওর নাম হাসু।

—যাক, ওর সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করার দরকার নেই। আজ একবার হারাধনের খোঁজ করার চেষ্টা করি।

ওরা গেলাস শেষ করে বেরুলো। শিবুও বেরুলো। বরাবর চললো লালবাজারের দিকে।

মাণিকতলা সি-আই-টি রোডের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সন্ধ্যা থেকেই অন্ধকার বিরাজ করছে। ফ্ল্যাটবাড়ীর কোন কোন জানালা দিয়ে লণ্ঠনের স্তিমিত আলো দেখা যাচ্ছে। দোকানগুলি মিটমিট করছে। পথে তেমন লোক নেই। পথের মাঝে ফুটপাতে দু-চারজন ছেলে বসে আছে। অন্ধকার যেন এই অঞ্চলটা নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে।

এদিকটা সম্প্রতি এই ব্যাপক লোড-শেডিংয়ের আওতায় ছিনতাই বেড়ে গেছে, পুলিশ সেজন্য কিছু কিছু সাদা পোষাকী পাহারাদার মোতায়েন

করেছে। তারা পথিকের মত পথে ঘোরে, নজর রাখে। বাইসাইকেল নিয়ে সার্জেণ্টও দু-একজন ঘুরে ফিরে যায়।

সার্জেণ্ট লালচাঁদ মাণিকতলার চৌমাথা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছিল। সহসা একটা ছোট লরী একেবারে তার ঘাড়ের উপর দিয়েই মোড় ফিরলো। লালচাঁদ সাইকেল ছেড়ে ফুটপাতে লাফিয়ে পড়ে রক্ষা পেলে। সাইকেলটাও চকিতে টেনে নিলে ফুটপাতের উপর। তারপরেই চীৎকার করে উঠলো—রোখ্‌খো!

লরী রুখলো না।

লালচাঁদ নম্বরটা পড়ে নেবার চেষ্টা করলো, নোটবই বের করে লিখে নিলে, লরী তেমনি বেগেই এগিয়ে গেল।

হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো, কি যেন পড়ে গেল। লরীটা কাউকে ধাক্কা মারলো নাকি? ড্রাইভার কি মদ খেয়ে গাড়ী চালাচ্ছে? এই অন্ধকারে এতো স্পীড! লালচাঁদ সাইকেল চড়ে ছুটলো।

একটু গিয়ে থামতে হলো। পথের উপর একটা প্যাকিং-বাক্স পড়ে আছে। নিশ্চয় ওই লরী থেকেই পড়েছে। পিছনে গাড়ী এলেই তো দুর্ঘটনা ঘটবে। লালচাঁদ বাক্সটা এক পাশে টেনে সরিয়ে দিল। সাইজের তুলনায় বাক্সটা হালকা বলতে হবে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। লরী ড্রাইভারের তো এতক্ষণে হুঁশ হওয়া উচিত, ফিরে আসা উচিত। কিন্তু কই?

একজন সাদা পোষাকী পাহারাওলা এসে পড়লো। লালচাঁদ তাকে সব কথা বললো।

আরো দশ-পনেরো মিনিট গেল। লরী তো ফিরলো না। লালচাঁদ পাহারাওলাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে থানায় ছুটলো।

থানা থেকে পুলিশের গাড়ী এলো। গাড়ীতে প্যাকিং-বাক্সটা তুলে নেবার উদ্যোগ করা হলো। ডালাটা উপর দিকে ফেরাতেই টর্চের আলোয় দেখা গেল ডালার উপর লেখা আছে:

পুলিশ কমিশনার—লালবাজার

কী ব্যাপার!

যাই হোক, প্যাকিং-বাক্স নিয়ে পুলিশ থানায় এলো। তারপরেই থানা থেকে টেলিফোন গেল লালবাজারে। লালবাজার থেকে গোয়েন্দা ছুটে এলো। প্যাকিং-বাক্স খোলা হলো থানার উঠানে।

প্রথমে তো খড়। খড় সরাতেই দেখা গেল একটি মানুষের দেহ। দু-তিনটে জোরালো টর্চের আলোয় এবার মানুষটি চেনা গেল—গোয়েন্দা গিরিন চক্রবর্তী। যন্ত্রণাকাতর অন্তিম মুহূর্তের ছাপ রয়েছে মুখের উপর।

খবরের কাগজে খবর পড়েই গোবিন্দ চমকে উঠলো।

কোর্টে যাবার পথে গোবিন্দ এলো লালবাজারে। এসিস্টাণ্ট কমিশনার নরেশবাবু গোবিন্দর বিশেষ পরিচিত। তাঁর সঙ্গে দেখা করে গোবিন্দ বললো—এই গিরিন চক্রবর্তী কি আমাদের গিরিনবাবু?

নরেশবাবু মাথা দোলালেন।

—ব্যাপারটা তো কাগজে পড়ে কিছু বুঝলাম না। ঘটনাটা একটু খুলে বলবেন?

নরেশবাবু সংক্ষেপে প্যাকিং-বাক্সে মৃতদেহ পাবার কথা বললেন।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো—লরীর নম্বর যে পেয়েছেন, সেটা দেখেছেন?

—নম্বরটা বাজে। ওই নম্বরের যে লরী আছে সেটা বড় লরী। লরীর মালিক এক কালোয়ার, রামলাল আগরওয়ালা।

—পাইকপাড়ার রামলাল আগরওয়ালা, যার বাড়ীতে ক'দিন আগে গহনাপত্তর চুরি হয়ে গেছে?

—সে-ই।

—সেইখানে তো আমিই গিরিনবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

—গিরিনবাবু সেই কেসটারই তদ্বির করছিলেন। এখন তাঁর হাতে আর কোন মামলা ছিল না। ওই ব্যাপারেই তিনি খুন হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

—ডাক্তারী রিপোর্ট কি বলছে?

—ময়না তদন্তে ডাক্তার বলেছেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে।

—কার্বন-ডাই-অক্সাইড? উনুন বা চুল্লীর গ্যাস। ঘরের মধ্যে উনুন রেখে জানালা দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, অথবা কোন কারখানার চুল্লীঘরে। সোডা-ওয়াটারের কারখানাতেও তো কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

—কিন্তু কোথায় যে ঘটনাটি ঘটেছে, সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় না করে তো আমরা কিছু করতে পারি না।

—হারাধনের খবর কি ?

—ঠিক আছে।

—প্যাকিং-বাক্সে ঠিকানা লিখে দেওয়া মানে লালবাজারকে চ্যালেঞ্জ করা। খুনী এখানে বেপরোয়া। এই ধরণের খুনীর সঙ্গে বোঝাপড়া করা খুব সহজ নয়।

—আমরা তাকে ধরবোই, তবে হয়তো সময় লাগবে। আপনিও তো অপরাধ-তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, আপনিও চেষ্টা করে দেখুন না, যদি কোন সূত্র পান। গিরিনবাবু তো আপনারও বন্ধু ছিলেন।

—এই গয়না চুরির ব্যাপারটায় আমিই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি যে এইটাই ওর মৃত্যুর কারণ হবে। সেদিক থেকে আমি ওর মৃত্যুর একটা নিমিত্ত বলতে পারেন। সেইজন্যই এই হত্যাকাণ্ডে আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। আমি যদি কিছু সূত্র পাই আপনাকে অবশ্যই জানাবো।

চিন্তিত মুখে গোবিন্দ লালবাজার থেকে বেরিয়ে এলো।

একটা ফৌজদারী মামলার শুনানী ছিল। সরকারী উকিলকে গোবিন্দ সাহায্য করছিল। টিফিনের আগেই মামলা শেষ হলো। আর কোন মামলা সেদিন ছিল না। গোবিন্দ বার লাইব্রেরীতে বসে সাদা কাগজের উপর কালির আঁচড় টানছিল, আর মনে মনে গিরিনবাবুর হত্যার ঘটনাটি নানা দিক থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করছিল।

এমন সময় একটি চেনামুখ এসে পাশে দাঁড়ালো। গোবিন্দ বললো—কী ? কি খবর অনিলবাবু ?

অনিল গোবিন্দর সহপাঠী। বললো—এসেছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে একটা অর্ডার বের করলাম। কারখানায় স্থানীয় মস্তানরা বেজায় উৎপাত সুরু করেছে। কারখানায় কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, আমরা গেলেও মারপিটের ভয় দেখাচ্ছে। সাতদিন কারখানা বন্ধ। এখন পুলিশ দিয়ে কারখানা খোলাতে হবে।

—তোমাদের কারখানা তো অনেক দিনের, এতদিন তো কোন গোলমাল শুনি নি। এখন পাড়ার ছেলেরা গোলমাল করছে কেন ?

—আগে একটা দুর্গাপুজা হতো, পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতাম চুকে যেতো।

এখন পনেরো দিন পরেই কালীপুজা, তারজন্য দাও আবার পঞ্চাশ টাকা। তারপর বড়দিনে পৌষালী উৎসব—পঞ্চাশ টাকা, সরস্বতী পুজা—পঁচিশ টাকা, নববর্ষ উৎসব—পঁচিশ টাকা, তারপর যখন তখন পার্টিতে পার্টিতে মারামারি, সেজন্য বোমার খরচ দশ টাকা। বাবা সোজা বলে দিয়েছেন, 'এমনভাবে টাকা দিতে আমি পারবো না।' সেই থেকে বেধেছে গোলমাল। থানায় ডায়েরি করেও সুবিধা করতে পারিনি, বড় বড় নেতারা ওদের মুরুব্বি। শেষে আজ সাতদিন কারখানা বন্ধ। তাই কোর্ট থেকে হুকুম বের করে নিলাম। এবার পুলিশ বসবে, নাহলে কারখানা ভেঙ্গে দিলেও কিছু করতে পারতাম না।

—পুলিশ বসিয়ে দেবে তো কারখানার দরজায়, কিন্তু যাওয়া-আসার পথে যদি হামলা চালায়, তখন ?

—বাবাও সে কথা বলেছেন। সেইজন্য ঠিক করেছেন কারখানা বিক্রী করে দেব। লাভ চাই না, ন্যায্য দাম পেলেই ছেড়ে দেব।

—কত জন কাজ করতো ?

—জনাপঁচিশ।

—পঁচিশজন মানুষ তো বেকার হয়ে যাবে ?

—যাবে। দেশের ছেলেরা যদি দেশের মানুষকে কাজকর্ম করে খাবার সুযোগ না দেয় তো আমরা কি করতে পারি।

—তোমার কারখানাটা মাণিকতলার কোথায় ?

—মুরারীপুকুরের কাছে, সি-আই টি রোড থেকে মিনিট দুইয়ের পথ।

—লোহালক্কড়ের কারখানা তো,—কি তৈরি হয় ?

—যখন যা অর্ডার পাই, নাট বল্টু থেকে মোটর পার্টস অবধি।

—একবার দেখতে গেলে হতো।

—আজ এখনি চল না। থানা থেকে পুলিশ নিয়ে আমি তো এখনি যাবো। আমার তো স্কুটার রয়েছে।

গোবিন্দ পোর্টফোলিও নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

থানা থেকে পুলিশ নিয়ে অনিল এলো কারখানায়।

রেল লাইনের পাশে রাস্তা, রাস্তার ধারেই টিনের শেড দেওয়া কাঠা তিনেক জমির উপর কারখানা। এক পাশে এলোমেলো কিছু কিছু টুকরো

জমিতে কিছু কিছু রাবিশের ঢিবি জমে আছে, আর একদিকে টানা বস্তি চলে গেছে অনেক দূর অবধি। নারিকেলডাঙ্গা মাণিকতলা থেকে সুরু করে এই অঞ্চলটাই বস্তি অঞ্চল। ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ভাঙচুর করে, রাস্তা বের করে কিছুটা উন্নতি করেছে সত্য, কিন্তু এখনও যা আছে তা কম নয়।

কারখানার দরজায় তো পুলিশ বসলো। অনিল তালা খুলে ভিতরটা দেখিয়ে আনলো। মস্ত শেড। পাশাপাশি কয়েকটা লেদ্‌ ও ড্রিল মেশিন। একপাশে একটা চুল্লী। এদিকে পার্টিশান দেওয়া একটা অংশে টেবিল চেয়ার সাজিয়ে আপিস করা আছে।

এই ধরণের কারখানা গোবিন্দ অনেক দেখেছে। এই কারখানা দেখার ব্যাপারে তার কোন কৌতূহল ছিল না। গিরিনবাবু এই অঞ্চলে খুন হয়েছেন, সেইজন্যই এই অঞ্চলটা একবার ভাল করে দেখে নেবার ইচ্ছা ছিল। লালদীঘি থেকে মাণিকতলা অবধি দুপুরের বাসে ছুটে আসা কষ্টকর, অনিলের স্কুটারে অনেক আরামে আসা গেল। এই সুযোগটুকু সে গ্রহণ করলো।

কারখানা থেকে বেরিয়ে সে অনিলকে ছেড়ে দিল, সুরু করলো এলোমেলো খানিকটা ঘোরাফেরা।

সন্ধ্যা নাগাদ মাণিকতলা থানায় এসে ও-সিকে গোবিন্দ বললো—মাণিক-তলার কোন বস্তিতে আমায় একখানা ঘর দিতে পারেন, দিন সাতেক থাকবো, গিরিনবাবুর খুনের কেসটার যদি কোন সুবিধা করতে পারি।

গোবিন্দর গোয়েন্দাগিরির খ্যাতি ও. সি. শুনেছিল। দু'মিনিট ভেবে নিয়ে বললো—ঠিক ওই এলাকায় হবে না, তবে ও.. কাছাকাছি হবে। কমলবাবু, কাঁকুড়গাছিতে সুধীর মাস্টারের ঘরখানা তো আমাদের হাতে আছে না?

আপিস ঘর থেকে কমলবাবু উঠে এলেন, বললেন—হ্যাঁ।

—ওখানে গোবিন্দবাবুকে পৌছে দিয়ে আসুন, উনি ওখানে দিন কয়েক থাকবেন।

কমলবাবু গোবিন্দকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শিবুর দোকানে রাত আটটার পরেই গোবিন্দকে দেখা গেল। আধময়লা পায়জামার উপর একটা টেরিলিনের বুশ শার্ট পরনে। বাইরের বেঞ্চির উপর বসে বসে তিরিশ পয়সার একখানি ছোট রুটি এক কাপ চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেল। ইতিমধ্যে ভিতরে তাড়ি খাবার জন্য দু'চারজন এসে গেছে।

সেদিক পানে তাকিয়ে গোবিন্দ বললো—ভিতর বাইরের দোকানদারী কি আলাদা?

শিবু বললো—আপনার কি চলে? তাহলে ভিতরে গিয়ে বসতে পারেন। আপনি এদিকে নতুন এলেন বুঝি?

—হ্যাঁ, যাদবপুরে ছিলাম, সেখানে থাকতে দিলে না, ক'দিনের জন্য একটু সরে আসতে হলো। ক'দিন থাকতে হবে কিছু ঠিক নেই। সুধীর মাষ্টার বললে—শিবুর দোকানে জংলীর সঙ্গে দেখা করতে, তাই এখানে এলাম। তা জংলীকে তো আমি চিনি না। সে এলে আমাকে চিনিয়ে দিও।

শিবু একবার তীক্ষ্ণচোখে তাকালো গোবিন্দর পানে, তারপর বললো—

—এখানে কোথায় এসে উঠেছ?

—সুধীর মাস্টার ক'দিন বাইরে গেছে, ওর ঘরেই আছি।

—তা যতক্ষণ জংলীদা না আসছে ততক্ষণ এক গেলাস চালাও।

—না, সে এলে এক সঙ্গেই খাব।

—ওই যে বলতে বলতেই জংলীদা এসে পড়েছে।

দিব্যি সুপুরুষ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে বিরাট গালপাট্টা, কালো প্যাণ্ট কালো সার্ট পরনে এক যুবক এসে থমকে দাঁড়াল, বললো—কী?

শিবু দেখিয়ে দিলে—সুধীর মাস্টার এঁকে পাঠিয়েছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

গোবিন্দর পানে এক নজরে দেখে নিয়ে জংলী ডাকলো—এসো, ভিতরে এসো—

জংলী ঘরের ভিতরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসলো, গোবিন্দকে বললো—বসো—

গোবিন্দ বেঞ্চির এক পাশে বসলো।

যে ছেলেটি কলসী নিয়ে বসেছিল সে এক গেলাস তাড়ি জংলীর দিকে এগিয়ে দিল। জংলী ধীরে সুস্থে গেলাসটি শেষ করে একটা সিগারেট ধরালো, তারপর গোবিন্দর পানে তাকিয়ে বললো—নাম কি?

—গোবিন্দ।

—গোবিন্দ কি?

—গোবিন্দ মাইতি।

—মেদিনীপুরিয়া?

—দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ছেলেবেলা থেকে।

—আমার কাছে কি?

—কাজ চাই।

—এতদিন কি করেছ?

—যাদবপুরে কাজ করতাম।

—কার কাছে?

—হাবুলের কাছে।

—হাবুল? হাবুল কোথায় থাকে?

—ঝিল রোডে আস্তানা ছিল।

—এখন আস্তানা নেই?

—শনিবার রাতে সি-আর-পির গুলিতে হাবুল খতম হয়ে গেছে। তারপরেই পুলিশ আস্তানার উপর নজর রেখেছে। আমরা তাই সরে এসেছি। দল ভেঙ্গে গেছে।

—আমরা মানে ক'জন?

—জমির, সাবু, কালু, আমি—

—সবাই এদিকে চলে এসেছ?

—না, একসঙ্গে থাকলে তো আবার গোলমাল হবে, তাই যে যার সুবিধামত ছিটকে পড়েছি। আমি এসেছি এদিকে। সুধীর মাস্টারের সঙ্গে জানা চেনা ছিল, তারই ঘরে এসে উঠেছি। চুপ করে বসে আছি, সুধীর মাস্টার তাই আপনার কাছে পাঠালে যদি এখানে কোন কাজ হয়। নাহলে বেলঘরিয়ায় গিয়ে একবার চক্করদা'র খোঁজ করবো।

—সুধীর মাস্টার পাঠিয়েছে কাজ তোমার হওয়া উচিত, তবে ওস্তাদকে একবার জানাতে হবে।

—আপনিই তো এখানকার ওস্তাদ বলে শুনেছি।

—আমি ওস্তাদের কথামত সবাইকে চালাই। সবাই আমাকেই চেনে। ওস্তাদ আমার ওপরে।

—বেশ, তার সঙ্গে দেখা করবো। কোথায় যেতে হবে বলুন?

—কোথায় ওস্তাদের সঙ্গে দেখা হবে, সে ওস্তাদই খবর দেবে। তোমার ঠিকানাটা রেখে যাও।

—এখন আমি সুধীর মাস্টারের ওখানেই আছি—সারাদিনই থাকি।

—ঠিক আছে, খবর পাবে। ওরে হাবলা, আর এক গেলাস দে—

গোবিন্দ বুঝলো কথা শেষ হয়ে গেল। তবু সে চুপ করে বসে রইল।

ধীরে সুস্থে দ্বিতীয় গেলাসটি শেষ করে জংলী বললো—কি, তুমি এখনও বসে আছ কেন, কথা তো হয়ে গেল!

এবার গোবিন্দকে উঠতে হলো। বললো—একটু তাড়াতাড়ি যেন খবর পাই, টাকা-পয়সার দরকার।

—হাতে টাকা নেই?

—দিন দুই চালাতে পারি।

—এই নাও, দশটা টাকা নিয়ে যাও।

—কোন কাজ না করেই টাকা?

—পরে কাজ হবে তখন টাকা কেটে নেবো। আমার টাকা আজ অবধি কেউ হজম করতে পারে নি। যাও—

দশ টাকার নোটখানা পকেটে নিয়ে গোবিন্দ বেরিয়ে এলো। পথে দু'পা আসতেই চোখে পড়লো হারাধন আর একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শিবুর দোকানের দিকেই আসছে।

বস্তির আট ফুট চওড়া রাস্তা। সেই রাস্তার উপর একখানি ৮ ফুট×৮ ফুটের ঘর। তিন দিক বন্ধ। পথের উপরেই একটি ২ ফুট×৩ ফুটের জানালা। তবে দরজার পাল্লায় কাঠের প্যানেল দেওয়া নেই, আছে লোহার রড। গলিতে যদি হাওয়া থাকে তাহলে ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও হাওয়া ভেতরে আসে। তবে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে।

হোটেল থেকে খেয়ে এসে রাত দশটা নাগাদ আলো নিভিয়ে গোবিন্দ তো শুয়ে পড়লো। একখানা তক্তাপোষ ও তার উপর বহু দিনের একখানি চাটাই পাতা ছিল। গোবিন্দ সতরঞ্চি ও চাদর নিয়ে গিয়েছিল, সেই সতরঞ্চি বিছিয়ে চাদর পেতে তো শুয়ে পড়লো। শুয়ে পড়লো বটে কিন্তু আলো নিভাতেই মশা এসে ধরলো। গোবিন্দ মশারী আনে নি। শেষ অবধি বিছানার চাদরখানা গায়ে চাপা দিতে হলো।

এই অবস্থায় রাত কাটানো গোবিন্দের অভ্যাস নেই, ঘুম আর আসে না। আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে।

এই অবস্থায় ক'দিন থাকতে হবে তাই সে ভাবতে থাকে। তবে যত কষ্টই হোক গিরিনের হত্যাকাণ্ডের যদি একটা কিনারা হয়, সেজন্য সে কষ্ট করবে।

ভাবতে ভাবতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখনই মাথার মধ্যে টিপ টিপ করছে। উঠে মুখ ধুতে গিয়ে দেখে তখনই বস্তির কলতলায় মেয়েদের ভীড়। ওদিকে রাস্তায় একটা কল ছিল, সেখানে গিয়ে লাইন দিয়ে তিনজনের পরে সে মুখ ধোয়ার অবকাশ পেল। বিরক্ত হয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে সে বেরুলো চা খেতে।

চায়ের দোকানে খবরের কাগজখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর ফিরে এলো নিজের ঘরে। ভাল করে স্নান করতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু কলতলায় তখনও লাইন, রাস্তার কলেও। এই লাইন দশটার আগে ফুরাবে বলে তো মনে হয় না। বাড়ী গিয়ে স্নান আহার সেরে একটা ঘুম দিয়ে আসবে কিনা তা-ই ভাবতে লাগলো। কিন্তু ইতিমধ্যে ওস্তাদের কাছ থেকে যদি খবর আসে সে লোক তো ফিরে যাবে!

গোবিন্দ সাবান আর গামছা নিয়ে কলে গিয়ে লাইন দিল।

আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর পাঁচজনের পরে পাঁচ মিনিট সে স্নান করার অবকাশ পেল।

স্নান সেরে সবে ঘরে এসে বসেছে, এমন সময় একটা ছেলে এসে দাঁড়ালো। বললো—মাষ্টারমশাইয়ের ঘরে তুমি গোবিন্দ মাইতি?

—হ্যাঁ। কেন?

—সন্ধ্যে ছ'টায় শিবুর দোকানে যাবে।

—কে বলেছে? জংলীদা?

—হ্যাঁ, ওস্তাদের খবর।

—ওস্তাদ আসবে ওখানে?

—জানি না।

ছেলেটি দৌড় দিল।

—শোন্ শোন্—

ছেলেটি একবার পিছন পানে তাকালও না।

গোবিন্দ খানিকক্ষণ ছেলেটির চলে যাবার পানে তাকিয়ে রইল

আগাগোড়া ভেবে নিল। ওস্তাদের খবর এসে গেছে। আর এই ঘরে পড়ে থাকার দরকার নেই। রাত ছয়টায় শিবুর দোকানে গেলেই চলবে।

ঘরে চাবি লাগিয়ে পথের চৌমাথায় সে বাসে উঠে বসলো।

ঠিক ছ'টার সময় গোবিন্দ এলো শিবুর দোকানে। তখনও সন্ধ্যা হয় নি। একখানা বিস্কুট আর এক কাপ চা খেতে খেতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। গোবিন্দ বললো—আজ আমাকে এখানে বসতে বলেছে।

শিবু বললো—বসুন না। জায়গার তো অভাব নেই। খদ্দের দোকানে বসবে এ তো ভাল, খদ্দের তো লক্ষ্মী। সামনে দু'চারজন থাকলে আমাদেরও ভাল লাগে। শুধু কেনা-বেচার জন্য তো চায়ের দোকান নয়, এখানে খদ্দেরের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। সেই নেশাতেই তো দোকান করা। না হলে চা বেচে আর ক'পয়সা লাভ হয়?

—আপনার তো সাইড-বিজনেসও রয়েছে—গোবিন্দ তাড়ির ব্যাপারটা ইঙ্গিত করলো।

শিবু বললো—ও তো এই চায়েরই মত। হাঁড়িওলারই সর্বস্ব, আমার শুধু কমিশন।

গোবিন্দ বুঝলো ব্যবসার ব্যাপারে বর্তমানে এদেশের কোন মানুষ সত্যি কথা বলে না, শিবুই বা বলবে কেন। হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি বেচে শিবু পয়সা পায় না, একথা অবিশ্বাস্য।

গোবিন্দ চুপ করে বসে রইল। ধীরে ধীরে ঘণ্টাখানেক কাটলো। ঘরের মধ্যে তাড়ির আসর তখন জমছে। এবার যথারীতি রাত আটটা বাজতেই সব অন্ধকার হয়ে গেল। সুরু হলো লোড-শেডিং।

মিনিট দশেক পরেই এলো জংলীদা। গোবিন্দকে দেখে বললো—কী! এসে গেছ?

—দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করছি। ছ'টায় আসতে বলেছিলেন।

—কাজের ব্যাপারে অমন বসতে হয়। এসো—

গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে জংলী চললো রেল লাইনের দিকে।

রেল লাইনের ধারে এসে জংলী বললো—এই পথ ধরে চলে যাও, কিছুটা গেলেই মুরারীপুকুরের মোড় পাবে। তারপরেই একটা গলির মুখে দেখবে বসু-কোম্পানির কারখানা। পুলিশ বসে আছে দরজায়। সেই কারখানা

পার হলেই পিছন দিকে একটা ছোট দোতলা মাটকোঠা, সেই মাটকোঠার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে। ডাকাডাকির দরকার নেই। ঠিক সময় দরজা খুলে তোমাকে ওস্তাদ ভেতরে ডেকে নেবে। যাও—

গোবিন্দ রেল লাইন ডাইনে রেখে অগ্রসর হোল।

বসু কোম্পানির কারখানা গোবিন্দর অজ্ঞাত নয়। ধীরে সুস্থে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সে চললো। রাস্তায় বিশেষ লোকজন নেই। কোন কোন বস্তির-সামনে খাটিয়া পেতে দু'চারজন বসে আছে। পথচারী সে একা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বসু কোম্পানি পার হয়ে সে পিছনের মাটকোঠার সামনে এসে পড়লো। অন্ধকারে ভূতের মতো বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

কাঠের সাঁকো দিয়ে ড্রেনটা পার হয়ে গোবিন্দ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর গোবিন্দ আর চুপ করে থাকতে পারলো না। দরজাটা সন্তর্পণে ঠেললো। দরজা খুলে গেল। ভিতরে অন্ধকার। ঠিক সেই সময় সে শুনতে পেল গম্ভীর কণ্ঠস্বর—ভিতরে এসো—

গোবিন্দ অন্ধকারে ঢুকে পড়লো। মনটা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল তবুও—

—এগিয়ে এসো—

গোবিন্দ এগোলো।

—বাঁহাতি ঘর—

গোবিন্দ বাঁ দিকের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে পা বাড়ালো। এখানকার অন্ধকার যেন আরও ঘন, আরও দুর্ভেদ্য।

কোন মতে কয়েক পা যেতেই আবার আদেশ হলো—দাঁড়াও।

গোবিন্দ দাঁড়ালো। অন্ধকারে ঠাহর করতে বৃথা চেষ্টা করলো। কিছুই দেখা যায় না।

সহসা ঘরের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। গোবিন্দ চমকে উঠে আর্তনাদ করে উঠলো। মনে হলো সে যেন অন্ধ হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিতে তার দু'মিনিট সময় লাগলো।

এবার প্রশ্ন হলো—তোমার নাম?

—গোবিন্দ মাইতি।

—তুমি কি কাজ জানো?

—কারখানায় লেদ্ মেশিনের কাজ জানি। সে চাকরি চলে যেতে ক'মাস যাদবপুরে হাবুলের দলে কাজ করেছি। হাবুল পুলিশের গুলিতে মারা যাবার পর আমরা সরে এসেছি। এখন বেকার।

—এখানকার খবর কে দিলে ?

—জংলীবাবু।

—জংলীকে কতদিন জানো ?

—আমি জানি না। সুধীর মাষ্টার সুপারিশ করে দেয়।

—সুধীর মাষ্টার বাজে লোক। তুমি কতটা সাহস ও বুদ্ধি রাখ তা আমাকে পরখ্ করে দেখতে হবে। তবে তুমি যদি পুলিশের চর হও, তাহলে তোমার নিস্তার নেই। নাহলে সাহস ও বুদ্ধি থাকলে আমার কাছে তুমি ভালমত পয়সা পাবে।

—আমি পুলিশের চর নই।

—সে আমার অজানা থাকবে না। তোমার বুদ্ধি ও সাহসেবও যাচাই করা হবে। দু'চার দিনের মধ্যেই তুমি খবর পাবে কি করতে হবে। এখনকার মত খরচ চালানোর জন্য তুমি টাকা নিয়ে যাও।

—জংলীবাবু আমাকে কাল দশ টাকা দিয়েছে।

—দশ টাকায় ক'দিন চলবে ? সামনের টেবিলে টাকা আছে তুলে নাও।



গোবিন্দ অন্ধকারে হাত বাড়ালো। সত্যি সামনে টেবিল। টেবিলের উপর হাত একটু এপাশ ওপাশ করতেই এক তাড়া নোট হাতে ঠেকলো। গোবিন্দ তুলে নিলে, বললো—এ তো অনেক টাকা !

—একশো টাকা। যাও—

গোবিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সহসা পিছনে তীক্ষ্ণ হাসি শোনা গেল। খুসির হাসি নয়। এই হাসিতে কেমন যেন একটা ধার আছে, শুনলে মাথার মধ্যে শির শির করে ওঠে। গোবিন্দ থমকে দাঁড়ালো।

হাসি থামলো। সন্ত্রস্তভাবে গোবিন্দ সোজা বেরিয়ে এলো রাস্তায়। পথের

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কি বিশ্রী হাসি। এই হাসির জন্যই বুঝি ওর নাম হাস্নু পাণ্ডা।

রাত দশটায় বাড়ী ফিরে গোবিন্দ শুয়ে পড়েছিল। সকালে দাড়ি কামিয়ে গোবিন্দ সহজভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, এমন সময় অনিল এসে পড়লো। বললো—গাড়ী নিয়ে এসেছি চল। বাবা তোমার সঙ্গে একবার আলাপ করতে চায়।

—কেন ?

—তুমি আমার সঙ্গে থানায় গিয়েছিলে, পুলিশের সঙ্গে তোমার খাতির দেখে বাবা বড় উৎসুক হয়েছেন, ঘণ্টাখানেকের জন্য তুমি একবার চল। কারখানা সম্পর্কে বাবা তোমার পরামর্শ নেবেন।

—কারখানার ব্যাপার তো আমি কিছুই বুঝি না।

—তবু একবার চল—

হাতে কোন কাজ ছিল না। গোবিন্দ বেরিয়ে পড়লো।

ইম্প্রুভমেণ্টের এলাকায় নতুন পল্লীর মধ্যে সুদৃশ্য একখানি দোতলা বাড়ী। সামনে ফটক। ফটকের মাথায় দোতলার ঝুল বারান্দা। বারান্দায় শরৎবাবু বসেছিলেন, অনিলকে গাড়ী থেকে নামতে দেখেই বললেন—একেবারে উপরে নিয়ে এসো।

গোবিন্দ উপরে এলো। শরৎবাবুর সঙ্গে পরিচয় হলো। বছর ষাট বয়স হবে, একহারা সুপুরুষ। পায়জামা ও বুশসার্ট পরে চুরুট খাচ্ছিলেন। প্রথম পরিচয়ের পালা শেষ হতেই বললেন—চা খেতে খেতে কথা হোক্।

চাকর কফি ও বিস্কুট দিয়ে গেল। শরৎবাবু কথা সুরু করলেন—তুমি তো অনিলের সঙ্গে কলেজে পড়তে শুনলাম। এখন ওকালতি কর। ওকালতি ছাড়াও সখের গোয়েন্দাগিরি করে তুমি তো পুলিশ-মহলে বেশ খাতির জমিয়েছ। তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। অবশ্য যদি শেষ অবধি কোন বিপদে না পড়। সাপের রোজা অনেক সময় সাপের কামড়েই মরে, গোয়েন্দাকেও অনেক সময় খুনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়। কালই তো কাগজে পড়লাম গিরিন চক্রবর্তী নামে এক গোয়েন্দা খুন হয়েছে। পুলিশ খুনীকে ধরতে পারে নি। কলিকাতার পুলিশ দিনে দিনে একেবারে অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দ এবার কথা বললো—খুনী খুন করে চিরদিনই পালিয়ে যায়। নানা

সূত্র থেকে পরে পুলিশ তাকে ধরে। অবশ্য এজন্য সময় লাগে। অনেক সময় বছর ঘুরে যায়। এজন্য পুলিশকে দোষ দেওয়া যায় না। সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় না হলে তো কিছু করার থাকে না। তাছাড়া দেশের পঞ্চাশ কোটি মানুষের মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট লোককে খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়।

—শুনলাম কয়েকদিন আগে পাইকপাড়ার এক কালোয়ারের ফ্ল্যাটে অনেক টাকার গয়না চুরি হয়ে গেছে।

—শুনেছি।

—তার কি কোন কিনারা পুলিশ করছে?

—চোরটাকেই তো ধরেছিল, তবে মাল পায়নি বলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে আশা রাখে সেই সূত্রেই কাজ হাসিল হবে।

গোবিন্দ হারাধনের ঘটনাটি বললো শরৎবাবুকে। বললো—ওই হারাধনের ব্যাপারেই গিরিনবাবু খুন হয়েছেন বলে পুলিশের ধারণা। গিরিনবাবু আমাব বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ওই ব্যাপারটায় আমিও তাই মাথা ঘামাচ্ছি। এব পিছনে একটা দল আছে বলে আমার ধারণা।

—তুমি কি রীতিমত গোয়েন্দাগিরি কর? তাহলে ওকালতি কর কখন?

—ছেলেবেলায় মাসিক পত্রে ধাঁধার জবাব দিতাম। এখন নানা সূত্র ধরে খুনের ধাঁধার সমাধান করার চেষ্টা করি। সব সময় তো মামলা থাকে না। তখন এই ধাঁধায় দিব্যি সময় কাটে।

—তা ভাল, তবে তুমি আমায় একটু সাহায্য করো। আমি এই কারখানা আর চালাবো না। খদ্দের খুঁজছি। খদ্দের যদি পাই তখন লেদ মেশিনগুলো বিক্রী করে দোব। পাড়ার ছেলেরা মেশিন বের করার সময় গোলমাল না করে তখন আমার পুলিশের সাহায্য চাই।

—যদি তেমন অবস্থা হয় আমাকে তখন জানাবেন।

দুপুর বেলা থানা থেকে একখানা সাইকেল নিয়ে গোবিন্দ বসু কোম্পানির কারখানা ও তার চারিপাশটা ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখে গেল। অচেনা মুখ দেখে স্থানীয় ছেলে-ছোকরা কেউ কিছু না সন্দেহ করে সেজন্য তার সাইকেলের রং ছিল লাল, গোবিন্দের বেশভূষা ছিল খাকী—দেখে মনে হবে একেবারে পুরোদস্তুর টেলিগ্রামের পিওন।

রাত আটটার পর যথারীতি ব্ল্যাক-আউট হবার পর গোবিন্দ এসে

পৌঁছালো মাণিকতলার মোড়ে। অন্ধকারে সে এগিয়ে চললো রেল লাইনের পাশের রাস্তা ধরে। আজ ওই বাড়ীটার উপর সে নজর রাখবে। দরকার হলে ভিতরে ঢুকেও দেখবে। সেজন্য সে তৈরি হয়েই এসেছে।

বসু কোম্পানি পার হয়েই পোড়ো জমি। জমিটার একটা কোণে দাঁড়ালে ওই মাটকোঠার পিছনের দোতলার কিছু অংশ দেখা যায়।

অন্ধকারে চারিপাশ একবার দেখে নিয়ে গোবিন্দ মাটকোঠার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারে দরজার কড়ার উপর হাত বুলিয়ে দেখলো —দুপুরে যেমন দেখে গেছে—কড়ায় তালা লাগানো। গোবিন্দ গিয়ে উঠলো সেই পোড়ো মাঠে। সন্তর্পণে এগিয়ে গেল সেই মাঠের কোণে। দুপুরে একটা জায়গা নজর করে গিয়েছিল সেইখান বরাবর গিয়ে পকেট থেকে একখানা পলিথিনের পাতলা কাগজ বের করে পেতে বসলো।

অন্ধকারে এই ভূতের মতো বসে থাকা রীতিমত ধৈর্যের ব্যাপার, তবে এ ধরনের কাজে গোবিন্দর কিছু কিছু অভ্যাস আছে। গোবিন্দ মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যে রাত দশটা অবধি বসবে, রাত দশটায় ব্ল্যাক-আউট ঘুচে যাবে, পথের আলোগুলি জ্বলে উঠবে, তখন আর এভাবে বসে থাকা চলবে না, অন্য লোকের নজরে পড়ার সম্ভাবনা।

অন্ধকারে গোবিন্দ বাড়ীটার পানে তাকায় আর ঝিমোয়। পিছনে হেলান দেবার মত কিছু থাকলে আরো আরামে বসা যেতো।

এই রকম অবস্থায় ঘড়ি বড় ধীরে ধীরে চলে। গোবিন্দের সময় কাটতে লাগলো অতি ধীরে।

বসে ঝিমিয়ে অনেকক্ষণ কাটানোর পর গোবিন্দ হাত-ঘড়িটার পানে তাকালো, অন্ধকারেও দেখা গেল মাত্র ন'টা বেজেছে। এতক্ষণে সময় কেটেছে মাত্র একটি ঘণ্টা।

আরও একঘণ্টা এইভাবে কাটাতে হবে।

এই সময় একখানা ট্রেন আসার শব্দ হলো। ট্রেনখানা ঝক্ ঝক্ করে একটা আলোর মালা নিয়ে এগিয়ে গেল। সেই শব্দের মধ্যে অতি ধীরে একখানি গাড়ী এসে থামলো সেই মাঠের সামনে। গাড়ী থেকে বোধ হয় একজন নেমে এলো। মাটকোঠার তালা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে। গাড়ীতে আর লোক আছে কিনা গোবিন্দ ঠাহর করতে পারলো না। তবু সন্তর্পণে সে উঠে দাঁড়ালো, এগোলো গাড়ীটির দিকে।

গাড়ীর পিছনে এসে ভিতরে উঁকি দিল। কেউ নেই। ওদিকে বাড়ীটার মধ্যে টর্চের আলোর ফালি ফালি আভাস চোখে পড়লো। গোবিন্দ পকেট থেকে পেনসিল টর্চ বের করে মোটরের নম্বরটা দেখে নিলে : ৩৪৮৬৪।

এবার গোবিন্দ দরজার সামনে এলো। ভিতরে আর আলো দেখা যাচ্ছে না। ভিতরে ঢুকবে কিনা ইতস্ততঃ করলো। প্যাণ্টের পকেটে পিস্তলটা আছে কিনা দেখে নিল। তাবপর অতি সন্তর্পণে ঢুকে পড়লো বাড়ীটার মধ্যে।



অন্ধকারে সন্তর্পণে দেয়ালের পাশ দিয়ে অগ্রসর হলো। দুটি ঘরের দরজা পার হবার পর মনে হলো বাঁদিকের ঘরের মধ্যে যেন টর্চের আলো জ্বলে উঠলো। অন্ধকার তখন চোখে সহে গেছে। ডানদিকের ঘরের শেষে একটা ছোট খুপড়ির মতো মনে হলো। গোবিন্দ তার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বাঁ-দিকের ঘরের আলোটা টর্চের। অনেকটা ভিতর দিক থেকে আসছে। জ্বলছে আর নিভছে। গোবিন্দের কৌতূহল হলো। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য একবার সেইদিকে এগোবার জন্য উৎসুক হলো। কিন্তু সবকিছু না দেখে বেশী ভিতরে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। ভেবে চুপ করে রইল।

মিনিট দশেক পরে আলোটা এগিয়ে এলো এদিকে।

মুখ দেখা গেল না, সরু পেনসিল টর্চ জ্বালিয়ে একটি লোক বেরিয়ে গেল। বাড়ীর দরজায় তালা দেবার শব্দ হলো। তারপর মোটরের ইঞ্জিনেব শব্দও শোনা গেল।

আরো দু'মিনিট গোবিন্দ চুপ করে অপেক্ষা করলো।• তারপর টর্চ ও পিস্তল নিয়ে সেই বাঁদিকের ঘরের মধ্যে অগ্রসর হলো।

ফাঁকা ঘর। ঘর পার হয়ে একটা ছোট বারান্দা। তারপর আবার এক দরজা। সে দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকতেই কারখানা-ঘর। পরপর লেদ মেশিন ও ড্রিল মেশিন বসানো। এ তো বসু কোম্পানির কারখানা, পাশের বাড়ীর সঙ্গে দরজা দিয়ে এই কারখানাটি যুক্ত হচ্ছে। কারখানার সামনের ফটকে তো পুলিশ পাহারা বসেছে। সেইজন্যই কি পিছনে এই ব্যবস্থা!

কিন্তু বন্ধ কারখানায় এভাবে একটি লোকের লুকিয়ে আসা-যাওয়ার কারণ কি! গোবিন্দ ঘরের সর্বত্র টর্চের আলো ফেললো।

ওদিকে একখানি বেঞ্চি পাতা। বেঞ্চিতে কে যেন শুয়ে আছে। টর্চ নিভিয়ে গোবিন্দ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করলো।

নাঃ, বেঞ্চির মানুষটির দিক থেকে কোন সাড়া নেই।

গোবিন্দ মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে টর্চ আবার জ্বাললো। তারপর এগিয়ে গেল। বেঞ্চির পাশে গিয়ে লোকটির মুখে টর্চের আলো ফেলেই সে· চমকে গেল। গলায় সিল্কের রুমাল জড়িয়ে মানুষটিকে হত্যা করা হয়েছে। লোকটির মুখখানা চেনা-চেনা।

পরক্ষণেই মনে পড়লো একে গোবিন্দ থানায় দেখেছে—হারাধন দাস। বুকের উপর ঝক্‌ঝক্ করছে একটা সোনার ধুকধুকি। ধুকধুকিটা গোবিন্দ তুলে নিলে। একটা কণ্ঠহার থেকে কেউ যেন এটাকে কেটে নিয়েছে।

ধুকধুকিটা গোবিন্দ পকেটে ভরলো। নিজেকে সহসা বড় দুর্বল ও নিঃসঙ্গ মনে হলো। এভাবে একটা মৃতদেহের মুখোমুখি আসতে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

গোবিন্দ ফিরলো। মাটকোঠার দরজা বন্ধ। একপাশে পাঁচিল ছিল। ইঁট বের করা পাঁচিল। ইটের ফাঁকে পা দিয়ে দেয়াল টপ্‌কে গোবিন্দ বাইরের মাঠে গিয়ে নামলো। তারপব অন্ধকারেই দ্রুত পদে অগ্রসর হলো।

থানায় নরেশবাবু ডা" রি চেক্ করছিলেন, গোবিন্দ ঘরে ঢুকে বললো—আবার খুন—হারাধন দাস, তার বুকের উপর এই ধুকধুকি!

হারাধনের মৃত্যু পুলিশকে বিমূঢ় করে দিল। রেশমী রুমালে আঙুলের ছাপ থাকে না। হত্যাকারীকে সনাক্ত করার কোন সূত্র পুলিশ পেল না। তবে শ্বাসরোধই যে মৃত্যুর কারণ সে কথা করোনারের আদালতে নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হলো। এখন হত্যাকারীকে খুঁ" বের করার দায়িত্ব পুলিশের।

একমাত্র সূত্র কণ্ঠহারের ধুক্‌ধুকি।

রামলাল আগরওয়ালাকে থানায় ডেকে এনে ধুকধুকিখানা দেখানো হলো, রামলাল বললো—এটা আমার চুরি যাওয়া নেকলেশের লকেট।

হারাধনকে খুন করে তার বুকের উপর লকেটটা রেখে যাবার কারণ কি?

আলোচনা প্রসঙ্গে গোবিন্দ নরেশবাবুকে বলেছিল—এ থেকে অনেকগুলো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ, কণ্ঠহার যে হস্তগত করেছে সে-ই হারাধনকে

খুন করেছে। দ্বিতীয়তঃ, কণ্ঠহারটা সে সম্ভবতঃ হারাধনের সাহায্যেই সংগ্রহ করেছিল, সে সম্পর্কে হারাধন বোধহয় মোটা টাকা দাবী করেছিল। সেই দাবীকে উপহাস করে তার মৃতদেহের বুকের উপর ধুকধুকিখানা রেখে গেছে। তৃতীয়তঃ, পুলিশকেও সে পরিহাস করেছে—দেখ, আমি কি করতে পারি। চতুর্থতঃ, সে পয়সাওলা লোক। ওই ধুকধুকিতে এক ভরির বেশী সোনা আছে। বর্তমান বাজারে ওই সোনাটুকুরই দাম অন্ততঃ সাত-আটশো টাকা। এই টাকা সে সামান্য বলেই মনে করে। পঞ্চমতঃ, তার সঙ্গে হারাধনের নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। আমি খবব নিয়ে জেনেছি সেদিন হাবাধন শিবুর দোকানে তাড়ি খেতে গিয়েছিল, আলো নিভে যাবার পরমুহূর্তেই একটি ছেলে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। তারই প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে তার মৃতদেহ আমার নজরে আসে। যে মোটরখানি আমি দেখেছি ওই মোটবেই মৃতদেহ আনা হয়েছিল। একটি লোকই গাড়ীতে এসেছিল, একজনকেই আমি বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। ওই লাশ সে একাই বহে নিযে গিযে ভিতরের বেঞ্চিতে শুইয়ে দিয়ে এসেছিল। সে বলবান ব্যক্তি। ওই বাড়ীতে আমাকে যে একশো টাকা দিয়েছিল এবং যার হাসি আমি শুনেছিলাম, সেই হাসু পাণ্ডা আর এই খুনী একই লোক বলে আমার ধারণা। তা না হলেও এই খুনী হাসু পাণ্ডার দলের লোক তো বটেই এবং হাসু পাণ্ডার নির্দেশেই এই কাজ হচ্ছে। ওই খালি মাটকোঠা ওদের দলের একটা আড্ডা। তবে এখন কিছুদিনের মত ওরা আর ওখানে আসবে না।

নরেশবাবু বললো—আপনার সিদ্ধান্ত সবই যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু শেষেব কথাটি বাদে। আমরা খুনের ব্যাপারে দেখেছি, খুনী যেখানে খুন করে সেখানে আবার ফিরে আসে। আর এই ফিরে আসার জন্যই তারা ধরা পড়ে। অবশ্য সেজন্য অপেক্ষা করতে হয়—সময় সাপেক্ষ। যত দিন যাবে খুনী নিজেকে ততো বেশী নিরাপদ মনে করে কম সাবধান হবে।

গোবিন্দ বললো—খুনীকে ধরার উৎসাহটা আমাদের দিক থেকেও তো দিনে দিনে কমবে। খুনী এসে সহজে ধরা দেবার প্রত্যাশা না রেখে, আমরা খুনীকে ধরতে পারি কিনা সেই চেষ্টা জোরদার করার আমি পক্ষপাতী।

—কিন্তু কোন্ সূত্র ধরে আমরা এগোবো?

—সেই সূত্রের কথা আলোচনা করতেই আমি আপনার কাছে এসেছি। প্রথমতঃ, এই যে ছেলেটা সংবাদ বহে আনে, খবর দেয়, লোক ডাকে, একে

ধরতে হবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সেই মোটর গাড়ীখানার সন্ধান করা, কে তার মালিক?

—মোটর গাড়ী সবই একরকম—

—তার নম্বর আমার কাছে আছে, বাড়ীতে ঢোকার আগে তার নম্বর আমি দেখেছিলাম—৩৪৮৬৪।

নরেশবাবু উৎসাহিত হলো, বললো—একথা আগে বলতে হয়। একঘণ্টার মধ্যে আমাদের বালিগঞ্জের আপিস থেকে ওর মালিকের নাম ঠিকানা পেয়ে যাবো। কিন্তু নম্বর প্লেটটা আসল কি জাল সেইটাই হচ্ছে কথা। যাক, আমি এখনি টেলিফোন করছি, আপনি বসুন।

নরেশবাবু টেলিফোন করলেন, তারপর একজন অফিসারকে ডেকে বললেন—মোটর ভিহিকিলস্‌কে বলে দিয়েছি, এই নম্বরের মালিকের নাম ঠিকানা নিয়ে এসো—মোটর বাইকে বেরিয়ে যাও।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সার্জেণ্ট এসে খবর দিল গাড়ীর মালিক শরৎকুমার বসু, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড।

গোবিন্দ বললো—ইনি তো বসু কোম্পানির মালিক, অনিলের বাবা। ষাট বছরের বৃদ্ধ, পড়াশুনা করেন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

নরেশবাবু বললেন—তাহলে গাড়ীর নম্বর জাল।

শরৎবাবু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁর মোটর খুনীর দলে কাজে লাগানো হয়েছে, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেদিক থেকে নরেশবাবুর মত যুক্তিসিদ্ধ—মানতেই হবে। গোবিন্দও সে কথা স্বীকার করে তবু নরেশবাবু ও তাঁর মোটরখানার উপর একটু নজর রাখতে গোবিন্দর আগ্রহ হয়।

রবিবার সকালে ঘুরতে ঘুরতে গোবিন্দ শরৎবাবুর বাড়ীর পথ ধরে। বাড়ীর ফটকের সামনে এসে দেখে শরৎবাবুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কালো রঙের অ্যামব্যাসাডর। গাড়ী থেকে শরৎবাবু কয়েকখানি কাঠ নামাচ্ছেন। গাছের ডাল, দশ-বারো ইঞ্চি পরিধি আর এক ফুট সওয়া ফুট লম্বা। গোবিন্দ বললো—নমস্কার স্যার, অনিল আছে?

—নিশ্চয় আছে,—শরৎবাবু বললেন—সকালে এসময় সে তো বেরোয় না। চল, উপরে চল—

—এতো কাঠ এনেছেন কেন?

—কেন বল দিকি ?

—জানি না।

—এ আমার সখের ব্যাপার—'হবি', এই কাঠ কুঁদে কুঁদে এক একটি মূর্তি তৈরী হবে। জন্তু পাখী থেকে কেষ্ট বিষ্টু বুদ্ধদেব।

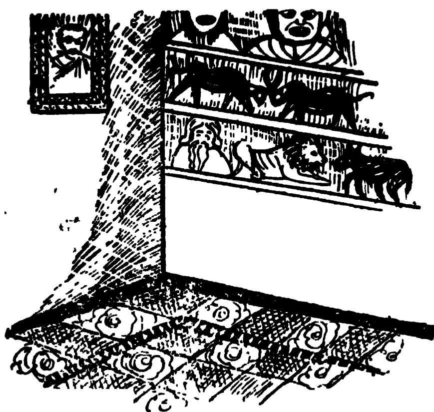
—আপনি তৈরী করেন ?

—আর কে করবে ? দুপুরে তো আমি ঘুমাই না, বসে বসে এই সবই করি। সব কাঠে তো এসব কাজ হয় না, তাই কাঠগোলায় গিয়ে নিজে দেখেশুনে নরম কাঠ কিনে আনি। ওরে ভজা, কাঠগুলো উপরের ঘরে তুলে দে বাবা।...গোবিন্দবাবু এসো, তোমাকে আমার যাদুঘর দেখিয়ে আনি—

গোবিন্দর হাত ধরে শরৎবাবু সিঁড়ির দিকে এগোলেন। সিঁড়ি উঠতে উঠতে গোবিন্দ ভালভাবেই বুঝতে পারলো যে শরৎবাবু বৃদ্ধ হলেও তাঁর দেহে যথেষ্ট শক্তি আছে। তবু গোবিন্দ একবার পরখ করার জন্য সিঁড়ির উপর ঠোক্কর খাওয়ার ভাণ করলো। পড়ো-পড়ো হয়েও সে পড়লো না।

শরৎবাবু শক্ত হাতে তাকে খাড়া করে দিলেন। মনে হলো এ তো ষাট বছরের বৃদ্ধের হাত নয়, শক্তিমান যুবকের বলিষ্ঠ হাত।

শরৎবাবু গোবিন্দকে উপরের এক বড় ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরের মধ্যে একখানি বেতে বোনা বড় সোফা, তিনচারজন বসতে পারে, অথবা একজন লম্বা হয়ে শুতেও পারে। সামনে ছোটছোট দুটি টেবিল, আর এক ধারে একটি আল্‌না। উপরের দেয়ালে মহাপুরুষদের বড় বড় বাঁধানো ছবি সারি সারি টাঙানো—বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজী প্রভৃতি। একদিকের দেয়াল সংলগ্ন দুটি বুককেস, রবীন্দ্র রচনাবলী, শরৎ রচনাবলী, বিবেকানন্দ রচনাবলী ও অন্যান্য বাঁধানো বইয়ে ঠাসা। আরেক দিকে দেয়াল সংলগ্ন এক ফুট চওড়া পর পর টানা তিনটি তাক। তার উপর নানা রকম কাঠের মূর্তি। গরু, ঘোড়া,



কুমীর, হরিণ, সিংহ, একসিংওলা দৈত্য, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, যীশু, বুদ্ধদেব, গণেশ, নটরাজ প্রভৃতি। তাকের নীচে কিছু কাঠ পড়ে আছে।

শরৎবাবু বললেন—অবনঠাকুরের কাছে যেতাম, তাঁর সেই সব কাটুম-কুটুম দেখে আমার এই হবি মাথায় আসে। দশ বছর ধরে দুপুরে বসে বসে এই সব করেছি। পাছে কেউ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে তাই আমি যখন বাড়ী থাকি না, এ ঘরে চাবি বন্ধ থাকে।

মূর্তি দেখে, বই দেখে, ছবি দেখে, গোবিন্দ মনে মনে লজ্জিত হলো, এমন রুচিবান মানুষকে সে সন্দেহ করেছিল খুনীর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে ভেবে। এই মানুষের মন সংস্কৃতিবান, নীচতা এমন মনকে সহজে প্রভাবিত করতে পারে না। সেদিন শরৎবাবুর কাছে গোবিন্দর প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল।

গোবিন্দর হাতে পর পর তিনটি ফৌজদারী মামলা এসে পড়লো। সেই মামলা সম্পর্কে গোবিন্দ সপ্তাহখানেক খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ আর গোবিন্দর ছিল না।

শেষ মামলাটি গোবিন্দকে আবার হাস্নু পাণ্ডার কথা মনে করিয়ে দিলে।

মঙ্গলদাস কিষণদাস উল্টাডিঙ্গি স্টেশনে নেমে নতুন সি-আই-টি রোড দিয়ে যাচ্ছিল। আলোহীন পথে হঠাৎ একটি লোক তাকে আক্রমণ করে তার হাত থেকে ফোলিও ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়। মঙ্গলদাস চীৎকার করে ওঠে ও লোকটির পিছনে ছোটে। ভাগ্য ভাল, ঠিক সেই সময় একটি পুলিশ সার্জেন সাইকেল চড়ে আসছিল, সে টর্চের আলো ফেলে তখনই পলাতককে ধরে ফেলে। পরে থানায় এসে ফোলিও ব্যাগ খুলে দেখা যায় তার মধ্যে কয়েকখানি সোনার বিস্কুট। এই বিস্কুট বিদেশ থেকে আমদানী সোনা। মঙ্গলদাস এসব কোথায় পেল তার কোন কৈফিয়ৎ সে দিতে পারে না। পুলিশ মঙ্গলদাস ও ছিনতাইকারী দু'জনকেই হাজতে ভরে। মঙ্গলদাসের জামিনের জন্যই গোবিন্দ ওকালতি করেছিল। দশ হাজার টাকার জামিনে মঙ্গলদাস মুক্তি পেল। জামিন পেয়ে মঙ্গলদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, আদালত থেকে বেরিয়ে এসেই সামনের দোকান থেকে একেবারে দশ টাকার সন্দেশ কিনে দিল। সেই উচ্ছ্বাসের মুখে কথায় কথায় গোবিন্দ জানতে পারলো মঙ্গলদাস একজন পাকা চোরাকারবারী। কলকাতার ডক থেকে শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে লাখ

লাখ টাকার সোনা সে আমদানী করে এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে তা গোপনে বিক্রী করে। মুনাফাবাজরা আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য টাকা ব্যাঙ্কে রাখে না, ঘরে নোট জমায়। একশো টাকার নোট যদি গভর্মেণ্ট কোনদিন বাতিল করে দেয় তখন তো বিপদে পড়বে; সেই কারণে তারা এই চোরাই সোনা কিনে রাখে। সোনার দাম দু-দশ টাকা কমতে-বাড়তে পারে কিন্তু এ টাকার কোন মার নেই। মঙ্গলদাসের এক খদ্দের জুটেছে মাণিকতলায়। মঙ্গলদাস সেইখানেই যাচ্ছিল এই সোনার বিস্কুট বেচতে। সেই খদ্দেরের ঠিকানাটা মঙ্গলদাস এক সময় বলে ফেললো। নাম অবশ্য বললো না।

ঠিকানা শুনেই গোবিন্দ চমকে উঠলো। এ তো শরৎবাবুর বাড়ীর ঠিকানা। শরৎবাবু চোরা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনার বিস্কুট কেনেন? শরৎবাবুর কারখানা তো বন্ধ। কোন আয় নেই, আয়কর ফাঁকি দেবারও কোনো প্রশ্ন নেই। এখন তিনি সোনার বিস্কুট কেনার অর্থ পাচ্ছেন কোথা থেকে?

গোবিন্দ নতুন ভাবনায় পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে লোড-শেডিং-এর ব্ল্যাক-আউট বেড়ে গেল। উল্টাডিঙ্গি মাণিকতলা প্রভৃতি অঞ্চলে যেদিন কারেণ্ট আসছে না, সন্ধ্যা থেকেই আসছে না। তারপর যখন আসছে তখন লোকের আর আলোর প্রয়োজন নেই, রাত তখন গভীর। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি খবরের কাগজে একটা নিবেদন ছাপিয়েছেন, এই অবস্থা এখন চলবে। সাধারণ মানুষকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে হবে। লণ্ঠন মোমবাতির চাহিদা বেড়ে গেছে। কেরোসিন তেল খুচরা বাজারে বিক্রী হচ্ছে দ্বিগুণ দামে, বাতির দামও বেড়েছে। সাধারণ মানুষ মুখ বুজে সবই সইছে, তারা জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত, তার উপর দীর্ঘকালের স্বল্পাহারে বাদ-প্রতিবাদের মনোবল শেষ হয়ে গেছে।

তবে কিছু মানুষের সুবিধা হয়েছে—পকেটমার, ছিনতাইকারী, কেরোসিন বিক্রেতা, বাতিওলা, লণ্ঠন-নির্মাতা, যথেষ্ট মুনাফা লুটছে।

গোবিন্দ এই সুযোগটা কাজে লাগাবে বলে মনস্থ করলো।

রাত দশটার পর গোবিন্দ এসে দাঁড়ালো শরৎবাবুর বাড়ীর সামনে। সারা বাড়ী অন্ধকারে ডুবে গেছে। শুধু তিনতলার একখানি ঘরে মৃদু আলোর আভাষ দেখা যাচ্ছে। ওইটেই শরৎবাবুর যাদুঘর, ওখানে তাহলে শরৎবাবু এখনও কাজ করছেন।

লোহার দশ ফুট উঁচু ফটক, পাশে পাঁচ ফুট পাঁচিল। গোবিন্দ গেটের ছুটি বেয়ে উঠে পাশের পাঁচিল ধরলো। পাঁচিলের উপর উঠলো। ধীরে ধীরে নেমে পড়লো ভিতরে।

সারা বাড়ী শুব্ধ।

সদর দরজা বন্ধ।

কয়েকখানি ঘরের দরজাও বাইরের জমিতে এসে পড়েছে, তা-ও বন্ধ।

পিছনে একটা খিড়কি দরজা আছে, সেটাও বন্ধ।

গোবিন্দ তৈরী হয়েই এসেছিল, কোমরে ছিল আঁকশি লাগানো দড়ি। সেই দড়ির বাণ্ডিল গোবিন্দ খুললো। আঁকশি ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল ছাদের দিকে। বাড়ীর সেদিকটা একতলা, ছাদ নীচু, মাত্র বারো-তেরো ফুট উপরেই পাঁচিল। আঁকশি আটকালো দেয়ালে। দু'তিনবার গোবিন্দ ভাল করে দড়িটা টেনে দেখে নিলে, তারপর সেই দড়ি ধরে উঠে গেল ছাদের উপর।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে ছাদ পার হয়ে সে এলো দোতলার সিঁড়ির মুখে। সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে উঠে গেল তিনতলায়।

একখানি প্রশস্ত ঘর। সামনে ছাদ।

ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে উঁকি মারতেই দেখা গেল টেবিলের উপর মোমবাতি জ্বলছে। সেই আলোয় একটা কাঠের পুতুলে শরৎবাবু খোদাই চালাচ্ছেন। এই রাতে, স্তিমিত আলোয় বসে কাঠ খোদাই করার মত ছবি দেখলে মনে হয় মানুষটা বেজায় খেয়ালী—এক ধরনের পাগল ছাড়া আর কিছু নয়।



গোবিন্দ এবার ছাদের উপর দিয়ে ঘুরে গেল ঘরের আর এক দিকের জানালার সামনে। সেখান থেকে শরৎবাবুর কাজকর্ম আরো ভাল করে নজরে রাখা যায়।

এবার ভালভাবেই দেখা গেল, শরৎবাবু সেদিন যেসব কাঠ কিনে এনেছিলেন সেই কাঠের একটি নিয়ে তার মধ্যে ড্রিল চালিয়ে একটা ফুটো করছেন।

খানিক খানিক ড্রিলে কাটছেন আর টর্চের আলো ফেলে দেখছেন, গর্তটা ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা।

কাঠের মূর্তি যিনি খোদাই করবেন, তিনি তো কাঠের বাইরের দিকেই কাজ করবেন, কাঠের ভিতর দিকে গর্ত করার প্রয়োজনটা কি ? এবং তা এই রাত দশটার পর মোমবাতির আলোতেই বা করতে হবে কেন ?

গোবিন্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

রাত এগারোটা বাজলো তখনও শরৎবাবুর ক্লান্তি নেই।

আরো মিনিট পনেরো বাদে, আলো ফেলে দেখে শরৎবাবু সন্তুষ্ট হলেন। কাজ থামালেন। কাঠ, ড্রিল সব টেবিলের উপর রেখে আলো নিভিয়ে উঠে পড়লেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে শুতে চলে গেলেন।

গোবিন্দ কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর এগিয়ে এলো দরজার দিকে। ঘরের দরজায় শিকল লাগানো ছিল, সন্তর্পণে শিকল নামিয়ে সে ঘরের ভিতর ঢুকলো।

টর্চ জেলে গোবিন্দ গেল দেয়ালের তাকের দিকে। তাকের উপর পর পর সব কাঠের পুতুল সাজানো আছে। গোবিন্দ হাতীর মূর্তিটা তুলে নিলে। মূর্তিটা বেশ ভারী! গোবিন্দ মূর্তিটাকে উল্টে-পাল্টে দেখলে।

ঠিক সেই সময় গোবিন্দকে কে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো, নাকে চেপে ধরলো একখানি রুমাল। গোবিন্দ তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। লোকটির দেহে যেন অসুরের শক্তি। মিনিট খানেক জোর-জবরদস্তি করতে করতেই গোবিন্দ শক্তিহীন হয়ে পড়লো। লোকটি এবার অতি সহজেই গোবিন্দকে ধরে এনে বড় বেঞ্চিটার উপর শুইয়ে দিলে। রুমালখানি কিন্তু গোবিন্দর নাকের উপরেই ঢাকা দেওয়া রইল।

ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে রাহাজানি ও চুরি বাড়ছে। সেইজন্য এদিকে পুলিশ রাতে বিশেষভাবে ঘোরাফেরা করতে সুরু করেছে। তার উপর পুলিশ-ভ্যান টহল দেয় সারারাত।

সব সময় পুলিশ চক্কর দিতে পারে না। মাঝে মাঝে কোথাও-না-কোথাও খানিক বসেও থাকে। শেষ রাতের দিকে কোন কোন চৌকিদার কোন দোকানের চাতালে বা বাড়ীর রোয়াকে বসে বসে এক ঘুম ঘুমিয়েও নেয়। রামকমলও ঘুমুচ্ছিল। উল্টাডিঙ্গিতে নতুন পুল তৈরী হচ্ছে। খালের ধারে

বাঁশ, শালের খুঁটি, লোহার শিক, কাঠের পাটা, ইট, পাথর-কুচি, ঢালাই-করা সিমেণ্ট-পাইপ এবং আরো কত-কি স্তূপাকার জমেছে খালের দু'পাশে। সেখানে একটা খুঁটিতে বসে আর একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে খানিকটা সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সার্জেণ্ট রোঁদে বেরুলেও বিশেষভাবে নজর না দিলে নজরে আসবে না।

বাঙালী পাহারাদার রামকমল দাস এই স্থানটি আবিষ্কার করেছে, প্রতিদিন এখানে এসে ঘণ্টা দু'য়েক সে ঘুমিয়ে নেয়। আজও ঘুমুচ্ছিল, হঠাৎ মোটরের ব্রেক কষার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। এপাশে ওপাশে ভাল করে তাকিয়ে নজরে পড়লো একখানি কালো মোটর এসে খালের ধারে দাঁড়িয়েছে। এখানে এই রাতে প্রাইভেট গাড়ী কেন, নিশ্চয় কোন দুষ্ট মতলব আছে। ব্যাপারটা কি দেখতে হয়। রামকমল চুপচাপ বসে রইল।

মোটরের পিছনে লাল আলোটি ছাড়া আর কোন আলো নেই। সে আলোয় গাড়ীর নম্বর পড়া যায় না।

একটি লোক মোটর থেকে নামলো, কি-একটা নামালো। তারপর গেল জলের ধারে। খুন করে খুনী খালের ধারে লাশ ফেলতে এসেছে নাকি? মোটরের নম্বরটা তো দেখতে হয়। কিন্তু খুনীর কাছে নিশ্চয়ই পিস্তল আছে, গুলি চালাতে পারে। সামনে গিয়ে পড়া ঠিক হবে না।

লোকটা বোঝাটা জলে ফেলে দিয়ে গাড়ীতে ফিরে এলো। রামকমলও লাফিয়ে উঠে ছুটলো গাড়ীর দিকে। গাড়ীর কাছে এসে যখন সে নম্বরটা পড়ে ফেলেছে, তখন হুস করে গাড়ীটা বেরিয়ে গেল। রামকমল এবার জলের কিনারায় এগিয়ে গেল। কিছুই দেখা যায় না।

জলের ধারে এসে টর্চের আলো ফেলে হাতের ব্যাটমটা দিয়ে রামকমল জলে খোঁচা মারলো। এবার লাঠিতে কি একটা লাগলো। একহাঁটু জলে নেমে রামকমল হাত বাড়ালো। হাতে যা ঠেকলো টেনে তুলে আনলো। এ যে একটা হাত-পা বাঁধা মানুষ। মরে গেছে নাকি?

রামকমল ঠিক কিছু বুঝলো না। তবু লোকটার পা দুটো ধরে মাথাটা নীচে ঝুলিয়ে দিল। গল গল করে মুখ দিয়ে অল্প জল বেরুলো। দু'চারটে ঝাঁকানি দিয়ে রামকমল দেহটাকে নামিয়ে দিল। মনে হলো যেন শ্বাস বইছে, দেহটা তো মড়ার মত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। রামকমল মানুষটিকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে তার পেটে বুকে চাপ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস বহাবার

জন্ম সচেষ্ট হলো। দু-চারবার চেষ্টা করতেই মানুষটি শ্বাস টানতে সুরু করলো।

ঠিক সেই সময় মাথার উপর সার্চ লাইটের আলো ফেলে পুলিশ-ভ্যান দেখা দিল। সেই আলো রামকমলের উপর দিয়ে ঘুরে গেল। ভ্যান এসে থামলো। পিস্তল হাতে নিয়ে সার্জেণ্ট লাফিয়ে পড়ে এগিয়ে গেল। রামকমল মুখ তুলে বললো—স্যার, এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, সিরিয়াস কেস্!

সার্জেণ্ট এগিয়ে এলো, দেখলো, বললো—হাতে পায়ে তুমি দড়ি বেঁধেছ?

—না স্যার।

—দড়ি কেটে দাও নি কেন?

—সময় পাই নি।

সার্জেণ্ট ছুরি বের করে বাঁধনের দড়ি কেটে ফেললো। তারা দু'জনে অচৈতন্য লোকটিকে ধরে নিয়ে তুললো পুলিশ-ভ্যানে। এবার মানুষটির নিঃশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। টর্চের আলোয় তার মুখখানি ভাল করে দেখে নিয়ে সার্জেণ্ট বললো—একে তো আমি চিনি, আমাদের ও-সি-র কাছে ক'দিন এসেছিল।

গোবিন্দ তিনদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল।

মাণিকতলা থানার ও-সি নরেশবাবু গোবিন্দর জন্য কেবিনের ব্যবস্থা করেছিলেন। যারা গোবিন্দকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল তারা সুবিধা পেলে আবার কোনো অনিষ্ট করতে পারে ভেবে তিনি কেবিনের দরজায় পাহারা মোতায়েন করেছিলেন। ছাড়া পেয়ে গোবিন্দ সেই পাহারাদারের সঙ্গে সোজা থানাতেই এলো।

ঘণ্টা দু'য়েক পরেই পুলিশভ্যান বোঝাই হয়ে বন্দুকধারী সিপাই রওনা হয়ে গেল থানা থেকে।

শরৎবাবুর বাড়ীর চারিপাশ পুলিশ ঘেরাও করলো। তারপর কটকে গিয়ে ডাক দিলেন নরেশবাবু। ভৃত্য বললো—বড়বাবু তিনতলায় আছেন, ছোটবাবু কাজে বেরিয়েছেন। বড়বাবুকে খবর দোব?

নরেশবাবু বললেন—আমরাই খবর দিচ্ছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

নরেশবাবু সদলবলে সোজা তিনতলায় উঠে গেলেন।

তিনতলার ঘর শূন্য, শরৎবাবু সে ঘরে নেই।

গোবিন্দ বললো—শরৎবাবুর সন্ধান করার আগে জিনিষগুলো আপনাকে দেখিয়ে দিই।

তাকের উপর থেকে একটা কাঠের হাতী তুলে নিয়ে বললেন—এর পেটে একটা ফুটো আছে, ফুটোর মুখটা গালা দিয়ে বন্ধ করা।

টেবিলের উপর তুরপুন পড়েছিল, গোবিন্দ হাতীর পেটে তুরপুন চালালো। দু'মিনিটে গালা বেরিয়ে গেল। তারপর হাতীটা ওল্টাতেই বেরুলো কয়েকখানি মূল্যবান পাথর—হীরা চুনী পান্না।

এবার গোবিন্দ তাকের উপর থেকে সিংহটা তুলে নিলে। তার পেট থেকে বেরুলো কয়েকখানি হীরে।

গোবিন্দ বললো—সব পুতুলগুলোই এই, এইজন্যেই শরৎবাবু বসে বসে কাঠের পুতুল তৈরী করেন। আমার সন্দেহ হয়েছিল, সেইজন্যই আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিলেন।



নরেশবাবু বললেন—এখানে তো তাহলে লাখ লাখ টাকার হীরে-জহরৎ রয়েছে।

গোবিন্দ বললো—সবই চুরি ডাকাতির মাল।

সহসা পিস্তলের আওয়াজ হলো। একটা গুলি এসে লাগলো গোবিন্দর ডান হাতে। পুতুলটা হাত থেকে পড়ে গেল।

আরেকটা গুলি পাশের বুককেসের একখানা কাঁচ ভাঙলে।

নরেশবাবু পিস্তল হাতে নিয়ে তেড়ে গেলেন।

ছাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে শরথব.বু। তার হাতে পিস্তল। নরেশবাবুকে দেখে সে হাহা করে অট্টহাসি হেসে উঠলো। সে হাসি শুনে গোবিন্দ চমকে উঠলো—এ তো সেই হাস্নু পাণ্ডার হাসি।

নরেশবাবু চীৎকার করে উঠলেন—হ্যাণ্ডস্ আপ! সারেণ্ডার!

শরৎবাবু হাতের পিস্তলটা নরেশবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পিছু ফিরলো। পিছনেও তখন .পুলিশ এগিয়ে এসেছে। শরৎবাবু

সোজা গিয়ে ছাদের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে উঠেই নীচে লাফিয়ে পড়লো।

একটা পতনের আওয়াজ; তারপরেই বস চুপচাপ।

পুলিশ যখন শরৎবাবুকে তুললো তখন তার মাথাটা থেঁৎলে গেছে।

কিছুদিন যাবৎ কলিকাতায় যত হীরে-জহরৎ লুঠ হয়েছিল সবই পাওয়া গেল শরৎবাবুর ঘরের ওই কাঠের পুতুলগুলির ভিতর থেকে। পুলিশ নিঃসন্দেহ হলো যে হাস্নু পাণ্ডা শরৎবাবুরই ছদ্মনাম।

ব্যবসায়ীরা হীরা-জহরৎ ফেরৎ পেয়ে গোবিন্দকে কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার দিল। কাগজে গোবিন্দর ছবি বেরুলো। তবে গোবিন্দর গুলি-খাওয়া হাত সারতে লাগলো মাসখানেক। ইতিমধ্যে জংলীদার দল একদিন রাতে মুরারীর দোকানে বসে আলোচনা করলো—এই গোবিন্দ উকিলটা আমাদের মস্ত ক্ষতি করলো। হাস্নু পাণ্ডা আমাদের একজন বড় মুরুব্বি ছিল। অমন টাকা-পয়সা দেনেওলা আমরা আর পাব না। এর শোধ তুলতে হবে। এই গোবিন্দ ব্যাটার লাশ ফেলে দিতে হবে।

জংলীদা বললো—এখনই ওসব করতে গেলে আমাদের আরো ক্ষতি হবে। আগে ব্যাপারটা কিছুদিন থিতিয়ে যাক তারপর।

জংলীর দল গোবিন্দকে খতম করার জন্য পরে সচেষ্ট হয়েছিল, সে অন্য কাহিনী।

শিম্পু

শ্রী শৈলশেখর মিত্র

শিম্পু তুমি পেরিয়েছ তো
বয়েস বছর দেড়
মুখে তোমার খই ফুটেছে
শিখলে কথা ঢের।

এ-ঘর ও-ঘর ছুটতে পারো
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারো
ইচ্ছে মতো উঠেই আবার
নামতে পারো ফের।

শিখে গেছ খাটে চড়া
বলতে পারো টুকরো ছড়া
কথার পিঠে টানতে পারো
অনেক কথার জের।

এক রমাপতি চন্দ্র

শ্রী উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

শিখে এসে হঠযোগ
রমাপতি চন্দ্র
চিবিয়ে পেরেক খান,
ধুতরো, আকন্দ
কি কারণে হল শখ
খেয়ে ইলিশের টক
গলা করে খুস্ খুস্।
হল দম্ বন্ধ!

ছুটে এলো কবিরাজ,
করে সব ঘরবার
গুরুকে খবর দেন
চম্পটি সরকার,
গুরু কন—'বৎস,
খেয়েছো কি মৎস্য?
এখন তেঁতুল গোলা
খাওয়া খুব দরকার!'

যদি চাও

শ্রী রবি ভট্টাচার্য

মরা হাতী লাখ টাকা—শুনে তাই শম্ভু
চট করে টিকিটটা কেটে চলে জম্বু।
জম্বুতে দেখা হলে বলে গজানন্দ:
এখানে হাতীর নেই কোনো নামগন্ধ।
যদি চাও দিতে পারি বেড়ালের বাচ্চা,
ইঁদুরের হাত থেকে বেঁচে যাবে সাচ্চা।

ছড়াবুড়োর ছড়া

শ্রী পান্নালাল ঘোষ

একটা বুড়ো ছড়া লেখে
ঝাল-নোন্‌তা-মিষ্টি মজার
ছড়া চেখেই স্বাদ পাওয়া যায়
নিম্‌কি-আচার-জিবেগজার।

ইচ্ছে হলেই সেই বুড়োটা
রঙ-বেরঙের ছড়া বানায়
ছড়াগুলো হাওয়ায় ছড়িয়ে
নাম-না-জানা পাখির ডানায়।

কেষ্টার ঘড়ি

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

নিত্য নোতুন পোশাক প'রে স্কুলে আসে কেষ্টা,
ক্লাসের সবাই'প্রতিদিনই প্রশ্ন করে জানতে :
কোত্থেকে পায় রোজই সে এই নতুনতর বেশটা,
কিনে পরে ? উঁহুঁ—তারা রাজী তো নয় মানতে।
একদিন এক কোট পরে সে ক্লাসের ভেতর আসতেই
বন্ধুরা সব প্রশ্ন করে : 'কোথায় পেল্লি কোটটা ?'
কেষ্টা বলে, 'বাবার ছিল—কাটিয়ে নিয়ে পরছি
মজুরি কিন্তু নিয়েছে ভাই দশ টাকার এক নোটটা।'
ক'দিন পরে প'রে এলো ফুল প্যাণ্ট এক কেষ্টা
বন্ধুরা সব প্রশ্ন করে : 'কোথায় পেলি প্যাণ্টটা ?'
'ছেলেবেলায় বাবার ছিল কাটিয়ে নিয়ে শেষটা
প'রে এলাম—লাগছে কেমন' জবাব দিল কেষ্টা।
হাত-ঘড়ি এক হাতে বেঁধে যেদিন এলো কেষ্টা,
সেদিন সবাই ধরলো ছেঁকে : 'কোথায় পেলি বল্ না ?'
চ্যাংড়া ছেলে মাধব হেসে ফোড়ন কেটে বললে—
'বাবার ছিল দেয়াল-ঘড়ি—করলি কেটে ওয়াচটা ?'

লিমেরিক

শ্রীআশিসকুমার ভুঁইয়া

বুদ্ধির গোড়ায় যাদের ধরেছে ভাঁটা
ভোরবেলা চাই মাইল দু'য়েক হাঁটা।
রাজপ্রাসাদের চুড়ো থেকে,
পাহারাদার বলল হেঁকে
বুদ্ধি হবে খেয়ো শুধু একটু আদাবাটা

ছড়া

শ্রী শুভেন্দু ঘোষ

'এই ট্যাক্সি!' হাঁকেন যিনি
পরণে তাঁর 'ম্যাক্সি'—
সেই ট্যাক্সি চড়েই তিনি
পাড়ি দিলেন 'ব্ল্যাক-সী।'

উৎসবে

শ্রীবিবেকানন্দ সেনগুপ্ত

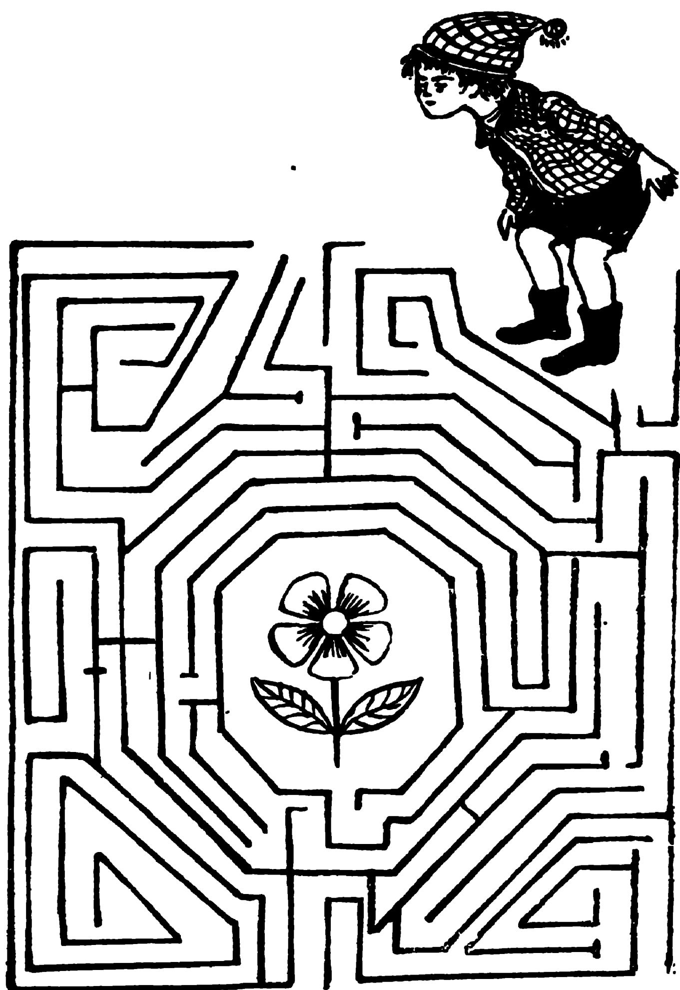
শরতের মাঠে ঘাটে দেখি চেয়ে যতদূর···
ভিজেঘাসে হাসে যেন মিঠে রোদ রোদ্দুর।
ছল্ ছল্ নদীজলে তুলে পাল পান্সীর
যাত্রীরা এলো ঘাটে বহে হাওয়া ঝির ঝির।
শরতের মাঠে ঘাটে শেফালীর মিঠে ঘ্রাণ···
ভরে দেয় বাঙালীর উৎসবে মন প্রাণ।

ছবির ধাঁধা

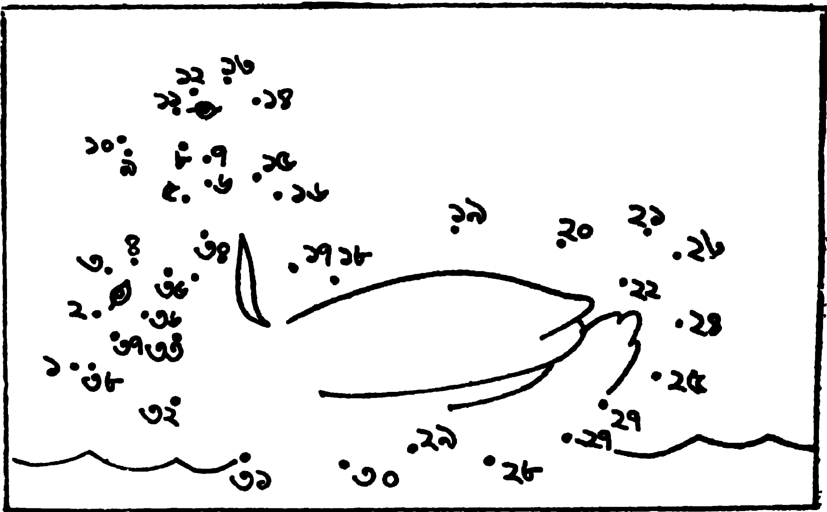
শ্রী অশোককুমার ধর



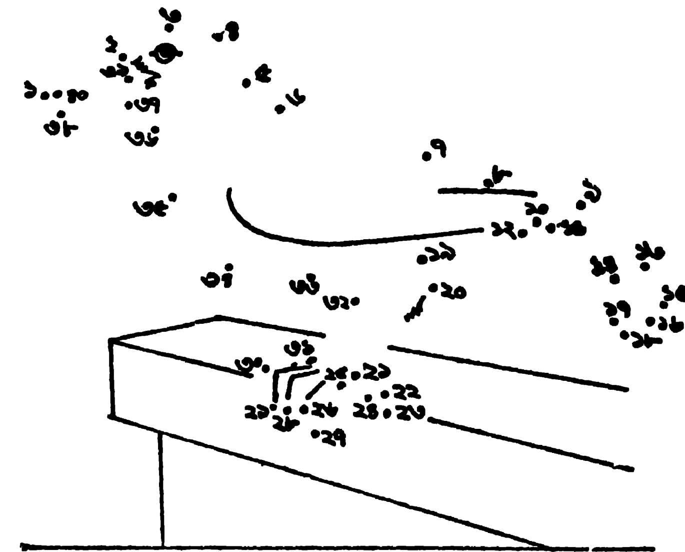
ছেলেটি বাড়ী যাবে, পথে অনেক বাধা, কোন্ পথ দিয়ে সে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছাবে, দেখ তো ?



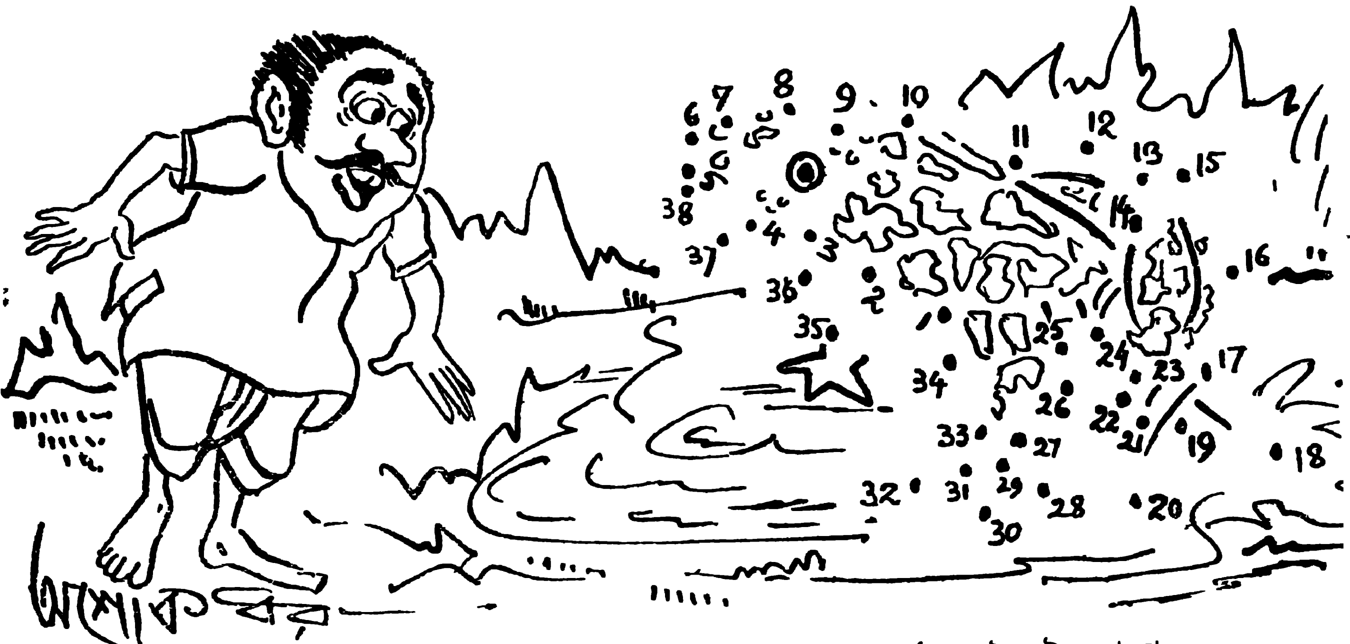
ছেলেটি ফুলটি নিতে চায়, কোন পথ দিয়ে গেলে সে ফুলটি পাবে, দেখ তো ?



১-২-৩-৪ রেখা টেনে দেখ কি লুকানো আছে।



বলোতো ছবিতে কি আছে ?
না পারলে ১ থেকে ৪০ পর্যন্ত লাইন
টানো



ছবিতে কি লুকানো আছে বের কর—১-২-৩-৪—এইভাবে রেখা টানলেই সেই লুকানো ছবিটি প্রকাশ পাবে।

আমাদের বই

যারা সবে প্রথমভাগ শেষ করেছে তাদের জন্য

যুক্তাক্ষর বর্জিত বই

বড় বড় অক্ষর আর ভাল ভাল ছবি

॥ ধীরেন্দ্রলাল ধরের লেখা ॥

ছোটদের গালিভার—বামনের দেশ…১'০০

ঐ গালিভার—দানবের পুরী…১'০০

ঐ রবিন্‌সন—[রবিন্‌সন ক্রুশো]…১'০০

ঐ সিন্‌দোবাদ [সিন্ধবাদ দি সেলর]…১'০০

ঐ রবিনহুড…………১'০০

ঐ আলাদিন……… ১'০০

ঐ আলিবাবা……… ১'০০

ঐ পিনোশিও ……… ১'০০

আমার দেশের রূপকথা…১'৫০

যুক্তাক্ষর চিনতে শেখার জন্য

দেশ-বিদেশের রূপকথা : ৬'০০ [আটাশটি রূপকথার সংকলন]

যারা যুক্তাক্ষর চিনেছে তাদের জন্য

॥ ধীরেন্দ্রলাল ধরের লেখা ॥

যত রাজ্যের রূপকথা : ২'০০

[পৃথিবীর বাইশটি দেশের বাইশটি রূপকথার সংকলন]

ভিন্‌দেশী রূপকথা : ৯'০০

[গ্রিম ভাইদের ৫৪টি রূপকথার সংগ্রহ। বহু ছবি। ভাল বাঁধাই।]

বিদেশী রূপকথা : ৯'০০

[হ্যান্স এণ্ডারসেনের ৪৩টি রূপকথার সংগ্রহ। বহু ছবি। ভাল বাঁধাই।]

রূপকথার ঝুলি : ২'৫০ [দেশ-বিদেশের রূপকথার সংগ্রহ]

ছোটদের ছবি ও ছড়ার বই

হাসির টেক্কা : ১'৫০ —নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

হাসির ভুবড়ি : ১'৫০ — ঐ

তারপর—৪র্থ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য

ছোটদের কৃত্তিবাসী রামায়ণ : ২'৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
ছোটদের কাশীদাসী মহাভারত : ৩'০০ ॥ ঐ
মঙ্গলকাব্যের গল্প : ২'০০ ঐ
শিবপুরাণের গল্প : ০'৮৮ পয়সা ঐ
বিষ্ণুপুরাণের গল্প : ০'৮৮ পয়সা ঐ

১২-১৩ বছরের পড়ুয়াদের জন্য

কুমড়ো পটাস : ৩'০০ ॥ নগেন দত্ত
আজব দেশের যাদুকর : ৩'০০ ॥ জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
[বিশ্ববিখ্যাত বই 'উইজার্ড অব ওজের' সাবলীল অনুবাদ]
জননী : ২'৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
[ম্যাক্সিম গর্কির 'মাদারের' কিশোর সংস্করণ]
দেশ-বিদেশের লেখা : ৪ ৫০ ॥ মনোরম গুহঠাকুরতা
[বিশ্বসাহিত্যের সেরা বইগুলির গল্প ও লেখকদের জীবনকথা]
বিশ্বসাহিত্য-কিশোর সংস্করণ : ৩'৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
['কিড্‌ন্যাপড্‌', 'টেল অফ টু সিটিজ', 'লাস্ট ডেজ অফ পম্পেই' ও 'রাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইট্টি ডেজ'-এর সাবলীল অনুবাদ একত্রে একখণ্ডে]
আমার দেশের কবি : ২'৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
[কৃত্তিবাস থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল অবধি কবিদের জীবনী ও কাব্য পবিচয়]
গল্প হলেও সত্যি (দ্বিতীয় খণ্ড) **:** ২'৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
[গত শতকের ভারতীয় মনীষীদের জীবনের কৌতূহলজনক গল্প]
গল্প হলেও সত্যি (বিপ্লবী পর্ব) **:** ২'০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
[স্বাধীনতা-সংগ্রামী শহীদদের গল্প]
দুঃখের কাহিনী : ২'৫০ ॥ ধীবেন্দ্রলাল ধর
[ভিক্টর হিউগোর 'লে মিজারেবল্‌স্‌'-এর কিশোর সংস্করণ]
বিবেকানন্দ : ২'৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
আপনকথা : ২'৮০ ॥ ঐ
[মনীষীদের আত্ম-চরিতের আংশিক সংকলন]
গল্প বিতান : ২'৫০ ॥ নাগ ও ভট্টাচার্য
[প্রখ্যাত লেখক-লেখিকার গল্প-সংকলন]

কিশোর-কিশোরীদের জন্য উপন্যাস গল্প নাটক ও কবিতার সংকলন

কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ নরেন্দ্র দেব
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তী
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ স্বপনবুড়ো
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ মণীন্দ্র দত্ত
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ আশা দেবী
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ ইন্দিরা দেবী
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ লীলা মজুমদার
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ রবীন্দ্রলাল রায়
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪ ০ ॥ বিশু মুখোপাধ্যায়
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত
কিশোর গ্রন্থাবলী : ৪·০০ ॥ মন্মথ রায়
রঙীন আকাশ : ২·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

বড়দের বইয়ের কিশোর সংস্করণ

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প : ৬·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
[বঙ্কিমচন্দ্রের ১২ খানি উপন্যাসের গল্প-কাহিনী]

রমেশচন্দ্রের গল্প : ৩·৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর
[রমেশচন্দ্রের ৬ খানি উপন্যাসের গল্প-কাহিনী]

উড়োজাহাজের কথা : ·৭৫ ॥ ঐ

প্রাচীন ভারত-সাহিত্যের সংকলন

আনন্দ ওমনিবাস : ৬·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন ও কথাসরিৎসাগর একত্রে এক খণ্ডে]

ছোটদের ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্প

লালচাঁদের টাকা নিমচাঁদের লাঠি : ১·৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[মীরজাফরের আমলে নিমে ডাকাতের দুঃসাহসিক কাহিনী]

অরণ্য দেউল : ২·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[সিপাহী-যুদ্ধের আমলে এক কিশোরের দুরন্ত কাহিনী]

বেনগাজীর আখড়া : ২·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[ভাসকো-ডি-গামা ও পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারের প্রতিরোধ কাহিনী]

অসি বাজে ঝনঝন্ : ২·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[হূন-সম্রাট মিহিরগুলের অনাচারের প্রতিরোধ কাহিনী]

মহাকালের পূজারী : ৪·৫০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[নন্দরাজবংশের পতন ও মৌর্যবংশের উত্থান কাহিনী]

যুদ্ধের গল্প : ৪·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[স্পেন যুদ্ধ, চীন যুদ্ধ, রুশ-জার্মান যুদ্ধের নানা কাহিনী। ছোটদের জন্য এমন বই আর নেই।

ছোটদের নাটক

সিদ্ধার্থ : ·৭৫ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

জয়দেব : ·৫০ ॥ ঐ

নাচ-গান-ছড়া : ১·১২ ॥ ঐ

[আকাশবাণীতে অভিনীত তিনটি রূপকথার নাট্যরূপ]

বিদ্যাসাগর : ১·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

সুভাষচন্দ্র : ১·০০ ॥ ঐ

উপন্যাস

এই আবর্ত : ৫·৫০ মুকুল রায়

রাজধানী কলিকাতায় : ৫·০০ ॥ ভিক্ষু তথাগত

রতি বিলাপ : ২·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভা থেকে নির্বাসিত এক তরুণের কাহিনী]

ঠগী কাহিনী : ৪·৫০ শ্রীধর মুন্‌সি

[কর্ণেল টেলরের 'কনফেশন অফ এ ঠগ'-এর সংক্ষেপিত কাহিনী]

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ-৯

রহস্য উপন্যাস

[দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা রবার্ট ব্লেকের দুরন্ত দুঃসাহসিক কাহিনী]

কলির ভীমের কাণ্ড : ৪·০০ ॥ [শক্তিমান দস্যু ওয়াল্ডোর কীর্তি-কাহিনী]

পেত্তলীদহের হীরা : ৫·৫০ ॥ [ওয়াল্ডোর আর এক এডভেঞ্চার]

চীনের চক্র : ৫·৫০ ॥ [চীনের পীতপতঙ্গ দলের ভয়াবহ হত্যা অভিযান]

দুরন্ত দস্যু : ৮·৫০ ॥ [দস্যুরাজ ব্যাটের দুরন্ত কাহিনী]

ডাক্তার সাটিরা : ৯·৫০ ॥ [ডাক্তার সাটিরার লোমহর্ষণ মৃত্যুলীলা]

শয়তান : ৭·৫০ ॥ [দস্যুরাজ প্লুমারের দুরন্ত অর্থলোভের কাহিনী]

মরণ ফাঁদ : ২·৫০ ॥ [লর্ড হেডিংহামের হত্যাকাণ্ডের রহস্য]

কালো বিড়াল : ৩·০০ ॥ [দস্যু হারল্যাণ্ড-এর নির্মম প্রতিহিংসার কাহিনী]

মৃত্যু সঙ্কট : ৩·৫০ ॥ [দস্যুরাজ মুলিঙ্গারের মৃত্যুজাল]

গুপ্তঘাতক : ২·৫০ ॥ [মৃত্যু-ছুঁচ বন্দুকের গুলির চেয়েও ভয়াবহ]

দ্বীপান্তরের আসামী : ৩·০০ ॥ [দস্যু গ্যারিকের দ্বীপান্তর পলায়ন কাহিনী]

দস্যু গোয়েন্দা : ৮·৫০ ॥ [দুরন্ত দস্যু মাকড়সাব মৃত্যুপণ সংঘর্ষ]

রাজদ্রোহী : ৩·০০ ॥ [মন্ত্রী—চোর রাজদ্রোহী]

দুষ্টগ্রহ : ৩·০০ ॥ [শঠ চূড়ামণি ভলটেয়ারের সম্মোহন রহস্য]

কণ্টকে কমল : ৪·৫০ ॥ [ইংলণ্ডে রুশ রাজদ্রোহীর রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড]

ভৌতিক কাহিনী

রাত্রির প্রেয়সী : ৩·০০ ॥ ধী' ন্দ্রলাল ধর

[প্রেতদর্শন ও প্রেতাবিষ্টের ভীতিপ্রদ রোমাঞ্চ কাহিনী]

ভ্রমণ-কহিনী

পশ্চিম দিগন্তে : ১০·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[বেনারস থেকে ওখা বন্দর,—কাশী, প্রয়াগ, খাজুরাহো, জব্বলপুর, সাঁচী, ইলোরা, অজন্তা, ঔরঙ্গাবাদ, পুণা, ঝাঁসী, আমেদাবাদ, আবুপাহাড়, জুনাগড়, সোমনাথ, দ্বারকা,—পশ্চিম ভারত ভ্রমণকথা। বহু ফটো।]

নালন্দা থেকে লুম্বিনী : ৮·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[বৌদ্ধ-তীর্থ পরিক্রমা—বুদ্ধগয়া, সারনাথ, নালন্দা, লুম্বিনী, গোরখপুর, মগহর—ভারতগৌরব তীর্থের কাহিনী। বহু ফটো শোভিত।]

কাশ্মীর ঃ ৪·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[কাশ্মীর সম্পর্কে তথ্যবহুল ভ্রমণ-কাহিনী—শ্রীনগর, গুলমার্গ, খিলানমার্গ, ক্ষীরভবানী প্রভৃতি। সেই সঙ্গে পুরাণ, ইতিহাস ও রাজনীতিক তথ্য। বহু ফটো শোভিত।]

নীলাচলের পথে ঃ ২·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[ওড়িষ্যা রাজ্যে কটক থেকে গোপালপুর অবধি সচিত্র তথ্যবহুল ভ্রমণকথা।]

জীবনকথা

দেশপ্রাণ শাসমল ঃ ৮·০০ ॥ প্রমথ পাল

[মেদিনীপুরের নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ঘটনা-বহুল জীবনকথা।]

আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঃ ৮·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[কবির জীবন-কথা। ঘটনাপঞ্জী, রচনাপঞ্জী, অনুবাদের তালিকা ও সাহিত্য আলোচনা। কাব্য নাটক উপন্যাস ছোট গল্প ও প্রবন্ধের পূর্ণ তালিকা ও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকদের অভিমত। বহু চিত্র ও অটোগ্রাফ সম্বলিত বৃহৎ বই।]

গান্ধী মহারাজ ঃ ৩·০০ ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর

[মহাত্মা গান্ধীর ঘটনাবহুল জীবন-আলেখ্য।]

হে মহাপথিক (উন্মেষ পর্ব) **ঃ** ৬·৫০ ॥ মনোরঞ্জন ঘোষ

[কিশোরদের উপযোগী নেতাজীর জীবনকথা]

তাইহোকু থেকে ভারতে [২য় পর্ব] **ঃ** ২৩·০০ ॥ শ্রীঅভিজিত

[নেতাজীর বর্তমানের অবস্থান রহস্য]

সমালোচনা

রবীন্দ্র পরিচয় ঃ ২৫·০০ ॥ ডঃ মনোরঞ্জন জানা

[রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বমুখীন তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্ব, সঙ্গীতধর্মী রোমান্টিসিজম, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্ত্যের রেনেসাঁ—সব মিলিয়ে কবি-মানসের যে বিচিত্র প্রকাশ, রবীন্দ্রদর্শনের যে বৈশিষ্ট্য তাই লেখক বিশ্লেষণ করেছেন এই গ্রন্থে।]

রবীন্দ্রমানস ঃ ৫·০০ ॥ অমলশঙ্কর রায়

[ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মানসিকতার বিচার-বিশ্লেষণ। বাংলা-সাহিত্যে নূতন দিগ্‌দর্শন। অদ্বিতীয় গ্রন্থ।]

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ-৯

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ঃ ১০·০০ ॥ ডঃ মনোরঞ্জন জানা

[যে দর্শন ও আধ্যাত্মবাদ রবীন্দ্র-সাহিত্যে অন্তর্নিহিত, তারই প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-চিন্তাধারার এক বিশেষ দিক্-দর্শন।]

শিক্ষা প্রসঙ্গ

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ঃ ৩·০০ ॥ ডক্টর হরিসাধন গোস্বামী

[বর্তমানের মাধ্যমিক শিক্ষাধারার সর্বমুখীন আলোচনা।]

শিশুশিক্ষার গোড়াপত্তন ঃ ৪·০০ ॥ ফণিভূষণ বিশ্বাস

[শিশুশিক্ষা আমাদের একটা বড় সমস্যা। দরদী শিক্ষাবিদ্ সেই সমস্যার দিক-নির্দেশ করেছেন।]

আনন্দ

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিকদের রচনার সংকলন। এতে আছে: তিনখানি উপন্যাস, পাঁচটি নাটক, চৌত্রিশটি গল্প, দুটি জীবন-কথা, বহু কবিতা ও ছড়া। সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার বই। কয়েকখানি অবশিষ্ট আছে। অর্ধ মূল্য ৩·০০

আনন্দ

নামকরা লেখকদের দুটি কিশোর উপন্যাস, দুটি নাটক, আটাশটি গল্প, বহু ছড়া ও কবিতা এই বইয়ের বিশেষ আকর্ষণ। দুশো অষ্ট-আশী পৃষ্ঠার বই। মূল্য ৬·০০

এবার পূজায়

আনন্দ

ছোটদের লেখায় যাঁরা নাম কবেছেন তাঁদের সকলের গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং বহু নতুন অনামীব রচনায় সমৃদ্ধ। এতে আছে তিনটি উপন্যাস, তিনটি নাটক, ত্রিশটি গল্প, একশত ত্রিশটি কবিতা ও ছড়া এবং কয়েকটি ধাঁধা—দাম কিন্তু বাড়ানো হয় নাই। মূল্য ৬·০০

আমাদের নতুন বই

কিশোর গ্রন্থাবলী ঃ ৪·০০ ॥ মৃত্যুঞ্জয় রবার্ট সেনগুপ্ত

[প্রবাসী লেখক মৃত্যুঞ্জয়বাবু দীর্ঘ দি... ছোটদের জন্য বহু গল্প লিখেছেন। তাঁর সেরা গল্পগুলি নিয়ে এই সংকলন। প্রতিটি গল্প সুখপাঠ্য ও সচিত্র।]

কিশোর গ্রন্থাবলী ঃ ৪·০০ ॥ মন্মথ রায়

[প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় বাংলা-সাহিত্যে প্রথম একাঙ্কিকা রচনা করেন। ছোটদের জন্যও তিনি বহু নাটিকা লিখেছেন। সেরা নাটিকাগুলির সংকলন।)